প্রকাশনার ৯৫ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
# আহ্‌মদী
ঈদুল ফিতর সংখ্যা

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮০ বর্ষ |২২ ও ২৩তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ আষাঢ়, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ | ৩০ রমযান, ১৪৩৯ হিজরি | ১৫ ইহসান, ১৩৯৭ হি. শা. | ১৫ জুন, ২০১৮ ঈসাব্দ

সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণে রেখে–

# ঈদ মুবারক

**মসজিদ মুবারক, সিয়ালকোট শতবছরাধিক কালের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী আহমদীয়া মসজিদটিকে ধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সিলবদ্ধাবস্থায় গত ২৩ মে ২০১৮ রাতভর তাণ্ডব চালিয়ে শহীদ করা হয়। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন!**

# মুসলিম ঐতিহ্যের সত্যিকার ধারক কে?
# সত্যান্বেষী পাঠক চিনে নিন

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত
খেলাফতের একক নের্তৃত্বে
ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নামায কায়েম করে

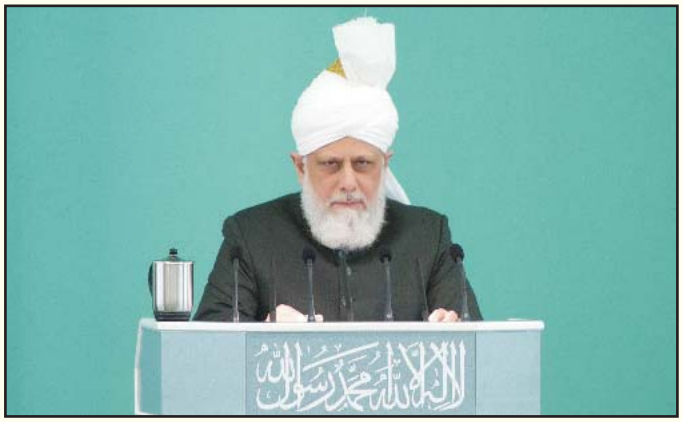

দেশে দেশে মসজিদ নির্মাণ করে–

আহমদীয়া মসজিদ বিরনী নিকন্নী, তহুয়া, নাইজার

ধর্মান্ধরা মনগড়া বিশ্বাস রক্ষার ধোঁকা দিয়ে
সমাজে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে
জনসাধারণকে প্রতারিত করে–

তাণ্ডব চালিয়ে মসজিদ ধ্বংস করে–

মসজিদ মোবারক,শিয়ালকোট (বিধ্বস্তাবস্থায়)

# সম্পাদকীয়

## সত্যটা কী(?)
## পাঠক নিজেই যাচাই করুন

পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদীরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে মিলে, সিয়ালকোটে একটি ঐতিহাসিক আহমদীয়া মসজিদ এবং নগরীর পুরাতন অংশ কুচেরা-য় অবস্থিত প্রয়াত বুযূর্গ মীর হাসেম উদ্দিনের বাড়ি, প্রাচীনত্বের গুরুত্বে যা ঐতিহাসিক মর্যাদা রাখে, তা ধ্বংস করে দিয়েছে।

পুলিশ প্রহরাধীনে তহশীল পৌর কমিটির ৩০ জন কর্মচারী সদল-বলে এসে গত বুধবার ২৩ মে রাত ১০ টা ৪৫ মিনিটে হেকিম হোসাম উদ্দিন ভবনটির আশেপাশের অংশ ভাংতে শুরু করে।

এদিকে, ৬০০ জনেরও বেশি দুষ্কৃতকারীর একটি মিছিল স্লোগান দিতে দিতে এসে তাদের সাথে ইমারত ভাঙ্গার কাজে যোগ দেয় এবং এক পর্যায়ে ভবনটির কাছাকাছি অবস্থিত আহমদীদের ইবাদত গৃহ 'মসজিদ মুবারক' ভেঙ্গে-গুড়িয়ে ফেলে। ভাংচুরের এই ধ্বংসযজ্ঞ ভোর সাড়ে ৪ টা নাগাদ চলে।

দাঙ্গাবাজ মানুষের এক মিছিল চড়াও হয়ে একটি মসজিদ ভাঙ্গছে, ২৪ মে বৃহস্পতিবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন দৃশ্যের ছবি এবং ভিডিও দেখাতে থাকলে, জনমনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় আর তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায় , সন্ত্রাস পরিচালনাকারী রাজনৈতিক দলের এক হোতা, মসজিদের মিনারগুলি গুড়িয়ে দেয়ার কাজে তাদের সমর্থনের জন্য জেলা পুলিশ অফিসার, ডেপুটি কমিশনার, বিভিন্ন ইসলামী দল এবং শহরের পৌর প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আশ্চর্যজনক হলো 'মিনার-গম্বুজে সুশোভিত মসজিদ' ইসলামী ঐতিহ্যের এক প্রতীকি প্রকাশ, অথচ বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হয়ে ভাল মুসলিমের দাবীতে এ ন্যাক্কারজনক কাজটিকেই তারা কৃতিত্ব ভেবে বসেছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জন্য মসজিদ ও বাড়িঘর ভাঙচুরের ঘটনাটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকা এ মসজিদটি হালে সংস্কার করা হলে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এটিকে সীল-বদ্ধ করে রাখে।

পৌরসভার আপত্তির বিরুদ্ধে আইনগত লড়াই চলছিল; তবুও বিচারবিভাগীয় কোন আদেশ ছাড়া নিছক চরমপন্থীদের সন্তুষ্টির জন্য সরকারি প্রশাসনের মদদপুষ্ট হয়ে ভাঙচুরের এই ঘটনায় কেবলই দুঃখজনক এক সত্য প্রকাশ পায়,আর তা হলো ব্যক্তিগত এবং সাংগঠনিক স্বার্থ হাসিলে বেসামরিক স্থাপনাগুলি দখল করতে এই দুর্বৃত্তরা ধর্ম ব্যবহার করে থাকে।

উল্লেখ্য শত বছরাধিক কালের ঐতিহ্যবাহী এ মসজিদভবনটিকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একেবারেই অন্যায়ভাবে "অবৈধ নির্মাণ" বলার অপচেষ্টা করছে।

সিয়ালকোটের মেয়র চৌধুরী তৌহীদ আখতার, পাকিস্তানে একটি বেসরকারী সংবাদ চ্যানেলের সাথে কথা বলাকালে এই উক্তি করেছেন যে, আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সদস্যরা অনুমোদিত নকশা ছাড়াই একটি বিল্ডিং নির্মাণ করছিল। প্রশাসন অবৈধ নির্মাণ সম্পর্কে অভিযোগ পেয়েছে আর তাই পরবর্তীতে এই ইমারতটি সীল-বদ্ধ করা হয়েছে।

মেয়রের মতে, অবৈধ নির্মাণ আইন এবং কর্পোরেশনবিধি লঙ্ঘন অব্যাহত থাকায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই- এই বিল্ডিং ধ্বংস করা, অথচ এটি সর্বৈব এক মিথ্যাচার।

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এটি এক মজাদার তথ্য যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ভবনটির অবৈধতা সাব্যস্ত করার সপক্ষে একেবারেই কোন প্রমাণ নেই। অপরদিকে স্থানীয় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কাছে দীর্ঘকাল মসজিদ ব্যবহার করার প্রমাণ তো আছেই তদুপরি মসজিদ-ভবন ও জমির প্রামাণিক দলীলপত্রও রয়েছে।

সুপ্রিয় পাঠক, এ বিষয়টি নোট করতে আপনাকে বিনয়ের সাথে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, দুষ্কর্মী-দুরাচারীরা ইসলামের রক্ষাকর্তা সেজে সর্বত্র– সহিংসতা, নিষ্ঠুরতা এবং সাম্প্রদায়িক নৃশংসতাপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য সচরাচর এই রমযান মাসটি বিশেষভাবে বেছে নেয়। অপরদিকে আমরা, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সবসময় সব দেশে সর্বাবস্থায়, প্রতিহিংসা নয়- "ভালোবাসা সবার তরে;ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে" ইসলামেরই এ মূলনীতি সমুন্নত রেখে জীবনযাপন করে থাকি। পবিত্র ইসলামের শিক্ষার আজ্ঞাধীন থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুশীলন-অনুসরণ তবে কারা করছে? সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্বটি এবার আপনার উপরই রইল, প্রিয় পাঠক।

# সূচিপত্র

## ৩১ মে ও ১৫ জুন, ২০১৮


**কুরআন শরীফ** ৩

**হাদীস শরীফ** ৪

**অমৃত বাণী** ৫

**ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)** (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ৬
প্রণয়ন ও প্রকাশনা **১৮৯১**
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৮
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২৬ জুন ২০১৭ তারিখের **ঈদুল ফিতরের খুতবা**

**ই'তিকাফ নিজেকে উৎসর্গ করতে এক নির্জনবাস** ১৪
**মু'মিন আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে হয় ধন্য**
**মমত্ববোধের চেতনায় হয় উজ্জীবিত**
মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৭
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১০ জুলাই ২০১৫ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

**যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়** ২৪
অনুবাদ– মরহুম মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

**রোযার মাসলা মাসায়েল-সংক্রান্ত** ২৮
**কিছু প্রশ্ন এবং এর উত্তর**
মওলানা মুহাম্মদ আকরামুল ইসলাম

**বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান** ৩৫
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

**আহমদী ও অ-আহমদীর মধ্যে পার্থক্য** ৩৭
মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ

**খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণরাজি** ৪১
শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন

**খলীফা আমাদের প্রাণ** ৪৫
সাব্বির আহমদ (মুত্তাকী)

**সুস্থ্যভাবে বাঁচার বিজ্ঞান ভিত্তিক কার্যকর উপায়** ৪৮
**শুধু রমযানের ফরয রোযাই নয়**
**নফল রোযাও কল্যাণকর**
**হুযূর (আই.) নির্দেশিত সাপ্তাহিক নফলও**
**নিষ্ঠার সাথে পালন করা উচিত**

**ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে** ৪৯
হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর
পাকিস্তান থেকে যুক্তরাজ্যে হিজরত
**অসাধারণ কল্যাণমণ্ডিত এক ঐশী-পরিকল্পনা**
মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

**ঈদের আনন্দ সার্বজনীন** ৫২
মাহমুদ আহমদ সুমন

**কিছু মজার ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনা** ৫৪
ফুরাদ আহমদ

**খলীফা নির্বাচন সম্পর্কীয়** ৫৫
সংগ্রাহক: কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

**কলমের জিহাদ** ৫৬
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

**আমি কিভাবে আহমদী হলাম** ৬০
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী

**স্বাস্থ্য নিয়ে ক'টি কথা** ৬৩
খালিদ আহমেদ সিরাজী

**আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণপ্রিয় খলীফা ও বর্তমান** ৬৫
**ইমাম পাকিস্তানের সিয়ালকোটে অবস্থিত আহমদীয়া**
**মসজিদে হামলার প্রতিবাদে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন**

**সকল কল্যাণ ও আশিস খেলাফতে নিহিত** ৬৫
সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)

**সংবাদ** ৬৬

**দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে** ৭২
**হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা**

# কুরআন শরীফ

## সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿۵۶﴾

৫৬। যারা আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে আছে তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের ভালো করেই জানেন। আর কোন কোন নবীকে আমরা অবশ্যই অন্য কোন কোন (নবীর) উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর দাউদকে আমরা যবূর* দিয়েছিলাম।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ﴿۵۷﴾

৫৭। তুমি বল, 'তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের (উপাস্য) মনে করছো তোমরা তাদের ডাক। আসলে তোমাদের দুঃখকষ্ট দূর করার অথবা (তা) পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা তারা রাখে না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ؕ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ﴿۵۸﴾

৫৮। এরা যাদের ডাকে[১৬২৫] তারাও তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নৈকট্য লাভ করতে (কোন না কোন) মাধ্যম অন্বেষণ করতে থাকে। (অর্থাৎ তারা এটা দেখতে থাকে,) তাদের মাঝে কে সবচেয়ে বেশি (আল্লাহর) নিকটবর্তী। আর তারা সবসময় তাঁর কৃপা লাভের আশায় থাকে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আযাব অবশ্যই ভয় করার মত এক বিষয়।

وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ﴿۵۹﴾

৫৯। আর প্রতিটি জনপদকে আমরা কিয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করে দিব অথবা অতি কঠোর আযাব[১৬২৬] দিব। এ বিষয়টি (ঐশী) বিধানে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

وَمَا مَنَعَنَاۤ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّاۤ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ؕ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ﴿۶۰﴾

৬০। আর পূর্ববর্তী লোকদের এসব (নিদর্শন)[১৬২৭] প্রত্যাখ্যান করাটাই আমাদেরকে নিদর্শন প্রেরণে বাধা দিয়েছে। আর আমরা সামূদ (জাতিকে) দৃষ্টি উন্মোচনকারী নিদর্শনরূপে এক উট দান করেছিলাম। কিন্তু তারা এর প্রতি অন্যায় আচরণ করেছিল। আর আমরা কেবল পর্যায়ক্রমে ভয় দেখানোর জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করে থাকি।

---

** ['যাবূর' অর্থ চামড়ার উপর লিখিত লিপি।]

১৬২৫। এ আয়াত সেসব ফিরিশতা, নবী-রসূল এবং মহাপুরুষের প্রতিও ইঙ্গিত করতে পারে, যাঁদেরকে লোকেরা খোদা ভ্রমে পূজা করে থাকে।

১৬২৬। এটা বিশ্বময় সেইসব আযাবের কথা ব্যক্ত করেছে, যেসব আযাব সম্পর্কে পূর্ব থেকেই সতর্ক করে দেয়া হয়, যার ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহর নবীগণ করে থাকেন এবং কুরআন করীমেও যার উল্লেখ রয়েছে।

১৬২৭। অথবা এর অর্থ এরূপও হতে পারে, পূর্বের জাতিগুলো আল্লাহর নবীগণকে অস্বীকার করেছিল, তাই আর কোন নিদর্শন পাঠানোর প্রয়োজন নাই, অথবা ঐশী নিদর্শন স্থগিত করার এটা কোন কারণ হতে পারে না।

# হাদীস শরীফ

# রমযানের শেষ দশকের বিশেষ গুরুত্ব

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশ দিন শুরু হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সারা রাত জাগতেন, নিজের পরিবারবর্গকেও জাগাতেন এবং (আল্লাহ্‌র ইবাদতে) খুব বেশী সাধনা ও পরিশ্রম করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযানে (আল্লাহ্‌র ইবাদতের ক্ষেত্রে) এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা অন্য কোন মাসে করতেন না। আর শেষ দশ দিনে এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা অন্য সময় করতেন না (মুসলিম)।

**রমযানের শেষ দশ দিন শুরু হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সারা রাত জাগতেন, নিজের পরিবারবর্গকেও জাগাতেন এবং (আল্লাহ্‌র ইবাদতে) খুব বেশী সাধনা ও পরিশ্রম করতেন।**

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি যদি জানতে পারি কোন রাতটি কদরের রাত তাহলে আমি তাতে কি বলবো?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ তুমি বলবে **"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফাআ'ফু আন্নি"** (অর্থাৎ –হে আল্লাহ্! তুমি অবশ্য ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ করো, কাজেই আমাকে ক্ষমা করো)। (তিরমিযী)

* হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের নিকট রমযান এসেছে। রমযান মুবারক মাস। এর রোযা আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত করা হয়েছে, দোযখের দ্বার সমূহ বন্ধ করা হয়েছে এবং দুষ্কৃতকারী শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়েছে। এ মাসের একটি রাত্রি যা হাজার মাস থেকে উত্তম। এর কল্যাণ থেকে যে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত" (বুখারী, আহমদ)।

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কদরের রাত্রে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় ইবাদত করে, তার পূর্বের গোনাহ্ ক্ষমা করা হয়" (বুখারী)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশ দিন মসজিদে ইতেকাফে বসতেন, এবং বলতেন, রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির ভিতর লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান করো" (বুখারী, মুসলিম)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোতে শবে কদরের সন্ধান করো" (বুখারী)।

অনুবাদ ও সংকলন:
**আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

# অমৃতবাণী

# প্রত্যেক পুণ্য কর্মের মূল তাক্‌ওয়া

**হযরত ইমাম মাহদী (আ.)**

জগদ্বাসী তাদের সম্পদ ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর খোদাকে প্রধান্য দেয় না, কিন্তু তোমরা তাঁকে প্রাধান্য দাও, যাতে আকাশে তোমরা তাঁর জামা'তভুক্ত বলে গণ্য হতে পার। রহমতের নিদর্শন দেখানো আদিকাল থেকেই খোদা তা'লার রীতি, কিন্তু তোমরা এই রীতির দ্বারা তখনই উপকৃত হতে পারবে, যখন তাঁর এবং তোমাদের মধ্যে কোন দূরত্ব না থাকে এবং তোমাদের সন্তুষ্টি তাঁর সন্তুষ্টি ও তোমাদের ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছাতে পরিণত হয় এবং প্রত্যেক সফলতা ও বিফলতার সময় তোমাদের মস্তক তাঁর দ্বারে অবনত থাকবে যেন তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। যদি তোমরা এইরূপ কর, তাহলে সেই খোদা তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবেন, যিনি দীর্ঘকাল যাবৎ আপন চেহারা লুক্কায়িত রেখেছেন। তোমাদের মধ্যে কি কেউ আছে, যে এই উপদেশ মত কার্য করতে ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষী হতে এবং তাঁর 'কাযা' ও 'কদরে' (ফয়সালা ও নিয়তিতে) অসন্তুষ্ট না হতে প্রস্তুত?

**কেউ কখনো তাঁর নিকট গ্রহণীয় হবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক না হয়। বড় হয়ে ছোটকে অবজ্ঞা করবে না, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে।**

অতএব বিপদ দেখলে তোমরা আরও সম্মুখে অগ্রসর হবে, কারণ, এটাই তোমাদের উন্নতির উপায়। তাঁর তৌহীদ জগতে প্রচার করতে নিজেরা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর। তাঁর বান্দাগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর ও তাদেরকে নিজ জিহ্বা বা হস্ত দ্বারা বা অন্য কোনও উপায়ে উৎপীড়ন করো না এবং সৃষ্ট জীবের উপকার সাধনে সচেষ্ট থাক। কারো প্রতি, সে তোমার অধীনস্থ হলেও, অহঙ্কার দেখাবে না এবং কেউ গালি দিলেও তুমি গালি দিও না। বিনয়ী, সহিষ্ণু, সদুদ্দেশ্যপরায়ণ ও সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানভূতিশীল হও, যেন খোদা তা'লার নিকট গ্রহণীয় হতে পার। অনেকে এইরূপ আছে, যারা বাহ্যত: সরল, কিন্তু অভ্যন্তরে সর্প-বিশেষ। সুতরাং কেউ কখনো তাঁর নিকট গ্রহণীয় হবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক না হয়। বড় হয়ে ছোটকে অবজ্ঞা করবে না, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। বিদ্বান হলে, বিদ্যাহীনকে আত্মগরিমাবশত: অবমাননা না করে তাকে সুদপদেশ দিবে। ধনী হলে আত্মাভিমানে দরিদ্রের প্রতি গর্ব না করে তাদের সেবা করবে। ধ্বংসের পথ হতে সাবধান থাকবে। সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে। কোন সৃষ্ট জীবের উপাসনা করবে না। নিজ প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ হও। সংসার হতে মনকে নির্লিপ্ত রাখ এবং তাঁর জন্য সকল প্রকার অপবিত্রতা ও পাপকে ঘৃণা কর; কেননা তিনি পবিত্র। প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি তাক্‌ওয়ার সাথে রাত্রি যাপন করেছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি ভীতির সাথে দিন অতিবাহিত করেছো।

সুতরাং যে-ব্যক্তি আমার নিকট সত্যিকার বয়আত গ্রহণ করে সরল অন্তঃকরণে আমার অনুগামী হয় এবং আমার আনুগত্যে বিলীন হয়ে স্বীয় কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তির জন্যই এই বিপদসঙ্কুল দিনে আমার রূহ শাফায়াত (সুপারিশ) করবে। সুতরাং, হে লোক সকল! যারা নিজেকে আমার জামা'তভুক্ত বলে গণ্য করে থাক, আকাশে কেবল তখনই তোমরা আমার জামা'তভুক্ত বলে পরিগণিত হবে, যখন তোমরা সত্যিকারভাবে তাক্‌ওয়ার (খোদাভীরুতার) পথে অগ্রসর হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতিসহকারে এবং নিবিষ্ট-চিত্তে আদায় করবে, যেন তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে সাক্ষাৎভাবে দেখতে পাচ্ছো। নিজেদের রোযাও তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। যারা যাকাত দিবার উপযুক্ত, তারা যাকাত দিবে। যাদের জন্য হজ্জ ফরজ হয়েছে এবং তা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তারা হজ্জ করবে, সকল পুণ্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন এবং পাপকে ঘৃণার সাথে বর্জন করবে। নিশ্চয় স্মরণ রেখো, যে কোন কর্মই আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না যাতে তাক্‌ওয়া নেই। প্রত্যেক পুণ্য-কর্মের মূল তাক্‌ওয়া (কিশতিয়ে নূহ্ পুস্তকের বাংলা সংস্করণের ২২-২৩ ও ২৬-২৭ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত)।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

# ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

## (সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

**প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১**

**হযরত মির্যা গোলাম আহমদ**
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৯ম কিস্তি)

উপরোল্লিখিত সার্বিক এ আলোচনাটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের সদৃশের মত দাজ্জালেরও সদৃশ আছে এবং সেটি প্রকাশিত হবে অর্থাৎ নিজস্ব স্বভাব-চরিত্র, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে প্রথম দাজ্জালেরই সদৃশ স্বরূপ একটি দল বা সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে। কিন্তু 'মসীহ্‌র সদৃশ অবতীর্ণ হবেন' এবং 'দাজ্জালের সদৃশ 'খুরুজ' করবে তথা বাহির হবে'– হাদীসাবলীতে পৃথক ঐ দু'টি বাচনভঙ্গী অবলম্বনে বিশেষ এক হিকমত ও তাৎপর্য রয়েছে, যাতে করে ব্যক্ত করা হয় যে, দাজ্জালের আগমন হবে ভীতিকর বিপদ ও পরীক্ষাস্বরূপ এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমন হবে এমন নেয়ামত (তথা ঐশী অনুগ্রহ) স্বরূপ, যা বিশেষ ঐশী অভিপ্রায়ে মু'মিনদের সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। যেমন, কুরআন করীমে বর্ণিত আছে: 'আমরা তোমাদের জন্য লোহা অবতীর্ণ করেছি।' অর্থাৎ তিনি এগুলো তোমাদের হিতার্থে রহমত ও কল্যাণস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। আর এ তাৎপর্যও বিদ্যমান যে, যে-বস্তু মৃত্তিকা থেকে নির্গত হয় সেটি আঁধার ও স্থূলতা এবং কলুষযুক্ত হয়ে থাকে আর যা (উর্দ্ধলোক) থেকে আসে তার সাথে জ্যোতি ও আশিস থাকে। আর সেই সাথে যা ওপর থেকে আসে সেটি নিচেরটির ওপর প্রবল ও বিজয়ী হয়ে থাকে। মোটকথা যে-ব্যক্তি স্বর্গীয় আশিস ও কল্যাণ এবং স্বর্গীয় জ্যোতি সহকারে আসবেন তাঁর আগমনের জন্য 'নযুল' (অবতরণ) শব্দটিই যথাযথ ও সমীচীন বটে। আর যার অস্তিত্ব পার্থিব আঁধার কলুষ ও কদর্য ভরা তার বহি:প্রকাশের জন্য 'খুরুজ' শব্দটিই যথার্থ ও সমীচীন। কেননা জ্যোতির্ময় বস্তুসমূহ আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং পার্থিব আঁধারের ওপর প্রাধান্য লাভ করে।

এখানে এই গবেষণা বা তত্ত্বানুসন্ধান থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হলো যে, 'মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের আধ্যাত্মিকতা (গুণ ও বৈশিষ্টাবলী) ধারণ এবং হযরত মসীহ্‌র অস্তিত্বকে অভ্যন্তরীণভাবে প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সদৃশকে যেমন 'মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম' নামে অভিহিত করা হয়েছে, অনুরূপভাবে সেই দাজ্জাল (ইবনে সাইয়াদ) যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে মারা যায় তারই প্রতিচ্ছবি ও সদৃশ (প্রতিশ্রুত দাজ্জাল) আখেরী যুগে তার জায়গা নিলো এবং **গির্জা থেকে বের হয়ে পূর্ব ও পশ্চিমে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো**। এই বিবরণ থেকে 'সদৃশ এবং গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রতিচ্ছবি হওয়া'র পরিভাষাটির যথার্তা সাব্যস্ত হয়–যা উভয় দিক দিয়ে কল্যাণকর 'প্রতিশ্রুত মসীহ্' ও অকল্যাণকর 'খ্রিষ্টীয় দাজ্জাল' উভয়ের ওপর পরিব্যাপ্ত ও প্রযোজ্য। যদি বলা হয় যে হাদীসে তো এটুকু শব্দ বলা হয়েছে যে মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম অবতীর্ণ হবেন এবং দাজ্জাল 'খুরুজ' করবে, তারপরও এ উভয়ের সাথে 'সদৃশ' শব্দ কেন যোগ করা হয়? এটা কি 'ইলহাদ' নয়?

এর উত্তর হলো, কুরআন ও হাদীসের অকাট্য ও প্রকাশ্য ভাষ্য বা উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা আমরা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে এসেছি যে, হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম

যার ওপর ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল তিনি মারা গেছেন। আর তেমনি দাজ্জালও মারা গেছে। তাদের জীবিত থাকার কোনো উল্লেখ কুরআন করীম ও হাদীসে কোথাও মজুদ নেই। বরং প্রকাশ্য আয়াতসমূহ দুনিয়ায় তাদের প্রত্যাবর্তনকে শক্তভাবে অস্বীকার করে। তাই এমতাবস্থায় আমরা যদি আগমনকারী মসীহ্ এবং দাজ্জাল দ্বারা তাদের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবিকে বুঝায় বলে না ধরি তাহলে এছাড়া আর কী-বা করা যায়? (এছাড়া উপায়ন্তর নেই)। তবে হাদীস শরীফে যদি এ ভাষায় লিপিবদ্ধ হতো যে, সেই মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম যিনি মারা গেছেন যাঁর প্রতি ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল তিনি এবং দ্বীপে অবরুদ্ধ সেই দাজ্জাল যার সঙ্গে জাস্‌সাসা বা গুপ্তচারিণী ছিল তারা উভয়ে আখেরী যুগে জীবাতাবস্থায় উপস্থিত হবে, তাহলে কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ থাকতো না। কিন্তু এখন ব্যাখ্যা কেবল জায়েয বা বৈধই নয়, বরং 'ওয়াজীব' বা আবশ্যিকও বটে। আর যেহেতু **"উলামাউ উম্মতি কা-আম্বিয়ায়ে বনি-ইসরাঈল"**-এ হাদীসের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত ও নির্দেশনা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.)-এর সদৃশ-বিশেষ কারও আগমন আবশ্যিক ছিল, এমন কারও আসা আবশ্যিক ছিল যিনি প্রকৃতপক্ষে (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর) 'উম্মতি' হবেন স্বতন্ত্রভাবে নবী হবেন না। কাজেই এমনটি জরুরী ছিল যে, ঈসা-ইবনে-মরিয়মের জায়গায় (মুসলিম উম্মাহ্ থেকে) এমন কোন উম্মতি আবির্ভূত হতেন যিনি খোদা তা'লার দৃষ্টিতে ঈসা-ইবনে-মরিয়মের রঙে-রঙ্গীন তাঁরই সদৃশ।

অতএব, খোদা তা'লা মরিয়মপুত্র হযরত মসীহ্ (আ.)-এর 'সদৃশ'-কে যথাসময়ে পাঠিয়ে তাঁর এ সদৃশের মাধ্যমেই হযরত মসীহ্ (আ.)-এর প্রকৃতপক্ষে সত্যিসত্যি মারা যাওয়া প্রকাশ করে দেন এবং এর যাবতীয় দলিল-প্রমাণ খোলাসাভাবে তুলে ধরেন। কুরআন করীমে খোদা না করুন ঘুণাক্ষরেও যদি লিপিবদ্ধ হতো যে, সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ তা'লার নির্ধারিত অমোঘ বিধানের বিপরীতে হযরত মসীহ্কে জীবিতাবস্থায় আকাশের দিকে (ঊর্ধলোকে) ওঠানো হয়েছিল এবং তিনি কিয়ামত দিবসের আগ পর্যন্ত জীবিতই থাকবেন, তাহলে খ্রিষ্টানদের পক্ষে মানবদের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার বিপুল উপায়-উপকরণ হস্তগত হতো।

**অতএব খুবই ভাল হল, (কী চমৎকার এই ঐশী ব্যবস্থা) যে, খ্রিষ্টানদের 'খোদা' মারা গেল, (চূড়ান্তভাবে মৃত সাব্যস্ত হল) এবং এই হামলা একটি বর্শার আঘাতের চেয়ে কম (কার্যকরী) নয় যা এই অধর্ম কর্তৃক খোদা তা'লার পক্ষ থেকে মসীহ্-ইবনে মরিয়মের রঙে তাঁর সদৃশ হয়ে সেই দাজ্জাল স্বভাব লোকদের প্রতি সাধিত হয়েছে। এতে করে যাদের পবিত্র বস্তুসমূহ দান করা হয়েছিল, কিন্তু তারা এগুলোর সঙ্গে অপবিত্র ও পঙ্কিল বস্তুসমূহ মিশিয়ে দেয় এবং সেই কাজ করে যা বস্তুতঃ দাজ্জালের করণীয় ছিল।**

(চলবে)

ভাষান্তর: **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

# জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

# ভর্তি-বিজ্ঞপ্তি

উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীগণ এবং বিবিধ কারণে ১২মে ২০১৮ তারিখে নেয়া ভর্তি-পরীক্ষায় যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদেরকে সুযোগদানের উদ্দেশ্যে ১৩তম ব্যাচের শাহেদ কোর্সে আরো একটি ভর্তি-পরীক্ষা আগামী ২৫ ও ২৬ জুন ২০১৮ তারিখে নেয়া হবে, ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য, পূর্ব-ঘোষিত বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ভর্তিচ্ছুদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য তথ্যাদি যথারীতি অপরিবর্তীত থাকবে।

ভর্তিচ্ছুদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্যসম্বলিত কাগজপত্র সংযুক্ত করে আবেদনপত্রসহ আগামী ২৫জুন ২০১৮ বিকালে সরাসরি 'জামেয়া আহমদীয়া'-র অফিস-কক্ষে পৌঁছাতে হবে।

**মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী**
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

# ঈদুল ফিতরের খুতবা

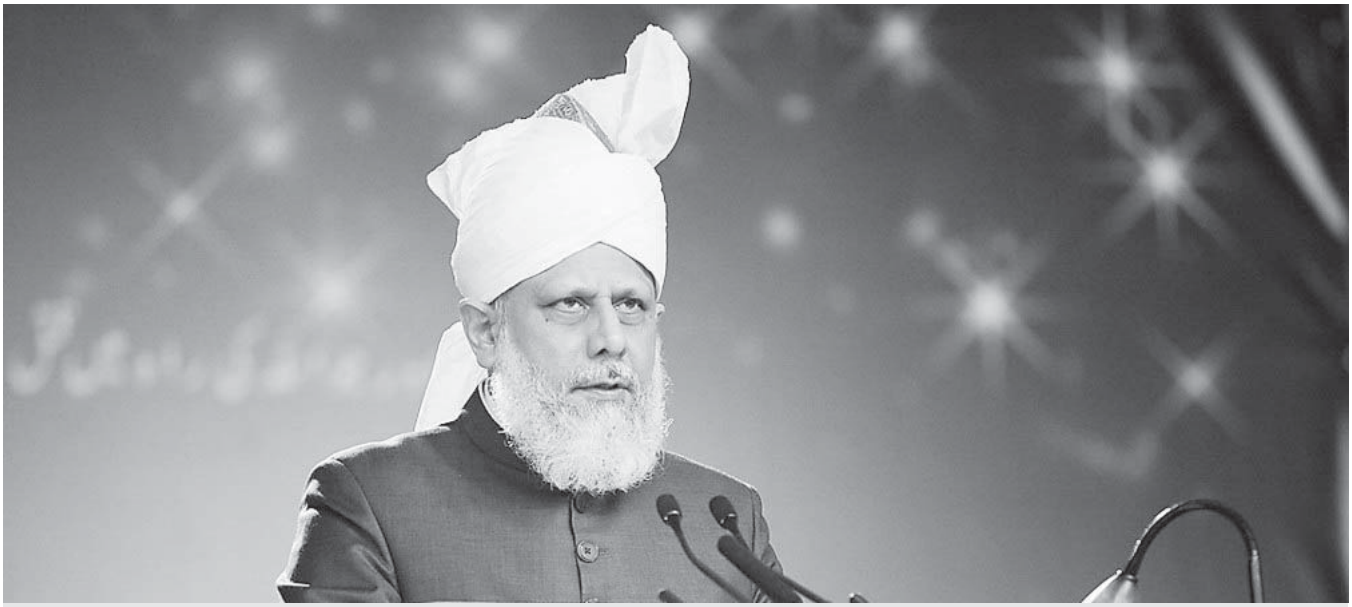

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৬ জুন ২০১৭ তারিখের ঈদুল ফিতরের খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ ঈদের দিন, খুশির দিন, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে আমরা ঈদ উদযাপন করি। আল্লাহ্ তা'লা মানুষের স্বভাব চরিত্রকে দৃষ্টিপটে রেখে ঈদের খুশি উদযাপনের দিন নির্ধারণ করেছেন। মানবীয় স্বভাব এটি চায় যে সে তার নিজের লোকদের সাথে , বন্ধুদের সাথে একত্রে আনন্দ করবে আর এমন উপায় উপকরন সৃষ্টি করে যখন কিনা এভাবে একত্রিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ হয়। পৃথিবীতে আমরা দেখি অন্যান্য জাতি সমুহ এবং অন্যান্য ধর্মেও এই মানবীয় স্বভাব অনুযায়ী তারাও নিজেদের খুশি, আনন্দ উদযাপনের দিন নির্ধারন করে রেখেছে কিন্তু এই সব জাতিসমুহের আনন্দের দিনে সেই সমষ্টিগত আনন্দ পরিলক্ষিত হয়না যা ইসলামের মাঝে রয়েছে। ইসলামী ঈদ ও খুশির দিনে এটিও একটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যে এই দিনে ঈদের নামায ও ঈদের খুতবাও রয়েছে। রসুল করীম (সা.) আমাদেরকে ঈদের খুতবা পাঠ করে বলেছেন যে, যেখানে লোকেরা ঈদের খুশি উদযাপন করবে সেখানে যেন তারা খোদা তা'লার কথাও শুনে এবং তাঁর ইবাদত করার জন্যও যেন একত্রিত হয়। আল্লাহ তা'লা মানুষের উপর যে দুটি দায়িত্ব অর্পন করেছেন সেটিও যেন প্রকাশিত হয়। সেই দুটি দায়িত্ব কি? একটি হল আল্লাহ্‌র অধিকার আদায় করা এবং অপরটি হল বান্দার অধিকার আদায় করা। এখন আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায় করার জন্য আমরা অন্যান্য দিনগুলোতেও ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি দেই এবং পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করি। অতএব ঈদের দিনে এই খুশি উদযাপনের দিনে আমাদের উপর ছয়টি নামায ফরয হয়ে যায়।একজন জাগতিক ব্যক্তি তো এটিই বলবে যে এটি ভালো ঈদ যাতে আনন্দ ও খেলাধুলার পরিবর্তে নামায আবশ্যকীয় করা হয়েছে তারপর আবার ইবাদতের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছে। কিন্তু একজন প্রকৃত মোমেন এটি মনে করে যে প্রকৃত খুশি তো এরই মাঝে নিহিত যখন কিনা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা হয় এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়, তিনি আমাদের এই সুযোগ প্রদান করেছেন, যখন আমরা তাঁর ইবাদতের অধিকার আদায় করব, তাঁর বান্দার অধিকারও আদায় করব সেই সাথে নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে একত্রে আনন্দও উদযাপন করব। এই দিনে যখন কিনা আমাদের উপর ছয়টি নামায ফরয হয়ে যায় সেই সাথে আমরা এটিও জানি যে তখন আমরা সুরা ফাতিহাও অতিরিক্ত পাঠ করি। সুরা ফাতিহা প্রত্যেক নামাযে এবং প্রত্যেক রাকাআ'তে পড়া আবশ্যকীয়।সুরা ফাতিহায় আমরা যখন 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' বলি আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি তখন এটি আল্লাহ্ তা'লার হামদ, তাসবীহ ও তাহমীদ। অন্যান্য দিনগুলোতে আমরা ফরয নামায ও সুন্নত নামাযগুলোতে ৩২ বার সুরা ফাতিহা পাঠ করি 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' বলি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আর ঈদের দিনে ৩৪ বার 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' পাঠ

করে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, যারা নফল আদায় করেন তারা তো এর চেয়েও বেশি পাঠ করে থাকেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ শব্দের মাঝে মুসলমানদের এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে যখন তাকে প্রশ্ন করা হবে ও জিজ্ঞেস করা হবে তার প্রভু-প্রতিপালক কে? তখন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এটি ওয়াজিব, তারা এই উত্তর দিবে যে আমার প্রভু-প্রতিপালক তিনি যার জন্য সকল প্রশংসা এবং প্রত্যেক ধরনের উৎকর্ষতা ও মহিমা আল্লাহ্ তা'লার জন্যই।

পুনরায় আলহামদুলিল্লাহ সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট করতে গিয়ে এক স্থানে সুরা ফাতেহা সম্পর্কে তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ যার অর্থ হল সকল প্রশংসা ও গুনকীর্তন সেই সত্ত্বার জন্যই যার নাম আল্লাহ্। আর এই বাক্য আলহামদুলিল্লাহ দ্বারা এ কারনে শুরু হয়েছে যে, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হল খোদা তা'লার ইবাদত যেন আত্মার আবেগ, অনুরাগে ও ভালোবাসায় হয়। ইবাদত যেন শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে মাথা থেকে বোঝা নামানোর জন্য না হয় বরং অন্তর থেকে হয় এবং ইবাদতের জন্য যেন একটি অনুরাগের সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, আর এমন অনুরাগ যা প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসায় পরিপুর্ণ তা কখনই কারো জন্য সৃষ্টি হতে পারে না যতক্ষন পর্যন্ত না এটি প্রমানিত হয় যে সে ব্যক্তি এমন গুনাবলীর আধার যাকে দেখে অবলীলায় হৃদয় প্রশংসা করতে থাকে। মানুষ যদি গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে তাহলে দেখবে যে আল্লাহ্ তা'লাই সেই সত্ত্বা যার জন্য প্রকৃত প্রশংসা ও গুণকীর্তন হতে পারে কেননা তিনিই সকল গুণাবলীর আধার। তিনি বলেন, এটি প্রকাশ থাকে যে পরিপুর্ণ প্রশংসা দুই ধরনের বৈশিষ্ট্যের জন্য হয়ে থাকে, একটি হল সৌন্দর্য্য এবং অপরটি হল অনুগ্রহ। যখন কারো মাঝে এই দুইটি বিষয় থাকে কেবল তখনই তার প্রশংসা হতে পারে, একটি তার সৌন্দর্য এবং অপরটি অনুগ্রহ। মানুষ কেবল তখনই প্রশংসা করে ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। তিনি বলেন আর যখন কারো মাঝে এই দুটি বৈশিষ্ট্য একত্রে থাকে তখন তার জন্য হৃদয় উৎসর্গীকৃত হয়ে যায় এবং কুরআন শরীফের বড় অর্থ এটিই যে খোদা তা'লার দুটি বৈশিষ্ট্যই সত্বান্বেষীদের কাছে প্রকাশ করে যেন এই অতুলনীয় সত্ত্বার দিকে লোকেরা আকৃষ্ট হয়। পবিত্র কুরআন করীমও এটিই চায় যে আল্লাহ্ তা'লার এই অপরুপ সৌন্দর্য ও অপার অনুগ্রহ যেন লোকদের কাছে প্রকাশিত হয় যেন লোকেরা আল্লাহ্ তা'লার দিকে একটি বিশেষ অনুরাগ, আবেগ ও ভালোবাসা নিয়ে আসে। তিনি বলেন, হৃদয়ের আবেগ ও ভালোবাসায় যেন তাঁর ইবাদত করা হয়। তিনি বলেন যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা সকল গুনাবলীর আধার এ কারনে সব ধরনের গুণ বা বৈশিষ্ট্য এতে রয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁর সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে কেননা সকল গুণাবলী এতে একত্রিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় মানুষ কেননা মানুষ আল্লাহ্ তালার সকল সৃষ্টি থেকে উপকৃত হয়। মানুষের উপর আল্লাহ্ তা'লার এটি অনেক বড় অনুগ্রহ যে আল্লাহ্ তা'লা যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন তা মানুষের উপকারের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষ যখন ইচ্ছে তখনই তা থেকে উপকৃত হতে চাইলে হতে পারে। অতএব আমাদের কতটা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে তাঁর গুনাবলী থেকেও যে সৌন্দর্য বিকশিত হচ্ছে এবং তাঁর অনুগ্রহ থেকেও যা পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুর কল্যাণের জন্য প্রকাশিত হচ্ছে আর এ থেকে মানুষ সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে।

অতএব আমদের উপর এটি আবশ্যকীয় যে আমরা যেন আন্তরিকভাবে তাঁর ইবাদতের অধিকার আদায় করি। আর এ বিষয়টি এটিও দাবি রাখে যে, আমরা যেন প্রকৃত ইবাদতকারী হই এবং তাঁর আদেশ নিষেধের উপরে আমলকারী হই। আর মুসলমান হিসেবে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন একজন সাধারণ মানুষের তুলনায় আমাদের উপর অনেক বেশি আবশ্যকীয়। মুসলমান হওয়ার কারণে আমাদের উপর আল্লাহ তা'লা তাঁর অধিকারের পাশাপাশি এটিও দায়িত্ব বর্তায় যে আমরা যেন বান্দার অধিকার আদায়কারী হই। আল্লাহ্ তা'লার এই সৌন্দর্য্য ও অনুগ্রহ যার বহিঃপ্রকাশ তিনি স্বীয় বান্দাদের সাথে করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য এটিও আবশ্যকীয় যে আমরাও যেন আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির সাথে নিজেদের সাধ্যানুযায়ী সদাচরণ করি। আর যদি আমরা এমনটি করি কেবল তবেই আমরা 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' -এর সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করে তারপর এটিকে নিজেদের অবস্থার মাধ্যমে প্রকাশকারী হব। যেখানে ইবাদতের অধিকার আদায় করার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি অধিকারও আদায়কারী হব। নিজ ভাইদের সাথে আচরণ করা, শান্তি, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার বার্তা চারপাশে ছড়িয়ে দেয়া এবং সমাজে ভালবাসার সাথে বসবাস করা একে অপরের অধিকার প্রদান করে বসবাস করা প্রকৃত ও যথার্থ ঈদের আনন্দ উযাপনকারী হিসেবে পরিণত করে।

অতএব এই দিকে আমাদের আনন্দের দিক থেকেও চেষ্টা প্রচেষ্টা করা উচিত। শুধু মাত্র ব্যক্তিগত আনন্দই যেন না হয় বরং পরিবেশের প্রতিটি স্তরে আমরা যেন আনন্দ পৌঁছাতে পারি। এ বিষয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনেকগুলো উদ্ধৃতি রয়েছে। সেখান থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি যা আমাদেরকে বলে দেয় যে, কিভাবে আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী সদগুণাবলীর উৎকর্ষতা অর্জন করতে পারি। যাদের যতটুকু সাধ্য ও সামর্থ্য রয়েছে তাদের এর উপরে আমল করা উচিত। কেননা প্রকৃত ঈদের আনন্দ আমরা তখনই অর্জন করতে পারব যখন আমরা এই মান অর্জনের চেষ্টা করব। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, "খোদা তা'লার সাথে পবিত্র সম্পর্ক স্থাপনের নাম নেকী বা পূণ্যকর্ম। আর প্রতিটি শিরা উপশিরায় তাঁর প্রেম সঞ্চারিত হওয়া, যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান ওয়া ইতাইযিল কুরবা'।

তিনি বলেন, খোদা তা'লার সাথে ন্যায় বিচার এটিই যে তাঁর অনুগ্রহরাজিকে স্মরণ করে তাঁর আনুগত্য করা (আল্লাহ্ তা'লার অগণিত অনুগ্রহরাজি রয়েছে সেগুলোকে স্মরণ কর এবং তারপর খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। তাঁর আনুগত্য কর। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন কর। এটিই আল্লাহ্ তা'লার সাথে ন্যায় বিচার করার অর্থ) কাউকে তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করো না এবং তাঁকে স্বরূপ জানো। (আল্লাহ্ তা'লার স্বরূপ এবং তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে জানো) আর এবিষয়ে যদি উন্নতি সাধন করতে চাও (তবে পরবর্তী ধাপ হলো) ইহসান বা অনুগ্রহ। (এখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মানুষ কী অনুগ্রহ করবে) তিনি বলেন, আর তা হলো, তাঁর সত্তার উপর এমনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যেন সে স্বয়ং তাঁকে দেখছে। (আল্লাহ্ তা'লার সত্তার উপর এমন বিশ্বাস যেন হয়ে যায় যে মানুষ সর্বদা এটি মনে করে যে, আমি খোদা তা'লাকে দেখছি)। আর যারা তোমার সাথে সদাচরণ করে নি তাদের সাথেও সদাচরণ কর। আর

যদি তার চেয়ে বেশি সদাচরণ চাও তবে নেকীর আরেকটি ধাপ হলো প্রকৃতিগতভাবেই খোদা তা'লাকে ভালবাস। বেহেশতের আকাঙ্খাতেও নয় এবং দোযখের ভয়েও নয়। (লোকদের সাথেতো মানুষ এমন করে যে, যাদের সাথে সদাচরণ করা হয় নি তাদের সাথে তার চেয়ে বেশি সদাচরণ করে মানুষ, কিন্তু এটি নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কাছে এ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছার জন্য কী করা প্রয়োজন। প্রকৃতগতভাবেই আল্লাহ্ তা'লাকে ভালবাস। আল্লাহ্ তা'লাকে আমাদের ভালবাসা উচিত। কেননা তাঁর গুণাবলি অগণিত এবং তাঁর অনুগ্রহও অগণিত রয়েছে। একারণে নয় যে, এর প্রতিদানে আমরা জান্নাত লাভ করব বা না করার কারণে জাহান্নামের ভয় থাকবে)। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে আল্লাহ্ তা'লাকে ভালবাস। এই মর্যদা হলো আল্লাহ্ তা'লার ইতাইযিল কুরবা। তিনি বলেন, বরং যদি আবশ্যকীয় করা হয়, না জান্নাত রয়েছে না দোযখ। তবুও ভালাবাসার প্রেরণা ও আনুগত্যে যেন তারতম্য না আসে।এমন প্রেম ভালবাসা যখন আল্লাহ্ তা'লার সাথে হবে তখন এতে একটি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে। আর এতে কোন ঘাটতি থাকবে না।

পুনরায় তিনি বলেন, সৃষ্টজীবের সাথে এমন আচরন কর যেন তুমি তাদের প্রকৃত আত্মীয়। এ স্তর সবচেয়ে অগ্রগন্য কেননা অনুগ্রহের মাঝে একটি ধাতু লোক দেখানো হয়ে থাকে আর যদি কেউ অকৃতজ্ঞতা করে তখন অনুগ্রকারী তৎক্ষনাত বলে উঠে যে আমি তোমার সাথে অমুক অনুগ্রহ করেছি। কিন্তু শিশুর সাথে মায়ের যে স্বভাবজ প্রকৃত ভালোবাসা এর সাথে কোন ধরনের লৌকিকতা বা স্বার্থ থাকেনা (না কোন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করে থাকে আর না কোন স্বার্থে করে থাকে)। বরং যদি কোন বাদশাহ একজন মা কে এই আদেশ দেয় যে তুমি যদি এই শিশুকে হত্যাও কর তবুও তোমাকে কোন জবাবদিহিতা করতে হবে না। সেই মা কখনও এই কথাতে সম্মত হবেনা বরং সে এই বাদশাহকে গালি দিবে। যদিও সে জানে যে এই শিশুর যুবক বয়সে উপনীত হতে হতে সে মারা যাবে কিন্তু তারপরও ব্যক্তিগত ভালোবাসার কারনে সে শিশুর প্রতিপালন পরিত্যাগ করবে না। তিনি বলেন অধিকাংশ সময় মা বাবা বৃদ্ধ হয়ে যান এবং তাদের সন্তান হয়। সন্তানের থেকে উপকৃত হওয়ার কোন আশা বাহ্যত তাদের থাকেনাকিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাকে ভালোবাসে এবং তাকে লালন পালন করে। এটি একটি প্রকৃতিগত বিষয়, যে ভালোবাসা এ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যায় এরই ইঙ্গিত ইতাইযিল কুরবা এর মাঝে করা হয়েছে। এ ধরনের ভালোবাসা খোদা তা'লার সাথে হওয়া উচিত, না কোন পদমর্যাদার আকাঙ্খায় আর না কোন লাঞ্ছনার ভয়ে।

এই উদ্ধৃতির মাঝে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আমাদেরকে আমাদের দুই ধরনের অধিকারের ধাপ অর্জনের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়েছেন। আল্লাহ তা'লার অধিকার ও তাঁর সাথে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ এবং আলহামদুলিল্লাহ এর প্রকৃত তত্ত্ব ও আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহ তা'লার বান্দার সাথে উত্তম আচরন ও সম্পর্কের ধাপ সম্পর্কেও বলে দিয়েছেন আর এটিই সেই নীতি যা পৃথিবীর প্রকৃত আনন্দ ও শান্তির নিরাপত্তা বিধায়ক হতেপারে।

তারপর সৃষ্টজীবের অধিকার ও নিজেদের সাথে সম্পর্ককে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ককে আরো সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ননা করেছেন। বিষয় তো তাই কিন্তু কিছু বাক্যে নতুন কিছু এসে যায়। তিনি বলেন, খোদা তা'লা তোমাদের থেকে কি চান, শুধু এতটুকুই যে তোমরা মানবজাতির সাথে ন্যায়বিচার কর। এরচেয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে তাদের সাথেও নেকী কর যারা তোমাদের সাথে কোন ধরনের নেকী করেনি। তারচেয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে তোমরা সৃষ্টিকর্তার সাথেএমন সহানুভূতি প্রদর্শন কর যেন তোমরা তাঁর প্রকৃত আত্মীয়।

এখন দেখুন পুন্যকাজের মেরাজ সম্পর্কে কি বলা হয়েছে, বলা হয়েছে যারা নেকী করেনা তাদের সাথেও নেকী কর। এটিই একজন প্রকৃত মোমেনের বৈশিষ্ট্য। যারা নেকী করে, কোন ধরনের অনুগ্রহের আচরন করে তাদের সাথে তো তোমরাও নেকী করেই থাক কিন্তু যারা নেকী করছেনা তাদের সাথে নেকী করাই হচ্ছে প্রকৃত নেকী। পুনরায় তিনি বলেন, তোমরা সৃষ্টিকর্তার সাথে এমন সহানুভূতি প্রদর্শন কর যেন তোমরা তাঁর প্রকৃত আত্মীয়, যেভাবে মায়েরা তাদের সন্তানদের সহানুভূতি প্রদর্শন করে থাকে। এখন যারা নেকী করেনা তাদের শুধুমাত্র ন্যায়বিচারই করোনা বরং তাদের প্রতি অনুগ্রহও কর। তিনি বলেন তারপর অনুগ্রহের চেয়ে আরো একটু অগ্রসর হয়ে তাদের সাথে সেভাবে আচরন কর যেভাবে মায়েরা তাদের সন্তানদের সাথে আচরন করে থাকে। কেননা অনুগ্রহের মাঝে এক ধরনের লৌকিকতা প্রচ্ছন্ন থাকে আর কখন কখন অনুগ্রহকারী তার অনুগহের খোঁটাও দিয়ে থাকে। কিন্তু সে যে কিনা মায়ের মত প্রকৃতিগত কারনে নেকী করে সে কখনও লৌকিকতা করতে পারেনা। অতএব নেকীর শেষ পর্যায় হল প্রকৃতিগত জোশ যা মায়ের মত হয়। আর এই আয়াত শুধুমাত্র সৃষ্টজীবের জন্যই নয় বরং খোদা তা'লা সম্পর্কিতও। খোদা তা'লার সাথে ন্যায়বিচার বলতে বুঝায় তাঁর অনুগ্রহরাজিকে স্মরন করে তাঁর আনুগত্য করা। একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করেছেন। আর খোদা তা'লার সাথে অনুগ্রহ করার অর্থ হল তাঁর সত্ত্বায় এমন ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যেন তাঁকে দেখছে। আর খোদা তা'লার সাথে 'ইতাইযিল কুরবা' এর অর্থ হল তাঁর ইবাদত যেন জান্নাতের আকাঙ্খায় বা জাহান্নামের ভয়ে না হয় বরং যদি বলা হয় যে না জান্নাত আছে না জাহান্নাম, তখনও যেন ভালোবাসা ও আনুগত্যে যেন কোন পার্থক্য না আসে। ছোট ছোট বিষয়ে লোকেরা বলে বসে যে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শুনেননি, এই সমস্যা হয়েছে, অমুক সমস্যা হয়েছে ফলে আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে অভিযোগ সৃষ্টি হতে থাকে। তাঁর অনুগ্রহরাজিকে স্মরন করেনা। অতএব তিনি বলেন, তাঁর অনুগ্রহরাজিকে স্মরন কর তাঁর পুরস্কার সমুহকে স্মরন কর এবং প্রকৃতিগত জোশের সাথে তাঁকে ভালোবাস। অতএব এ হল মানদণ্ড যা আমাদের অর্জন করতে হবে আর প্রকৃত খুশি আমরা তখনই লাভ করব যখন আমরা এটি লাভ করব। আমাদের উপর আল্লাহ্ তা'লার অগণিত অনুগ্রহ রয়েছে আর দৈনিক আমরা এর চেয়েও বেশি অনুগ্রহ লাভ করে থাকি এগুলোকে স্মরন করে আল্লাহ তা'লার আনুগত্য করাএকটি বিষয়। আর এমন অনেকেই আছে যারা আলহামদুলিল্লাহ বলার পর তাঁর কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করে না। অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ পর্যন্ত বলেনা বা কোন ভাবেই কোন বাক্যের মাধ্যমেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। আর খুশির মুহুর্তে তো একেবারেই ভুলে যায় যে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের থেকে কি চান। তারপর মানুষ আল্লাহ্ তা'লার সাথে আর কি অনুগ্রহ করবে। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যিনি সব সময় আমাদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন ও তরবীয়ত করে থাকেন তিনি বলেন যে আল্লাহ্ তা'লার সাথে অনুগ্রহের সম্পর্ক এটি যে তাঁর অনুগ্রহরাজিকে স্মরন করে তাঁর সাথে সম্পর্কের দিক থেকে এতটা

অগ্রসর হও যে তুমি স্বয়ং খোদা তা'লাকে দেখছ। একজন প্রকৃত মোমেনের লক্ষন এটিই। আল্লাহ্ তা'লা এই অবস্থা আমাদের নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করার তৌফিক দান করুন আর আমরা যেন তাঁর এভাবে ইবাদতকারী হই যাতে কোন স্বার্থ থাকবে না আর তা যেন শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাতেই হয়। আর শুধুমাত্র যেন তাঁর অনুগ্রহরাজিকে সামনে রেখে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা না হয়। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরো বিস্তারিতভাবে বলেন। হুজুর বলছেন বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য আরো কয়েকটি উদ্ধৃতি পাঠ করব। তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, তোমাদের জন্য খোদা তা'লার নির্দেশ এই যে তোমরা তাঁর সাথে এবং তাঁর সৃষ্টির সাথে ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অধিকার ও বান্দার অধিকার প্রদান কর আর এর চেয়েও যদি বেশি কিছু করতে পার তাহলে শুধু ন্যায় প্রতিষ্ঠাই নয় বরং অনুগ্রহ কর অর্থাৎ অবশ্য করণীয় এর চেয়েও বেশি এবং এমন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে খোদা তা'লার ইবাদত কর যেন তুমি খোদা তা'লাকে দেখছ। অবশ্য করণীয় ইবাদত তো আল্লাহ্ তা'লাই ফরয করেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায রয়েছে,ঈদ এবং জুমআ ফরয করেছেন। আর প্রকৃত অনুগ্রহ হল তাঁর ইবাদতের অধিকার আদায় করা, নফলসমুহ ও মানুষের প্রশংসা করার দিকেও যেন মনোযোগ নিবদ্ধ হয় এবং লোকদের সাথে মানবতাপুর্ণ সদাচরন কর। যার যতটুকু ভালোবাসা, আদর-স্নেহ পাওয়ার অধিকার আছে তার চেয়ে বেশি ভালোবাস, আদর স্নেহ কর। আর যদি এর চেয়েও বেশি করা সম্ভব হয় তাহলে কোন উদ্দেশ্য ছাড়া এবং নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত এবং সৃষ্টির সেবা কর যেভাবে কোন নিকটাত্মীয় করে থাকে। পুনরায় মানবজাতির সাথে সহানুভূতি ও উত্তম আচরন সম্পর্কে কুরআনের শিক্ষা সুস্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, নিজ ভাইদের সাথে ও মানবজাতির সাথে ন্যায় বিচার কর এবং নিজ অধিকারের চেয়ে বেশি কিছু আবেদন কর না এবং ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। কোন প্রকার বাড়াবাড়ি তার সাথে করনা, যতটুকু অধিকার প্রাপ্য ততটুকু নাও কিন্তু অন্যের অধিকার হরন করে নিজের প্রাপ্য অধিকারের চেয়ে বেশি আদায় করতে যেও না। কেননা এটি ন্যায় বিচারের দাবী পূর্ণ করে না। একারনে ন্যায় বিচার হল ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং নিজের অধিকারের চেয়ে বেশি কিছু আকাঙ্খা করনা। কতক লোক মোকদ্দমার সময় নিজ অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়। তিনি বলেন যদি এ পর্যায় থেকে উন্নতি করতে চাও তাহলে রয়েছে অনুগ্রহের স্তর আর তা হল তুমি তোমার ভাইয়ের মন্দের বিপরীতে নেকী কর। প্রথমে যিনি নেকী করেনি তার সাথেও নেকী কর। তিনি বলেন তোমার সাথে যে খারাপ আচরন করছে, তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তার সাথেও নেকী কর এরই না এহসান বা অনুগ্রহ। আর তার দেয়া কষ্টের বিপরীতে তুমি তাকে আরাম পৌঁছাও। সে তোমাকে দুঃখ দিলে তুমি তাকে আনন্দ দাও,আরাম দাও এবং উত্তম আচরন কর তার সাথে এবং তাকে সাহায্য কর। তিনি বলেন এরপর হল ইতাইযিলকুরবা এর স্তর আর তা হল তুমি যতটুকু তোমার ভাইয়ের সাথে নেকী করবে বা যতটুকু মানবজাতির সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন করবে এরচেয়ে অন্য কোন ধরনের অনুগ্রহ গ্রহনীয় নয় বরং প্রকৃতিগতভাবে অনিচ্ছায় কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত তা তোমার দ্বারা সংঘটিত হয়, যেভাবে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কারনে এক আত্মীয় অপর আত্মীয়ের সাথে নেকী করে থাকে। একজন নিকটাত্মীয় নিকটাত্মীয়ের সাথে, এক ভাই অপর ভাইয়ের সাথে এবং এক মা তার সন্তানের সাথে যেভাবে করে থাকে ঠিক সেভাবেই নেকী কর।

অতএব এটি চারিত্রিক উন্নতির শেষ মার্গ। চারিত্রিক উনইতর শেষ মার্গ হল এভাবে নেকী কর। আর এরই নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা প্রদান করেছেন যে সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির ক্ষেত্রে যেন কোন ধরনের ব্যক্তি স্বার্থ ও উদ্দেশ্য না থাকে বরং ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও মানবীয় আত্মীয়তার জোশ এই উত্তম পর্যায়ে যেন উন্নীত হয় যে স্বয়ং কোন ধরনের কষ্ট, রীতি নীতির কারনে কোন ধরনের কৃতজ্ঞতা,বা দুআ বা অন্য কোন ধরনের প্রতিদানের আশায় না হয়ে তা যেন শুধুমাত্র প্রকৃতিগত জোশের সাথে সম্পাদিত হয়। এমন ভাবে যেন হয় যে এতে কোন কষ্ট যেন না হয়, কোন আকাঙ্খাও যেন না থাকে যে মানুষ আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে আর আমি যদি তার জন্য নেকী করি তাহলে সে আমার জন্য দোয়া করবে। কোন ধরনের আকাঙ্খা ব্যতীত যদি নেকী কর তাহলেই তা প্রকৃত নেকী যা প্রকৃতিগত জোশের দ্বারা হবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন সম্পর্কে বারংবার একাধিক স্থানে আমাদের নসীহত করেছেন বরং এক স্থানে তিনি এটিও বলেন যে কতক লোক এমন রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র অধিকার আদায় করে,নামাযও পড়ে, রোযাও রাখে বাহ্যত খুবই ইবাদতকারী ও নেক মনে হয় কিন্তু যেখানেই সৃষ্টজীবের অধিকার প্রদানের বিষয় সামনে আসে সেখানে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়ে যায়, তার নেকীর মানদণ্ড বদলে যায় আর এটিই বাস্তবতা। আমার কাছেও লোকেরা মাঝে মধ্যে লিখে থাকেন লোকদের প্রকৃত আচরন সম্পর্কে। বাস্তবে এমনটিই হয়ে থাকে বরং কিছু মহিলা তো তাদের স্বামীদের সম্পর্কে লিখে আর কিছু বাচ্চারা তাদের বাবা সম্পর্কে লিখে যে আমাদের স্বামী বা বাবা মসজিদেও যায় জামাতের কাজও করে কিন্তু ঘরে তাদের আচরন খুবই খারাপ। বরং এমনটি দেখে কতক বাচ্চার উপর এমন নেতীবাচক প্রভাব পরে যে তারা জামাত থেকে ও জামাতী কর্মকাণ্ড থেকেও দুরে সরে যায়। যদি স্ত্রী সন্তানের উপর কোন স্বামী বা পুরুষের অভিযোগ থাকে তাহলে তাদের সাথে বাড়াবাড়ি না করে তাদেরকে আরামের সাথে ভালোবাসার সাথে বুঝানো যেতে পারে। বান্দার অধিকার শুধু এতটুকুই নয় যে বাইরে লোকদের সামনে যেয়ে কাউকে সাহায্য করা ও খেদমত করা বরং সর্ব প্রথম ও আবশ্যকীয় দায়িত্ব হল নিজ ঘরে অদিকার প্রদান করা। বাইরে যেয়ে অন্যদের সাথে নিকটাত্মীয়ের আচরন করবে আর যারা নিকটের তাদের সাথে দুরের লোকদের ন্যায় আচরন করবে এটি কোন ভাবেই বৈধ নয়। আল্লাহ্ তা'লাও উত্তম আচরনের যে ধারাবাহিকতা বর্ননা করেছেন এতেও নিকটাত্মীয় থেকেই শুরু করেছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন করীমে বলেন,

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ﴿۳۷﴾

(সূরা আন নিসা: ৩৭) অর্থাৎ আর তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাহার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না, পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতীম, অভাবী, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয়

প্রতিবেশী, সঙ্গীসহচর, পথাচারী ও তোমাদের অধিকারভুক্তদের সাথেও (সদয় ব্যবহার কর)। নিশ্চয়ই অহংকারী ও দাম্ভিককে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

অতএব এটিই সেই ধারাবাহিকতা যা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। মা বাবার পরে সবচেয়ে কাছের লোক হল স্ত্রী, সন্তান, ভাই, বোন তারপর সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি। এর ও প্রকারভেদ রয়েছে যেমন প্রতিবেশি, আত্মীয় প্রতিবেশি, অনাত্মীয় প্রতিবেশি রয়েছে বরং প্রতিবেশির তালিকা তো এত দীর্ঘ যে এক স্থানে তিনি বলেন তোমাদের আশপাশের চল্লিশ ঘর, শতশত ঘর পর্যন্ত তোমাদের প্রতিবেশিই প্রতিবেশি। তারপর কোন সভাতে সাথে যারা বসেন, মসজিদে আসেন, জুমআতে আসেন এরা সবাই প্রতিবেশি হয়ে যায়। মুসাফিরদের সাথে যখন সফর করা হয় তখন তারাও প্রতিবেশি হয়ে যায় তখন তার সাথেও উত্তম আচরন করা এবং যার অধিনস্থ হয়েছে তার সাথে উত্তম আচরন করা, তাদের সকলের সাথে সহানুভিুতি প্রদর্শন করা। এটিও স্মরন রাখা উচিত যে এই ধারাবাহিকতায় সকলের অধিকারও প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। এমন নয় যে একজনের অধিকার আদায় করবে আর অন্য জনের অধিকার আদায় করবে না বরং প্রত্যেকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। একারনে কারো অধিকার খর্ব হওয়া উচিত নয়। পুনরায় তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করিওনা, নিজ পিতা মাতার সাথে সদাচরন কর এবং নিকটাত্মীয়ের সাথেও। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন, এ বাক্যে সন্তান সন্ততি, ভাই, কাছের ও দুরের সকল আত্মীয়ই এর মাঝে চলে এসেছে। পরিবারের সদস্যরা, সন্তান সন্ততি, ভাই, কাছের ও দুরের সকল আত্মীয়ই চলে এসেছে এই আত্মীয়তার মাঝে।তিনি বলেন, এতীমদের সাথেও অনুগ্রহ কর এবং মিসকীনদের সাথেও আর এমন প্রতিবেশি যারা তোমার পরিচিত ও অপরিচিত আর এমন বন্ধু ও সাথী যে কোন কাজে অংশ নিয়েছিল বা কোন সফরে অংশ নিয়েছিল বা নামাযে অংশ নিয়েছিল বা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে অংশ নিয়েছিল , আর তারা যারা মুসাফির এবং সেই সকল প্রানী যারা তোমাদের আয়ত্বে রয়েছে প্রত্যেকের সাথেই এহসান বা অনুগ্রহ কর। খোদা তা'লা এমন ব্যক্তিকে নিজের বন্ধু হিসেবে রাখেন না যারা দাম্ভীক, অহংকারী এবং অন্যের প্রতি দয়া বা অনুগ্রহ করেনা।

এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা অন্যত্র প্রদান করেছেন যে তোমরা মা বাবার সাথে সদাচরন কর, নিকটাত্মীয়ের সাথে, এতীমদের সাথে, মিসকীনদের সাথে, তোমাদের আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশির সাথে, চাকরের সাথে ও দাসদের সাথে সদাচরন কর। তারপর প্রাণীদের উল্লেখ রয়েছে। প্রথমে শুধু প্রাণীর উল্লেখ ছিল তারপর এর বিস্তারিতও উল্লেখ করেছেন, ঘোড়া, ছাগল, মহিষ, গরু এবং চতুষ্পদ জন্তু যা তোমাদের আয়ত্বে রয়েছে কেননা তোমাদের খোদা তা'লা উদাসীন ও স্বার্থপরদের ভালোবাসেন না। এই সহানুভূতির স্পৃহা ও নেকী করাকে তিনি চতুষ্পদ জন্তু পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। যেমন তিনি নাম নিয়ে নিয়ে স্পষ্ট করেছেন। অতএব, যেখানে চতুষ্পদ জন্তুর সাথেও আমাদের সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে সেখানে নিজেদের পরিবার ও স্ত্রী সন্তানদের কতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তারপর ঠিক একই ভাবে পর্যায়ক্রমে বাকীদের সাথে (সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে)।

যারা অধিকার আদায় করেন না তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটি দাম্ভীকতা, এদের মাঝে অহংকারী রয়েছে আর তারাই অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লার ও অকৃতজ্ঞতা করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা স্ত্রী সন্তান দিয়েছেন। মানুষ যদি তাদের সাথে উত্তম আচরন না করে তাহলে এটি আল্লাহ্ তা'লার অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বান্দার অধিকার সম্পর্কে বলেন, শরীয়তে দুই ধরনের অধিকার রয়েছে আর তা হল আল্লাহর অধিকার ও বান্দার অধিকার। তিনি বলেন কিন্তু আমি জানি যদি কেউ দুর্ভাগা না হয় আর যদি কেউ দুর্ভাগা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা আর যদি না থাকে তাহলে আল্লাহ্‌র অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অত্যন্ত সহজ কাজ যে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান করবে। এ কারনে যে তিনি তোমাদের থেকে খাবার চান না, আর কোন ধরনের চাহিদা তাঁর নেই। তাঁর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই বলে তিনি তোমাদের কাছে কোন কিছু বলেন না। তিনি তো শুধু এটিই চায় যে তোমরা তাঁকে এক অদ্বিতীয় জ্ঞান কর এবং তার কোন শরীক নেই, তাঁর গুনাবলীর উপর ঈমান আনয়ন কর এবং তাঁর প্রেরিত ব্যক্তিদের উপর ঈমান আনয়ন করে তাদের আনুগত্য কর। কিন্তু বান্দার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে যেখানে আত্মা ধোকা দিয়ে থাকে। একারনে যতদুর সম্ভব বান্দার অধিকার সংরক্ষন ও সুরক্ষা করা উচিত। এমন যেন না হয় যে মানুষ অন্যের অধিকার হরনকারী সাব্যস্ত হয়। অতএব একজন মোমেনের জন্য শর্ত হল, সে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টজীবের অধিকার পরিপুর্ন ভাবে আদায় করবে এবং বিশেষ ভাবে তাদের অধিকার তো আদায় করবেই যাদের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর ন্যাস্ত করেছেন। শুধুমাত্র আর্থিক অধিকার আদায় করাই আবশ্যকীয় নয় বরং আবেগ অনুভূতির অধিকারও আদায় করা আবশ্যকীয়। কতক লোক বলে থাকে যে আমরা আমাদের পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূর্ণ করছি তারপরও তারা অকৃতজ্ঞতা করছে। অতএব স্ত্রী সন্তানদেরও বিশেষভাবে এই দৃষ্টিকোন থেকে নিজেদের স্বামী ও বাবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে যদি তিনি আর্থিক ও মৌলিক চাহিদা পূর্ণ করে থাকে কিন্তু সেই সাথে পুরুষদেরও স্মরন রাখা উচিত যে তাদের আবেগ অনুভূতিরও খেয়াল রাখা উচিত, এটিও অধিকার আদায়ের অন্তভূক্ত। উত্তম আচরন ও ভালো ব্যবহারও জরুরী। মানুষতো আর চতুষ্পদ জন্তু নয় যে তার খাবার দাবারের খোজ খবর রাখলেই ফরয আদায় হয়ে গেছে, মানুষের জন্য আবেগ অনুভুতিরও উত্তম আচরন জরুরী। অতএব এই বিষয়ের প্রতিও খেয়াল রাখা উচিত। তারপর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ঈমান পরিপুর্ণ করার জন্য দুই ধরনের অধিকার আদায় করা আবশ্যকীয় এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করে বলেন, ধর্মের দুটি অংশ। একটি হল আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসা এবং অপরটি হল মানব জাতিকে এতটা ভালোবাসা যে তাদের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করা এবং তাদের জন্য দোআ করা। অতএব এখানেও মানবজাতিকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে সেই একই ধারাবাহিক শ্রেণীবিন্যাস আসবে নিকটভাজনদের দৃষ্টিকোন থেকে। তারপর সাধারনভাবে সকলকে ভালোবাসা আর এমনভাবে ভালোবাসা যে তাদের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করা। আর আমরা যে না'রাহ দিয়ে থাকি "ভালোবাসা সবার তরে ঘৃনা নয় কারো পরে" এর ও বাস্তবতা এটিই যে

মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসায় এমনভাবে অগ্রসর হওয়া যেন তার বিপদাবলীকে নিজের বিপদ মনে করা। নিকটাত্মীয়দের সাথেই যদি সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুরত্ব থাকে তাহলে বাকীদের সাথে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ আর কি হতে পারে।

অতএব এই ঈদে এই দৃষ্টিকোন থেকেও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সকলকে দৃষ্টি দেয়া উচিত, নিজেদের পরিবারে, আত্মীয়ের সাথে, নিজ পরিবেশে অন্যান্য লোকদের সাথে যেখানেই সম্পর্ক খারাপ রয়েছে তা দুর করার চেষ্টা করা উচিত এবং কঠোরতা ও দুরত্বকে নম্রতা ও নৈকট্যে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তালার গুনাবলীতো পরিপূর্ণ কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এটিও বলেছেন যে আমার গুনে গুনান্বীত হও এর উপর আমল করার চেষ্টা কর। আর এটিও আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন যেনিজ নিজ যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই গুনাবলী যেন নিজের মাঝে ধারন করা হয় এবং সবদিক থেকে মানুষের সর্বাত্মক সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তম আচরন ও অনুগ্রহের দৃষ্টান্ত দেখানো হয় যেন ঈদের খুশি নিজ সত্ত্বা ও নিজের সীমিত পরিবেশেই সীমাবদ্ধ না থাকে বরং এই গণ্ডী থেকে বেরিয়ে সমাজেও ছরিয়ে পড়ে এবং প্রত্যেকে একে অন্যের অধিকার আদায়কারী হয়ে যায়। তারপর জামাতের একত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যও অধিকার আদায় করা খুবই জরুরী, যেখানে এটি প্রকৃত আনন্দ দিয়ে থাকে সেখানে জামাতের উন্নতির বহিঃপ্রকাশও এতে নিহিত।

এ সম্পর্কে আমাদের দিক নির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, সংবিধান এটিই হওয়া উচিত যে দুর্বল ভাইদের যেন সাহায্য করা হয় এবং তাদেরকে শক্তিশালী করা হয়। এটি কতটা অযৌক্তিক কথা যে দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন সাতার জানে এবং অপর জন জানে না, তাহলে প্রথম জন (যে সাতার জানে) তার দায়িত্ব কি হবে সে কি তাকে পানিতে ডুবতে দিবে না কি ডুবা থেকে তাকে বাচাবে। তার দায়িত্ব হল তাকে পানিতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করা। একারনেই পবিত্র কুরআন করীমে এসেছে 'তাওয়াআনু আলাল বিররে ওয়াত্তাকওয়া' (আর তোমরা পুণ্যও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা কর।)। দুর্বল ভাইয়ের বোঝা বহন কর, কাজ কর্মে, ঈমানের ক্ষেত্রে এবং আর্থিক দুর্বলতায়ও তাদের সাথে শরীক হয়ে যাও। শারীরিক দুর্বলতারও চিকিৎসা কর। কোন জামাত জামাত হতে পারে না যতক্ষন পর্যন্ত না দুর্বলদেরকে শক্তিশালীরা সাহায্য না করবে, আর তাদের দোষ-ত্রুটি যেন গোপন করা হয়। সাহাবাদেরকেও এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছিল যে নতুন মুসলমানদের দুর্বলতা দেখে তোমরা রেগে যেও না কেননা তোমরাও এমনই দুর্বল ছিলে। ঠিক তদ্রুপ এটিও আবশ্যকীয় যে বড়রাও যেন ছোটদের খেদমত করে এবং ভালোবাসাপুর্ণ ও কোমল আচরন যেন তাদের সাথে করা হয়। দেখ, সেই জামাত জামাত হতে পারে না যে একজন অপরজনের বিরোধিতা করে, একে অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টায় রত থাকে। আর যখন চার জন মিলে একত্রে কোন স্থানে বসে তখন এক গরীব ভাইয়ের সমালোচনা করে, দুবৃল ও গরীবদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এবং তাদেরকে ঘৃনার চোখে দেখে। এমনটি কখনই হওয়া উচিত নয় বরং সংঘবদ্ধ হওয়াতে যেন শক্তি লাভ হয় এবং একত্ব সৃষ্টি হয় যার ফলে ভালোবাসা ও কল্যাণ সৃষ্টি হয়। চারিত্রিক শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি করা উচিত। নিজের চরিত্রের মান উন্নত কর, বিস্তৃত কর আর এটি তখনই সম্ভব যখন সহানুভুতি, ভালোবাসা, ক্ষমা এবং দয়া সবার জন্য করা হবে। নিজ সহানুভুতি,ভালোবাসা, ক্ষমা ও মার্জনা সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখ, অন্যের উপকার সাধন করা উন্মুক্ত রাখ,আর প্রত্যেক ক্ষেত্রে অনুগ্রহ, সহানুভুতি ও দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখাকে অগ্রগামী কর। যতদুর সম্ভব অন্যের উপর দয়া কর , তাদের প্রতি সহানুভতি প্রদর্শন কর, তাদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখ। প্রত্যেকের এটি কাজ নয় যে অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখে তা প্রকাশ করবে। তবে হ্যাঁ, পাপ বা মন্দকাজ যদি জামাতী রুপ ধারন করতে যায় তাহলে যে এর জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত তাকে অবগত কর এমনটি যেন না হয় যে তাকে অবগত না করে সর্বত্র বলে বেরানো হচ্ছে। তিনি বলেন চোট খাট বিষয়ে এত বড় ধরপাকড় হওয়ার প্রয়োজন নেই যা মন ভাঙ্গার কারন হয়। জামাত তখনই হয় যখন একে অপরের প্রতি সহানুভুতিশীল হয়, দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে। যখন এই অবস্থার সৃষ্টি হবে তখন এক সত্ত্বা হয়ে একে অপরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিণত হয় এবং তাকে নিজ ভাইয়ের চেয়েও বড় মনে করে। খোদা তা'লাও সাহাবাদেরকেও নেয়ামতের এই পদ্ধতি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্মরন করিয়েছেন।তারা যদি স্বর্নের পাহাড়ও খরচ করত তবুও তারা সেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন লাভ করত না যা তারারসুর করীম (সা.) এর মাধ্যমে লাভ করেছে। ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ তা'লা এই সিলসিলাহ প্রতিষ্ঠা করেছেন আর সেই একই ধরনের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তিনি এখানেও প্রতিষ্ঠা করবেন।

অতএব আমাদের প্রত্যেক স্তরে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও অধিকার আদায়ের জন্য চেষ্টা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে এটিই সেই বিষয় যা ঈদের প্রকৃত আনন্দ লাভকারী বানায়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও তৌফিক দান করুন আমরাও যেন তার প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী হই, তাঁর ইবাদতের অধিকার আদায়কারী হই এবং তাঁ বান্দার অধিকার আদায়কারী হই।

খুতবা সানীয়ার পর আমরা দোয়া করব, দোয়াতে আমরা এই দোয়া করব যে আমরা যেন প্রকৃত ইবাদতকারী হই এবং এমন মোমেন যারা বান্দার অধিকার আদায়কারী হবে। এটিও দোয়া করুন যে বর্তমানে যে সমস্ত স্থানে জামাতের সদস্যরা সমস্যায় রয়েছে আল্লাহ্ তা'লা যেন তা দুরীভূত করেন, যে সমস্ত দুঃশ্চিন্তা ও অস্থিরতা রয়েছে জামাতীভাবে আল্লাহ্ তা'লা যেন তা দুরীভূত করেন, যারা বিভিন্ন মোকদ্দমায় গ্রেফতার আছেন তাদের সে সমস্ত অস্থিরতা দুর করুন এবং তাদেরকে সে সমস্ত মোকদ্দমা থেকে মুক্তি দান করুন। বিশেষভাবে পাকিস্তানে কতক আল্লাহ্‌র পথে বন্দী আছেন, আলজেরিয়াতেও কতক আল্লাহ্‌র পথে বন্দী আছেন তাদের জন্য দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন দ্রুত তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন,আর যে কোন দিক থেকেই হোক যারা যে কোন ধরনের দুঃখ কষ্টে জর্জরিত আছেন তাদের দুঃখ কষ্ট দুর করুন।

খুতবা সানীয়া এবং ইজতেমায়ী দোয়ার পর হুযূর(আই.) বলেন.'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্, সকলকে ঈদ মোবারক এবং এম.টি.এ. এর মাধ্যমে পৃথিবীর সকলকে ঈদ মোবারক। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের প্রত্যেককে ঈদের প্রকৃত আনন্দ লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

ভাষান্তর: **নাবিদ আহমদ লিমন**
মুরব্বী সিলসিলাহ

# ই'তিকাফ

## নিজেকে উৎসর্গ করতে এক নির্জনবাস মু'মিন আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে হয় ধন্য মমত্ববোধের চেতনায় হয় উজ্জীবিত

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্‌

### ই'তিকাফ কী

রমযানের শেষ দশ দিন কোন কোন রোযাদার নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহ্‌ তা'লার যিকরে (যপগাঁথায়) নিমগ্ন রাখার উদ্দেশ্যে মসজিদে এসে অবস্থান নেন। এরূপ আল্লাহ্‌-র স্মরণে একনিষ্ঠভাবে বিভোর থাকতে মসজিদকে আবাসনের স্থান হিসেবে গ্রহণ করাকে ই'তিকাফ বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে ই'তিকাফ এক আশারা বা এক দশক সময় কালের জন্য হয়ে থাকে। কোন এক রমযান মাসে রোযার সংখ্যা ২৯ (উনত্রিশ) হবে না ৩০ (ত্রিশ), যেহেতু তা পূর্ব থেকে জানা থাকে না এ কারণে এক দশক সংখ্যা পুরা করতে মহানবী (সা.) রমযানের শেষ দশক-এর একদিন পূর্ব থেকেই ই'তিকাফ শুরু করতেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কখন থেকে ই'তিকাফ শুরু করেন ও কীভাবে শুরু করেছেন আর কতদিন ধরে ই'তিকাফ করেছেন তা এই নিবন্ধে তুলে ধরা উদ্দেশ্য, এ থেকে পাঠকবৃন্দ উপকৃত হবেন, ইনশাআল্লাহ্‌!

### ই'তিকাফের মৌলিক উদ্দেশ্য

বিশ্ব-জগত সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই অর্থাৎ মানবজাতি এক আল্লাহ্‌-র উপাসনা যে কাল থেকে শুরু করেছে, সেই কাল থেকেই ই'তিকাফ' অবিচ্ছেদ্যভাবে ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত হয়ে আছে।

সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্‌-র ইবাদতের উদ্দেশ্যে ভূপৃষ্ঠে সর্বপ্রথম যে গৃহটি নির্মিত হয়েছে তা হলো পবিত্র কা'বা গৃহ আর এ গৃহ নির্মাণের অন্তর্মূলেই 'ই'তিকাফ' এর চেতনা বিদ্যমান। বিশ্বে যত ধর্মমত প্রচলিত আছে তার প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন রঙে 'ই'তিকাফ' এর ভাবাদর্শ দেখতে পাওয়া গেলেও ইসলামের ধর্ম-বিধানে তা স্থায়ীরূপে পরি-পূর্ণতা লাভ করেছে।

### ই'তিকাফ বৈরাগ্য অবলম্বনের শিক্ষা দেয় না

সাধারণ অর্থে ই'তিকাফ বলতে জাগতিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌'র স্মরণে সময় কাটানোকে বুঝায়। কোন কোন ধর্মে এর চরমভাবাপন্ন দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন– খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা এবং হিন্দু সান্যাসীরা নিজেদেরকে জাগতিক সর্বপ্রকার সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে সারাটা জীবন বৈরাগ্যে কাটিয়ে দেয়।

ইসলাম কারো পুরো জীবনকাল বৈরাগ্য অবলম্বন করাকে সমর্থন করে না। খ্রীষ্টধর্মে প্রচলিত সন্ন্যাসবাদ আল্লাহ্‌ প্রদত্ত কোন শিক্ষা নয় বরং এটা পরবর্তীকালে ধর্মের নামে প্রক্ষিপ্ত এক ব্যবস্থা, যা মানবের জন্য প্রজ্ঞাপূর্ণ ধর্মীয় বিধানের ও জীবনাচারের সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

### ই'তিকাফ'-এর অন্তর্নিহিত মর্ম

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা সার্বজনীন ও সর্বকালের জন্য। এক খোদার ইবাদতের জন্য তৌহিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করতে আদর্শিকভাবে পবিত্র কাবাগৃহ নির্মাণের সাথে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অতএব, পবিত্র কুরআন প্রদত্ত শিক্ষার অংশ হিসাবে এটা নিশ্চিত যে পবিত্র কাবাগৃহের সাথে ই'তিকাফ'এর সম্পর্ক আদি ও অকৃত্রিম।

ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনা, আরবের প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি দল নবী করীম (সা.)-এর সাহচর্য্যে থাকতো আর যেসব বিষয় আগে থেকে তাদের অজানা ছিল সেসব ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতো, আর এভাবে তারা জ্ঞান তথা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতো, সমস্যা ও সঙ্কটের প্রজ্ঞাপূর্ণ সমাধান শিখে নিজ ধর্মের ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো। এভাবে **তাফাক্কুহ্‌ ফিদ্বীন** অর্জন করে নিতো। পরবর্তীতে ফিরে গিয়ে অন্যদেরও তা শেখাতো। ইসলামের ইতিহাসে বিস্তারিত বিবরণসহ ওইসব দলের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা ওই উদ্দেশ্য ও আদেশকে কার্যকর করতে মদীনায় নবী করীম (সা.)-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতো, ধর্ম শিখতে সেখানে কিছু দিন কাটাতো, একদল বিদায় হওয়ার পর দ্বিতীয় দল, পরে তৃতীয়দল, এরপর পুণরায় আরেক দল– এভাবে আসতেই থাকতো। এক ধারাবাহিকতা চলতে থাকতো আর এ ধারাবাহিকতায় ধর্মের স্থায়ীত্ব ও মজবুতির উপকরণ নিহিত রাখা হয়েছিল।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, ধর্ম শেখার উদ্দেশ্যে বাহরাইন থেকে একবার চৌদ্দজন প্রতিনিধির একটি দল এসেছিল। অনুরূপভাবে, হাযরে মাওত (ইয়েমেন) থেকে আশি জনের প্রতিনিধিদল এসেছিল। এভাবে বনু তমহীম গোত্রের সত্তুর-আশি

জনের একটি দলও এসেছিল। এসব দল **বাকাও বিল মদীনাতে মুদ্দাতাঁই ইয়া তাআ'ল্‌লামুনাল কুরআনা ওয়াদ্‌ দীনা ছুম্মা খারাজু ইলা কাওমিহিম**– ধর্ম শিখেছে, শিক্ষাপ্রাপ্তরা পরবর্তীতে নিজ জাতির কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে ধর্ম শিখিয়েছে।

এভাবে যথেষ্ট সংখ্যায় লোকদের কেন্দ্রে আসতে হবে, তবেই যথার্থরূপে ইসলাম ধর্মের সেবা করা সম্ভব হবে। পবিত্র কাবাগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট যে সব কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে তা জানা সহজতর হবে।

وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ

(সূরা বাকারা: ১২৬)

অর্থাৎ- আর আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে (এ মর্মে) তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিলাম, 'তোমরা উভয়ে আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকুকারী (ও) সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রেখো।'

**ওয়াল আকিফিন**-এ সেই উদ্দেশ্যেই বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কাবাগৃহ এ কারণেই নবরূপে নির্মাণ করা হয়েছে যে, এর মাধ্যমে এমন এক জাতি সৃষ্টি করা লক্ষ্য যারা নিজেদের জীবন খোদা তা'লার পথে উৎসর্গকারী হয়ে 'বায়তুল্লাহ্‌' নির্মাণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করবে। এমন এক সার্বজনীন জাতির উদ্ভব ঘটানোর উল্লেখ এখানে রয়েছে, যাদের মাঝে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশের প্রতনিধিরা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ উদ্দেশ্যটি কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে।

**'ওয়া আনতুম আ'কিফুনা ফিল মাসাজিদ'** (সূরাতুল বাকারা ঃ আয়াত ১৮৮)। এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে তোমাদের ব্যাপারে এধারণা পোষণ করা হচ্ছে তোমরা মসজিদে **ই'তিকাফ** (ইবাদতের জন্য নির্জনবাস)-এ বসবে। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল পার্থিব বিষয় ও সম্পর্ক থেকে মুখ ফিরিয়ে কিছুদিন একাগ্রচিত্তে খোদার জন্য নিজ জীবনের প্রতিদিনের চব্বিশ ঘন্টা সময় কাটিয়ে যাও যাতে উৎসর্গকরণের স্পৃহাকে জীবন্ত করে নেয়া যায়। আর যেহেতু নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ বানানো হয়েছে', এজন্য **ওয়া আনতুম আ'কিফুনা ফিল মাসাজিদ**-এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে আমার ভালোবাসায় উৎসর্গীকৃত হয়ে তোমাদের খন্ড খন্ড ভাবে কিছুটা করে সময় কাটাতে হবে; আল্লাহ্‌র ঘর পবিত্র কাবাগৃহ হলো কেন্দ্র-বিন্দু আর আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে তোমাদেরকে এর প্রতিচ্ছায়াও নির্মান করতে হবে অর্থাৎ অকৃত্রিম ভাবে একই ধাঁচে একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করতে একই ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পবিত্রতা সৃষ্টি করতে জায়গায় জায়গায় **ছায়া কেন্দ্র** খুলতে হবে, যেগুলো **বায়তুল্লাহ্‌র** প্রতিচ্ছবি হবে আর তা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যও হবে তা-ই যা **বায়তুল্লাহ্‌** প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

আল্লাহ্‌ তা'লা এখানে এটাই বলেছেন যে **আনতুম আকিফুনা ফিল মাসাজিদ**– প্রত্যেক জায়গায় যেখানে উম্মতে মুসলেমা তাক্‌ওয়া (খোদাভীতি) এর ভিত্তিমূলে **বাযতুল্লাহ্‌র** প্রতিবিম্ব-প্রতিচ্ছায়া প্রতিষ্ঠিত করবে সেখানে তোমাদেরকে উৎসর্গীকৃত হয়ে ই'তিকাফে বসতে হবে, না হলে এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না।

কাবাগৃহ নির্মানের একটি উদ্দেশ্য এ-ও যে, জাতির উৎসর্গকারীগণ অর্থাৎ প্রত্যেক এলাকার, প্রত্যেক স্থানের, প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর যে উৎসর্গকারী রয়েছে তারা কেন্দ্রে বা ছায়া-কেন্দ্রে এসে সমবেত হতে থাকুক আর ইতিকাফে বসে যাক। লক্ষ্যণীয় যে 'উৎসর্গ' (ওয়কেফ্‌) ও 'দেশত্যাগ-দেশান্তর' (হিযরত) এ-দুয়ের মধ্যে খুবই সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পাই কেবল মক্কা থেকেই নয় বরং অন্যান্য এলাকা থেকেও বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিরা নিজেদের এলাকা পরিত্যাগ করে এমন কী নিজ গোত্রকে ছেড়ে দিয়ে সাধু-সন্যাসীর ন্যায় মদীনায় এসে বসে পড়তো আর এখানেই পড়ে থাকতো।

তাদের সে হিযরত ছিল (দেশত্যাগ) নিজ জাতি গোষ্ঠী ছেড়ে যাওয়া বা নিজ দেশ পরিত্যাগ করা– এটা সে রকমের ছিল না, যা ছিল মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে সে স্থান ছেড়ে যাওয়ার হিযরত, তবে এমনটি করা এক উৎসর্গকারীর (ওয়াকেফ্‌) পক্ষেই সম্ভব হয়ে থাকে, যে নিজ এলাকা ছেড়ে, স্বীয় আত্মীয়তার বাঁধন ছেড়ে, আপন পরিবার-পরিজন ছেড়ে, নিজ সহায় সম্পদ ছেড়ে দিয়ে খোদার জন্য কেন্দ্রে এসে পড়ে থাকে আর পরবর্তীতে কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কাজ করতে বেরিয়ে পড়ে। যেমন– **ইয়েমেন'**-এ **আআ'রীয়্যাণ** নামে এক গোত্র ছিল। সেখানকার ধর্মপরায়ণ বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন হযরত আবু মূসা আশআ'রী (রাযি.)। তাঁর সাথে আশি জন সদস্য হিযরত করে মদীনায় চলে আসেন। অনুরূপ আরও অনেক গোত্র রয়েছে। ইতিহাসে এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। নবী আকরাম (সা.)-এর পবিত্র সাহচর্য লাভ করে উপকৃত হতে তারা মদীনায় চলে এসেছিলেন। এদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-ও রয়েছেন।

## মহানবী (সা.) এর জীবনে ই'তিকাফ

আমরা মহানবী (সা.) এর পবিত্র জীবনাদর্শে 'ই'তিকাফ' এর প্রকৃত শিক্ষার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। আল্লাহ্‌ তা'লার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সুমহান আদর্শ আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন মহানবী (সা.)। তিনি (সা.) আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন জাগতিক ভাবে একেবারে বিচ্ছিন্ন বৈরাগ্যপূর্ণ জীবন-যাপন, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলীকে ভয় পেয়ে পলায়ন প্রবৃত্তি বৈ অন্য কিছু নয়। মহানবী (সা.) এর জীবনাচার পরিপূর্ণ ভাবে কর্মমুখর থাকলেও তিনি ইহজাগতিক লালসাপূর্ণ আকর্ষণ থেকে নিজেকে এমনভাবে সরিয়ে রাখতেন, জাগতিক বিলাস-ব্যসন কখনই তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না। প্রকৃত জিহাদ এটাই– এক মুজাহিদ 'জিহাদ' এর প্রতিটি প্রান্তরে অবস্থান করে বিপদাবলীর তুফানের মধ্যেও নির্ভিক দৃঢ়তার সাথে মুকাবেলা করবে তবুও সঠিক পথ থেকে সে বিচ্যুত হবে না।

এ হলো বাস্তব সম্মত সেই পথ যা দ্বারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সাথে মহানবী (সা.) সম্পর্ক গড়েছেন, 'সিরাতুল মুস্তাকীম' সহজ-সরল পথ, মধ্যম পন্থার পথ, যা মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌ তা'লা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতএব তাদেরকে সেই পথে 'ইস্তেকামাত'-দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ্‌ তা'লার সাথে গড়তে হবে নিবিড় সম্পর্ক, অটল-অটুট বন্ধনে নিজেদেরকে করতে হবে আবদ্ধ। ই'তিকাফের মূলতত্ত্ব হলো জাগতিক বিষয়াদি থেকে নিজেকে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য দূরে রাখা এবং বৈশ্বিক দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলীকে

তুচ্ছ জ্ঞান করে পশ্চাতে রেখে দেয়া! লক্ষণীয় বিষয় হলো, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 'ই'তিকাফ'কে উন্নত মানের ধার্মিকতা হিসাবে আখ্যায়িত করেন নাই বরং তিনি একে এক কুরবানী বা আত্মোৎসর্গ বলে চিহ্নিত করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা.) রমযানের মাঝখানে ই'তিকাফ শুরু করতেন এবং ২১ রমযানের রাত পর্যন্ত তা জারী রাখতেন। এভাবে কিছুকাল ধরে তিনি (সা.) ই'তিকাফ করতে থাকেন আর সাহাবাগণও (রা.) ধীরে ধীরে তাঁর সাথে যোগ দিতে থাকেন।

## ই'তিকাফে রয়েছে আত্মোৎসর্গের অনুপ্রেরণা

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্য থেকে কেউ কেউ মসজিদে এসে নিজেদের 'হুজরা' স্থাপন করতেন। একবার মহানবী (সা.)-এর অনুমতিক্রমে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) মসজিদে তার 'হুজরা' বসালেন। উম্মুল মু'মিনীনগণ তা জানতে পেরে ধার্মপরায়ণতার এই কাজে অংশ নিতে তারাও আকাঙ্খী হলেন। মসজিদে এসে তারাও 'হুজরা' বসালেন, তবে এদের মধ্যে অনুমতি নিয়েছিলেন কেবলমাত্র হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)।

পরবর্তীতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মসজিদে এসে এতগুলো হুজরা যা উম্মুল মু'মিনীনগণ বসিয়েছিলেন, তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। আশ্চর্য হয়ে তিনি বললেন, 'এটাই কি তাদের ধর্মপরায়ণতার মূলতত্ত্ব?' অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে তিনি (সা.) বললেন, ধর্মনিষ্ঠতা মানুষের অন্তর থেকে উৎসারিত হয় অন্যের দেখাদেখি বা অপরের সাথে রেষারেষি থেকে তা আসে না। তিনি এতটাই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, সেই রমযানে তিনি (সা.) মসজিদে আর ই'তিকাফ করেন নাই, সেই রমযানের পরবর্তী মাস অর্থাৎ শাওয়াল মাসে তিনি এই ক্ষতি পূরণ করে নেন।

এই ছিল মহানবী (সা.)-এর আলোকজ্জ্বল জীবনাচার পদ্ধতি। তিনি (সা.) তাঁর সহধর্মিণীগণকে বারণ করেন নাই বা তাদেরকে নিজেদের হুজরা সরিয়ে ফেলতেও বলেন নাই, কারণ তিনি নারীদেরকেও মসজিদে অবস্থান করার অনুমতি দিয়েছেন, যেমন হযরত আয়েশা (রা.) এ বিষয়ে পূর্ব থেকে অনুমতি প্রাপ্ত ছিলেন। অতএব অন্যান্য উম্মুল মুমিনীনদেরও সেই অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জানানোর কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এমন উদাহরণ থেকে একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যাবার প্রবণতা দৃষ্টিগোচর হয়। এ কারণেই এ বিষয়ে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল, নিজেকেই এমন অবস্থা থেকে সরিয়ে নেয়া। তিনি তাঁর সহধর্মিনীগণকে তিরস্কার করেন নাই আর স্ত্রীগণকেও লজ্জিত করেন নাই এইভাবে তিনি নারীর মর্যাদা সমুন্নত রেখেছেন আর ই'তিকাফ না করে স্বয়ং তিনি কষ্ট পেয়েছেন বটে, তবে শাওয়াল মাসে একাকী নির্জনে তাঁর সেই অতৃপ্ত বাসনা তিনি পুরণ করে নিয়েছেন।

এবারে প্রশ্ন উঠে রমযানের শেষ দশ দিন "ই'তিকাফ"-এর এই রীতি কোথা থেকে এলো? মহানবী (সা.) একবার বলেন, তিনি 'লাইলাতুল কদর'-সৌভাগ্যের রজনীর সন্ধান পেয়েছেন ২১ রমযানে, যখন তাঁর ই'তিকাফ সমাপ্ত হয়। তখন থেকে তিনি (সা.) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে রমযানের শেষ দশ দিন তিনি (সা.) মসজিদেই অবস্থান করবেন। ঐ এক বছর তিনি (সা.) দুই বার ই'তিকাফ পালন করেন, প্রথমটি রমযানের মাঝের ১০ দিন আর অপরটি শেষ দশ দিন।

## ই'তিকাফকালীন মহানবী (সা.) এর অনুপম দৃষ্টান্ত

সেই থেকে মহানবী (সা.) প্রতি রমযানের শেষ দশ দিন মসজিদে অবস্থান করে ই'তিকাফ করতেন। ই'তিকাফ করা অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় অহেতুক কোন কাজে জড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই, মসজিদের ভিতরেও নয় বাইরেও নয়। একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে তবেই বাইরে যেতে পারে আর সাজগোজ করা ও আত্মম্ভরিতা প্রদর্শনের অনুমতি মোটেই নাই।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একবার মসজিদে ই'তিকাফরত থাকাকালে তিনি (রাযিআল্লাহু আনহা) তাঁর (সা.) সাথে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে যান আর এমন আলাপ-আলোচনায় ই'তিকাফের অন্তর্নিহিত মর্মের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তাকে (রা.) বিদায় দিতে মহানবী (সা.) স্বয়ং দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দেন। মহানবী (সা.) এর এমন প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার তাঁর (সা.) অসাধারণ চারিত্রিক মর্যাদারই পরিচায়ক অর্থাৎ ই'তিকাফ কালীন এই সময় মসজিদ ছিল মহানবী (সা.) এর সাময়িক আবাসনের স্থান। অতএব তিনি (সা.) তাঁর অতিথি সহধর্মিণীকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে দিয়ে বিদায় জানান।

সেই সময় ২ জন মদীনাবাসী মুসলমান আনসার ঐ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়ে এই দৃশ্যটি দেখে। তারা মহানবী (সা.)কে 'সালাম' জানালে প্রত্যুত্তর দিয়ে মহানবী (সা.) তাদেরকে দাঁড়াতে বলেন, আর সেই সাথে জানালেন যে, তার সাথের মহিলা তাঁরই সহধর্মিণী সাফিয়া (রা.)। এতে দুই সাহাবী ব্যথীত হয়ে বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমরা কি আপনার সম্পর্কে কোন মন্দ ধারণা করেছি? আপনি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন কেন? উত্তরে মহানবী (সা.) বললেন, মানবদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্ত যেমন সঞ্চালিত হয় শয়তানও তদ্রুপ চারিদিকে ঘুর-ঘুর করতে থাকে। আমি শংকিত যে, কোন কারণে তোমরা না তার চক্করে পড়ে যাও, এইজন্যই আমি তোমাদের কাছে বিষয়টি পরিস্কার করলাম।' এমনই অতুলনীয় মানসম্পন্ন ছিল মহানবী (সা.) এর ই'তিকাফ।

গভীর মনোনিবেশের সাথে তিনি (সা.) ইবাদত করতেন, নামাযে তাঁর (সা.) এই একাগ্রতা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেত রমযানে, আবার শেষের দশ দিন তা যেতো আরো বেড়ে। ইবাদতে তাঁর এই একনিষ্ঠতা আর আত্মবিলীনতা তাঁর ওফাত প্রাপ্তির বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মৃত্যুর বছর মহানবী (সা.) মসজিদে ২০ দিন ধরে ই'তিকাফ করেছেন। সম্ভবত তিনি তাঁর 'মৃত্যুবরণ' এর বিষয় আগাম জানতেন, তবে তিনি তা জনগণের সামনে প্রকাশ করেন নাই, কেননা তিনি (সা.) তাঁর সাহাবাদের কষ্ট দেখলে সইতে পারতেন না।

রাহমাতুল্লিল আ'লামীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ই'তিকাফ কালে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের পরম আকুতি নিয়ে আর মানবকল্যাণের অপার মমতা বুকে ধারণ করে একান্তে মসজিদে যেভাবে সেজদা প্রণত হয়ে কাটাতেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এই রমযানে সেই মানের ই'তিকাফ করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন!

# জুমুআর খুতবা

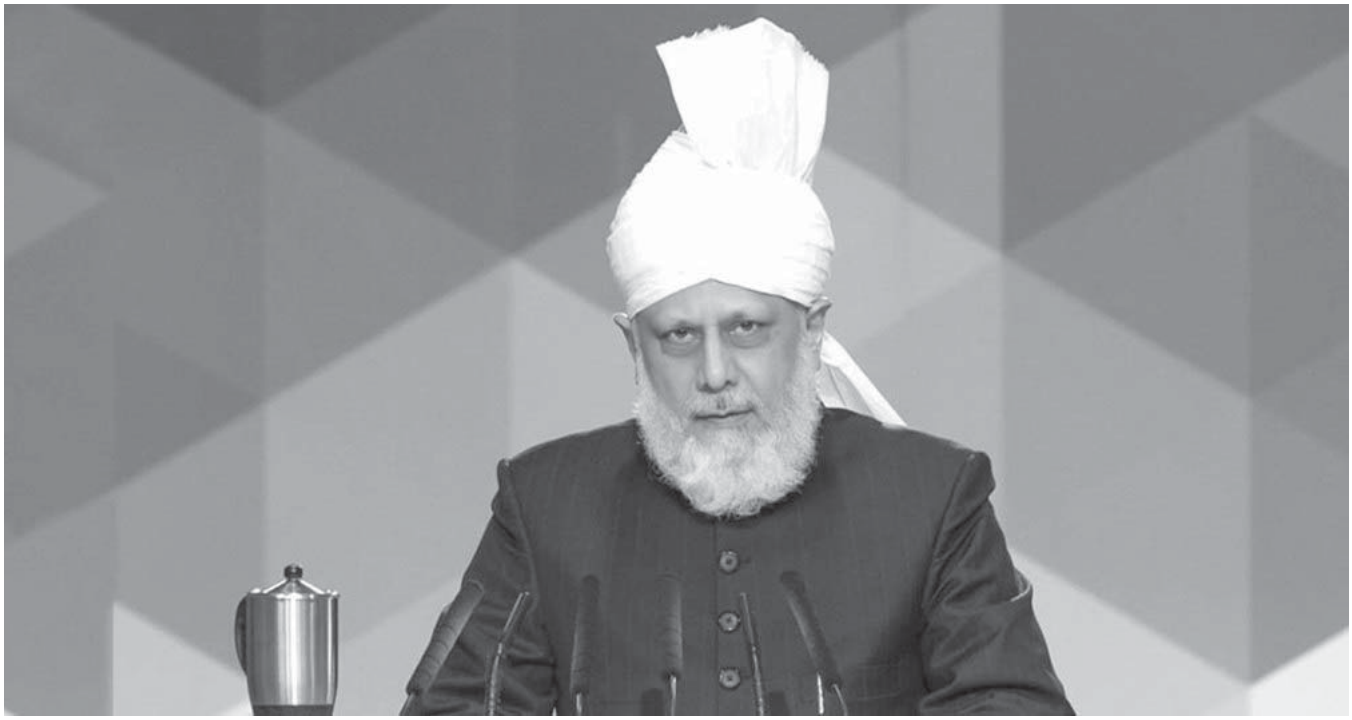

## আল্লাহর দয়া, ক্ষমা ও পুরষ্কার

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ১০ জুলাই ২০১৫'র জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ বাইশ রোযা অতিবাহিত হচ্ছে আর এভাবে আমরা রমযানের শেষ আশারা বা শেষ দশকে রয়েছি। মহানবী (সা.)-এর এক উক্তি অনুসারে আমরা খোদা তা'লার রহমত ও মাগফিরাতের দশক পেরিয়ে এখন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের দশক অতিক্রম করছি। (আল জামে'লে শা'বিল ঈমান, কিতাবুস সিয়াম, বাব ফাযায়েলু শাহরে রামাযান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৪, হাদীস নম্বর: ৩৩৩৬)

অতএব, এটি খোদা তা'লার একান্ত অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে এই সুযোগ দান করেছেন। কিন্তু এক মু'মিন,যে খোদার সত্তায় বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বনের চেষ্টা করে, খোদাভীতিতে যার হৃদয় পরিপূর্ণ, সে শুধু এটি নিয়ে আনন্দিত হতে পারে না যে, এ দিনগুলো বা এ দশক, যা অতিবাহিত করার সুযোগ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন, তা আমার মুক্তির কারণ হয়েছে। দিনগুলো নিঃসন্দেহে রহমত, মাগফিরাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির দিন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এ দিনগুলোর কল্যাণরাজি সত্যিকার অর্থে আমরা লাভ করতে পেরেছি কি? আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আদেশ-নিষেধ বা উক্তি নিঃশর্ত হয় না বরং এগুলো কিছু শর্তসাপেক্ষ বিষয়। অতএব, এই দিনগুলোর রহমত ও কল্যাণ থেকে অংশ পাওয়ার জন্যও কিছু শর্ত রয়েছে আর এ দিনগুলোতে আল্লাহ তা'লার মাগফিরাত বা ক্ষমা থেকে অংশ পাওয়ার জন্যও কিছু শর্ত আছে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্যও কিছু শর্ত মেনে চলা আবশ্যক।

**অতএব, এসব থেকে লাভবান হওয়ার জন্য আমাদের সে বিষয়গুলোর সন্ধান করতে হবে,** যার মাধ্যমে আমরা খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কৃপারাজিতে ধন্য হতে পারি। কোন কোন মুফাস্‌সের খোদা তা'লার রহমতের দু'টো প্রকারভেদের কথা উল্লেখ করেন। প্রথম প্রকার রহমত খোদার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ হয়ে থাকে তা অর্জনের জন্য মানুষ বিশেষ কোন চেষ্টা-সাধনা করে না। এর দৃষ্টান্ত হল, খোদা তা'লার একথা বলা যে,

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

(সূরা আল্ আ'রাফ: ১৫৭) অর্থাৎ- আমার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে আর আল্লাহ্ তা'লার এই রহমত হতে সবাই অংশ লাভ করছে। কোন প্রকার সৎকর্ম ব্যতিরেকেই তারা সেই রহমত থেকে অংশ পাচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিষয়টি এভাবে বলেছেন, "এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, রহমত সার্বজনীন এবং ব্যাপক, আর আল্লাহ্‌র ক্রোধ, অর্থাৎ আদল (অন্যায়ের যথাযথ শাস্তি দেয়া) বিশেষ কোন কারণে জন্ম নেয়। অর্থাৎ- ঐশী আইন লঙ্ঘনের ফলেই এই বৈশিষ্ট্য যথার্থভাবে কার্যকর হয় আর এর জন্য প্রথমে ঐশী আইন বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। আর সেই ঐশী আইন লঙ্ঘনের ফলে পাপ সংঘটিত হয় এবং এর পরই খোদার এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় আর যথোচিতভাবে তা বাস্তবায়িত হয়।" (জঙ্গে মুকাদ্দাস, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০৭)

অতএব, আপন বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত দয়ালু ও কৃপালু। কিন্তু ঐশী আইন লঙ্ঘনের পর মানুষ শাস্তির শিকারে পরিণত হয়। ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি তো আল্লাহ্ তা'লা সব সময় ক্ষমা করতে থাকেন, কিন্তু মানুষ যখন চরমভাবে সীমা লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করে, তখন খোদা তা'লার আদল বা ন্যায় বিচার এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য স্ব-মহিমায় প্রকাশ প্রায়। কিন্তু সর্বজনীনভাবে খোদা তা'লার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।অনেক সময় আদলের দাবি বা ঐশী বিধান লঙ্ঘনের দাবি হলো শাস্তি পাওয়া। কিন্তু তাসত্ত্বেও করুণাবশতঃ আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করে দেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, এই অবস্থা মু'মিনদের শোভা পায় না। প্রকৃত মু'মিনদের অবস্থান এবং মর্যাদাই ভিন্ন। ঈমানের দাবি হল, ঈমানী অবস্থাকে শোধরানো এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মেনে চলার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। আর সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন মানবিক দুর্বলতার কারণে যদি কোন পাপ হয়ে যায়, তাহলে খোদা তা'লার রহমত এবং করুণা সেই পাপকে ঢেকে রাখে। এমনটি হওয়া উচিত নয়, যেমনটি আমি গত কোন খুতবায় বলেছিলাম যে অনেক সময় মানুষ পাপের ক্ষেত্রে ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে যায় আর একথা বলে বেড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'লার রহমতের সমুদ্র অতি ব্যাপক, তাই কোন চিন্তা নেই।

অতএব, এমন মন মানসিকতা খোদা তা'লার ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানায়। খোদা তা'লার রহমত বা করুণা কীভাবে তাঁর ক্রোধকে ঢেকে রাখে বা পরিবেষ্টন করে, এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "সতর্কবাণীর ক্ষেত্রে আসলে কোন প্রতিশ্রুতি থাকে না। যা থাকে, তা হল খোদা তা'লা স্বীয় কুদ্দুসিয়্যতের (খোদার পবিত্রতার) কারণে অপরাধীকে শাস্তি দিতে চান, আর কখনো কখনো এই নিরিখে নিজ এলহামপ্রাপ্ত বান্দাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিতও করেন।" অর্থাৎ যাদের উপর এলহাম করেন তথা নিজ মনোনীতদের ও নবীদের বলে দেন, অমুক ব্যক্তি ধৃষ্ট হয়ে উঠছে, আমি তাকে শাস্তি দিতে যাচ্ছি। কিন্তু এরপর পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়? "এরপর অপরাধী ব্যক্তি যখন সত্যিকার অর্থে তওবা, ইস্তেগফার, আহাজারি ও কাকুতিমিনতির মাধ্যমে দাবি পূরণ করে, তখন খোদার করুণার দাবি তাঁর গযব বা ক্রোধের দাবির উপর প্রাধান্য লাভ করে"। অনেক সময় সংবাদও এসে যায়, শাস্তির নির্দেশ এসে যায়, শাস্তি নির্ধারিত হয়ে যায় এবং শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়, সে যদি তওবা করে এবং ইস্তেগফার করা অব্যাহত রাখে, তাহলে শাস্তি এড়াতেও পারে। তিনি (আ.) বলেন, "অতএব, ঐশী রহমতের দাবি শাস্তি বা ক্রোধের দাবির উপর প্রাধান্য পায়, আর সেই গযব বা ক্রোধকে আবৃত বা প্রচ্ছন্ন করে নেয়।" সেটিকে লুকিয়ে ফেলে এবং ঢেকে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করে দেন। "আয়াত–

عَذَابِيْٓ أُصِيْبُ بِهٖ مَنْ أَشَآءُ ۖ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

(সূরা আল্-আ'রাফ: ১৫৭) এর অর্থ এটিই, অর্থাৎ- رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ।" (তোহফায়ে গযনবীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৫৩৭)

এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর ছেয়ে গেছে। অতএব, তাদের তওবা ও ইস্তেগফারের কারণে আল্লাহ্ তা'লা অপরাধীদেরকেও ক্ষমা করে দেন। আর যারা সকল সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়, তাদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দেন।

তিনি (আ.) বলেন, যাদের জন্য শাস্তি আবশ্যিক বা অবধারিত হয়ে যায়, এমন অপরাধীরাও যখন বিগলিত চিত্তে ক্রন্দন ও আহাজারি করে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। বরং যেমনটি আমি বলেছি, অনেকের শাস্তি সম্পর্কে স্বীয় মনোনীতদেরকে অবহিতও করেন, কিন্তু তারপরও অপরাধীর বিগলিত চিত্তের ক্রন্দন, তার আহাজারি এবং ইস্তেগফার খোদার করুণাবারিকে আকর্ষণ করে। যাহোক, মু'মিনের শোভা পায় না যে, প্রথমে আল্লাহ্ তা'লার নিয়ম লঙ্ঘন করবে বা নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, এরপর আহাজারি করবে এবং খোদার করুণা যাচনা করবে। মু'মিনদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য। আর দ্বিতীয় প্রকার রহমত বা করুণা কর্মের সাথে সম্পৃক্ত। এর প্রতিশ্রুতি সৎকর্মশীলদেরকে এবং তাকওয়ার পথে বিচরণকারীদেরকে

দেয়া হয়েছে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

(সূরা আল্ আ'রাফ: ৫৭) অর্থাৎ- **নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লার রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী বা সাথে আছে।**

**মুহসিন শব্দের অর্থ হল এমন ব্যক্তি, যে অন্যদের সাথে সদ্ব্যবহারকারী**, তাকওয়ার পথে বিচরণকারী, জ্ঞানী, শর্ত সাপেক্ষে আল্লাহ্-নির্ধারিত সকল কাজ সম্পন্নকারী। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাঁর রহমত তাদের সাথে রয়েছে, যারা জেনেশুনে পাপ করে না, যারা নিজদের পাপের শাস্তির ভয়ে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লাকে ডাকে আর অন্তরে আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করে। তারা এমন মানুষ, যারা জেনেশুনে পাপ করে না, বরং নিজের অজান্তে কোন পাপ হয়ে গেলেও তাকওয়ার সাথে তারা খোদা তা'লাকে ডাকে। তখন খোদা তা'লার রহমত তাদের উপর বর্ষিত হয় এবং তাদের দোয়া গৃহীত হয়। এটি খোদা তা'লার এক বিশেষ কৃপা যে, তিনি দোয়া গ্রহণ করেন। তাঁর সাথে কোন জোর খাটে না, না কেউ কোন জোর করতে পারে যে, অবশ্য অবশ্যই তিনি আমাদের দোয়া গ্রহণ করবেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাঁর দয়া এবং করুণা সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছে এবং তা তাদের উপর অবতীর্ণ হয়, যারা তাকওয়ার সাথে নিজদের জীবন অতিবাহিত করে আর তাদের সাথেও রয়েছে, যারা অন্যদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে ও তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে।

**অতএব, যদি চান যে দোয়া গৃহীত হোক, তাহলে মুহ্সিন বা সৎকর্মশীল হওয়া আবশ্যক** আর মুহ্সিন শব্দের এসব অর্থ সামনে রেখে মুহসিন বা সৎকর্মশীল হওয়া আবশ্যক। অতএব, এটি সামান্য কোন বিষয় নয়। সাধারণ বা তুচ্ছ সৎকর্ম করে মানুষ মুহসিন হতে পারে না, বরং এই মর্যাদায় উপনীত হওয়ার জন্য নিজদের সৎকর্মকে উন্নত মানে পৌঁছানো আবশ্যক। মুহসিনের যে সংজ্ঞা মহানবী (সা.) উপস্থাপন করেছেন, সেটি যদি মানুষ দেখে, তাহলে মানুষের হৃদয় এটি ভেবে ভয়ে কেঁপে উঠবে যে, আমাদের ইবাদত কি এই মানের? যে কাজই আমরা করি, প্রতিটি কাজের সময় আমাদের অবস্থা কি সেরূপ হয়, যেরূপ মহানবী (সা.) বলেছেন? আর সেই অবস্থা কি? মহানবী (সা.) বলেন, মুহসিন হল সে, যে প্রতিটি নেক কর্মের সময় এই দৃঢ়বিশ্বাস রাখে যে, সে আল্লাহ্ তা'লাকে দেখছে, বা অন্ততপক্ষে এ বিশ্বাস থাকা চাই যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে দেখছেন। [সহীহ বুখারি, কিতাবুল ঈমান, বাব সাওয়ালু জিবরীলান নাবীয়া (সা.) আনিল ঈমানে ওয়াল ইসলামে ওয়াল ইহসানে, ওয়া ইলমিস সাআতে, হাদীস নম্বর: ৫০]

আমাদের ইবাদতের মান যদি এমন হয় এবং আমাদের অন্যান্য কাজ করার সময়ও যদি অবস্থা এমন হয়, তাহলে অন্যায় কাজ কখনো হতেই পারে না। আমরা কখনো তাকওয়া থেকে বিচ্যুত হতেই পারি না, কখনো কারো সাথে মন্দ আচরণ করতেই পারি না এবং কখনো কারো অধিকার খর্ব করতেই পারি না। বরং কারো ক্ষতি করা বা অধিকার পদদলিত করার কথা ভাবতেও পারি না। অতএব, ইসলামী শিক্ষা বা আদেশ-নিষেধ তো এমন যে, যেদিক থেকেই এগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা আমল করা আরম্ভ করুন না কেন বা আল্লাহ্ তা'লার যে নির্দেশকেই নিন না কেন বা তাঁর রসূল (সা.)-এর যেকোন উক্তি বা নির্দেশকেই দেখবেন, তা আমাদের সবাইকে ঘিরে হুকুকুল্লাহ্ বা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান এবং হুকুকুল ইবাদ বা বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের দিকে নিয়ে যাবে অর্থাৎ অধিকার প্রদানের দিকে পরিচালিত করবে। আমরা পরম বাসনা রাখি যে, আমাদের দোয়া গৃহীত হোক, আমরা খোদার রহমত বা করুণাবারির উত্তরাধিকারী হই, তাঁর করুণাবারি যেন আমাদের উপরও বর্ষিত হয়। কিন্তু তা অর্জনের জন্য আমরা সেই মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করি না বা আমাদের বেশির ভাগ (সেই মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা) করে না বা রীতিমত সেই চেষ্টা করে না, যা একজন মু'মিনের করা উচিত। আমরা এ কথায় উৎফুল্ল হয়ে যাই যে, খোদা তা'লার রহমতের দশক অতিবাহিত করেছি। কিন্তু আমরা ভাবি না যে, এই রহমত লাভের জন্য আমরা কী করেছি বা আমাদের কী করা উচিত ছিল। আমরা কি সেসব পাপী এবং অপরাধীর মতই সময় অতিবাহিত করেছি, যারা সাময়িক আহাজারি করে খোদার রহমত লাভ করে সেই শাস্তি এড়াতে পেরেছে, যা কারো কোন বিশেষ অপরাধ বা কতক অপরাধের কারণে নির্ধারিত ছিল? নাকি আমরা মুহসেনীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজদের জীবন সেভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা করছি, যারা তাকওয়ার উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকার অঙ্গীকার করে, যারা অন্যদের সাথে সদ্ব্যবহারের স্থায়ী অঙ্গীকার করে, যারা রমযানকে নিজদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের স্থায়ী মাধ্যমে পরিণত করার চেষ্টা করে এবং পরিণত করে?

অতএব, এই রহমত এবং করুণাবারি আকর্ষণের চেষ্টা আমাদের করা প্রয়োজন এবং করা উচিত, যা আমাদের স্থায়ী সঙ্গী হবে। সাময়িকভাবে সেটি আমাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে, আর সময় কেটে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাব, এমনটি যেন না হয়। এই একটিমাত্র শব্দ 'রহমত'-এর মাধ্যমে মহানবী (সা.) আমাদের জীবনের জন্য কর্মপন্থার এক (সমৃদ্ধ) ভান্ডার রেখেছেন, আর তা হচ্ছে- রমযানের প্রথম দশ দিনে তোমরা এই রহমত সন্ধান কর আর যখন এই রহমত লাভ হয়, তখন এই অঙ্গীকার কর যে, এটিকে জীবনের স্থায়ী অংশ করে নেবে। এই দশ দিনের তরবীয়ত বা প্রশিক্ষণ এক মু'মিনকে পরবর্তী পথ দেখাবে। কিন্তু শয়তান যেহেতু প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের পিছু ধাওয়া করছে এবং

যে নিজের কাজে, অর্থাৎ বিভ্রান্ত করার কাজে রত, পুণ্য থেকে বিচ্যুত করার কাজে রত, তাই এই রহমত বা করুণা লাভের পর এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য খোদার সাহায্যের প্রয়োজন। আর এই সাহায্য অর্জনের জন্য আমাদেরকে কোন্ রীতি অবলম্বন করতে হবে? বলা হয়েছে, এর পরের দশ দিন খোদার সাহায্য এবং শক্তি যাচনা কর, যেন তোমাদের কর্ম স্থায়ীকর্মে রূপ নেয় আর সেই শক্তি হল ইস্তেগফার।

তিনি (আ.) বলেন, দ্বিতীয় দশক হল মাগফিরাতের দশক। যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আকুতি-মিনতিকারীর পাপ ক্ষমা করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বীয় ক্ষমা বা মাগফিরাতের চাদরে আবৃত করেন এবং তাদের উপর রহমতবারি বর্ষণ করেন বা কৃপা করেন। কিন্তু মু'মিন তারা, যারা এই সাত্তারী (দুর্বলতা ঢাকা) এবং রহমতকে জীবনের অঙ্গীভূত করে নেয়, যার বহিঃপ্রকাশ তার ইবাদতেও হওয়া চাই এবং অন্যান্য কর্মেও এবং স্থায়ী ইস্তেগফারের মাধ্যমেও আর নিজেদের কর্মের উপর দৃষ্টি রেখেও যেন হয়। এমনটি হলে খোদার মাগফিরাত বা ক্ষমা আমাদেরকে পরিবেষ্টন করবে এবং তাঁর রহমতের দ্বার আমাদের জন্য ক্রমাগতভাবে উন্মোচিত হতে থাকবে আর যখন এমনটি হবে, তখন পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিকও আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ক্রমাগতভাবে দিতে থাকবেন।

## ইস্তেগফারের প্রকৃত মর্ম

**একজন মু'মিনের জন্য মাগফিরাতের প্রকৃত মর্ম বা তত্ত্ব** কী, আর এটি লাভের উপায় কী, আর কীভাবে ইস্তেগফার করা উচিত, সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"ইস্তেগফারের প্রকৃত এবং সত্যিকার অর্থ হল আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই নিবেদন করা যে, মানবীয় কোন দুর্বলতা যেন প্রকাশ না পায় আর প্রকৃতিকে যেন আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় শক্তিতে শক্তিমান করেন এবং স্বীয় সাহায্য ও সমর্থনের গণ্ডিভুক্ত করে নেন। এই শব্দটি 'গাফার' থেকে উদ্ভূত, যা ঢেকে দেয়া বা আবৃত করাকে বলা হয়। অতএব, এর অর্থ হল আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় শক্তি বলে ইস্তেগফারকারী ব্যক্তির প্রকৃতিগত দুর্বলতাকে ঢেকে দিন।" ইস্তেগফারকারী ব্যক্তির প্রকৃতিগত দুর্বলতাকে যেন তিনি ঢেকে দেন আর অব্যাহত ইস্তেগফারের ফলে আল্লাহ্ তা'লা তা ঢেকেও রাখেন। তিনি (আ.) বলেন, "কিন্তু ইস্তেগফারের আসল এবং প্রকৃত অর্থ হল, খোদা তা'লা স্বীয় শক্তিবলে ইস্তেগফারকারীকে অর্থাৎ- যে ইস্তেগফার করে, তাকে প্রকৃতিগত দুর্বলতা থেকে রক্ষা করা এবং স্বীয় শক্তিবলে তাকে শক্তি যোগানো, স্বীয় জ্ঞানবলে তাকে জ্ঞান দান করা এবং স্বীয় নূর থেকে জ্যোতি দান করা। কেননা আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করে তার থেকে পৃথক হয়ে যান নি, বরং তিনি যেভাবে মানুষের খালেক বা স্রষ্টা আর তার সকল অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক শক্তিবৃত্তির স্রষ্টা, একইভাবে তিনি মানুষের কাইয়্যুমও, অর্থাৎ যা কিছু তিনি বানিয়েছেন, স্বীয় বিশেষ সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে তার সুরক্ষাকারী বটে।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, স্বীয় বিশেষ সমর্থনের মাধ্যমে তার সুরক্ষাও করেন। কেননা তিনি কাইয়্যুমও। "অতএব, খোদা তা'লার নাম যেহেতু কাইয়্যুম, অর্থাৎ স্বীয় সমর্থনের মাধ্যমে সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণকারী, তাই মানুষের জন্য আবশ্যক হল, যেভাবে সে খোদার খালিকিয়্যতের কল্যাণে সৃষ্টি হয়েছে, একইভাবে সে যেন আল্লাহ্ তা'লার কাইয়্যুমিয়াতের মাধ্যমে স্বীয় প্রকৃতিগত ছাপকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে।" (ইসমতে আম্বিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ৬৭১)

অতএব, মানুষের এটি একটি স্বাভাবিক প্রয়োজন ছিল, যার কারণে ইস্তেগফারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাইয়্যুমিয়ত থেকে অংশ লাভের জন্য, নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থাকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য কি করা উচিত? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ইস্তেগফার কর।

**অতএব, রমযানে মাগফিরাতের দিকে আমাদের যে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে,** সেক্ষেত্রে এই প্রেরণা বা স্পিরিটের প্রতি মনোযোগ রাখার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার রহমত থেকে যদি স্থায়ী অংশ পেতে চাও, তাহলে ইস্তেগফার কর এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে মাগফিরাত যাচ্না কর। অতএব,আল্লাহ্ তা'লা, যিনি এ দিনগুলোতে নিজ বান্দাদের প্রতি খুবই সদয় হয়ে থাকেন, তাঁর করুণার উভয় ধারা প্রবহমান রয়েছে। একটি হল সাধারণ কল্যাণধারা, যা থেকে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সবাই অংশ পায়। আরেকটি হল বিশেষ কল্যাণধারা, যা শুধু সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তা থেকেও যেন আমরা অংশ পেতে পারি। আর এক মু'মিন যেখানে এই কল্যাণধারা থেকে অংশ পাওয়ার জন্য, যা সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং পুণ্য করার শক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করবে, সেখানে ইস্তেগফারের মাধ্যমে খোদা তা'লার নূর থেকে আলো নেয়া এবং খোদার শক্তি থেকে তার শক্তি অর্জন করা উচিত, যেন কখনো সে খোদার জ্যোতি থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারে হাবুডুবু না খায় বা খোদা তা'লার শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে শয়তানের ক্রোড়ে গিয়ে পতিত না হয়। কেননা খোদার শক্তি যদি সাথে না থাকে, তাহলে শয়তানের আক্রমন বড় ভয়াবহ, যা তাৎক্ষণিকভাবে মানুষকে করতলগত করে ফেলে। তাই ইস্তেগফার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেন মানুষ খোদার শক্তিতে শক্তিমান হতে পারে এবং শয়তান থেকে সব সময় নিরাপদ থাকে।

অতএব, তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃতিগতভাবে মানুষ দুর্বল, আর এই

দুর্বলতা এড়িয়ে খোদার শক্তিতে শক্তিমান হওয়ার জন্য ইস্তেগফার করা আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং খোদার কৃপা ও রহমতকে নিজ জীবনে স্থায়ী করার জন্য মানুষের প্রয়োজন আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন। এটি ছাড়া আমরা কিছুই করতে সক্ষম নই আর আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নাম কাইয়্যুম রেখে আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য হল, এই নেক কর্ম অব্যাহত রাখার জন্য এবং খোদা তা'লার করুণা ও ক্ষমা থেকে স্থায়ীভাবে অংশ পাওয়ার জন্য খোদা তা'লার সাহায্য এবং তাঁর সমর্থনের প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম কাইয়্যুমই বলছে, কোন কিছুকে যদি স্থায়ীরূপ দিতে হয়, তাহলে তোমরা আমার সাহায্য এবং সমর্থনের মুখাপেক্ষী। তাই তোমরা আমার দিকে আসো। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই অবলম্বন কখনো ছেড়ে দিও না, যা চিরস্থায়ী। আল্লাহ্ তা'লা হচ্ছেন চিরস্থায়ী এবং স্থিতিদাতা আর সবচেয়ে দৃঢ় অবলম্বন।

**অতএব, আমাদের একথা বুঝতে হবে যে, 'মধ্যবর্তী দশক' মাগফিরাতের আশারা হওয়ার অর্থ এটি নয়** যে, এই দশ দিনে যত পার ইস্তেগফার করে নাও আর এভাবে তোমাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যাবে। বরং, মহানবী (সা.) আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন যে, রমযান এসেছে, খোদা তা'লা নিজ বান্দাদের নিকটবর্তী হয়েছেন। তোমাদের মনোযোগ দোয়া ও রোযার প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে। তাই এখন নিজেদের নেকী বা পুণ্যকে স্থায়ীরূপ দেয়ার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার রহমত এবং করুণা-সিন্ধু থেকে স্থায়ীভাবে অংশ লাভের জন্য এবং নিজেদের স্বভাবগত দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য খোদা তা'লার দরবারে ইস্তেগফারে রত থেকে তাঁর নিরাপত্তাবেষ্টনিতে আশ্রয় নাও আর চেষ্টা কর, যেন এই অবস্থা স্থায়ী হয়। আমি আশা করি, আমাদের অধিকাংশই এই চেতনার সাথে খোদার মাগফিরাত যাচনার মাধ্যমে দ্বিতীয় আশারা বা দ্বিতীয় দশক অতিবাহিত করেছেন। দ্বিতীয় আশারা যেহেতু সমাপ্ত, তাই আশা রাখি যে, এখন এই চেতনা নিয়ে তৃতীয় আশারায় প্রবেশ করছেন বলে আল্লাহ্ তা'লা থেকে প্রাপ্ত আলো এবং শক্তি আমাদেরকে খোদার সন্তুষ্টির জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কারণ হবে, ইনশাআল্লাহ্।

মহানবী (সা.) বলেছেন, শেষ দশ দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশারা। মানুষ যখন খোদার রহমতের চাদরে আবৃত হয়, তাঁর আলো থেকে অংশ নিয়ে তাঁর শক্তির বলে যখন এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন জানা কথা যে, সে খোদার নৈকট্য অর্জনকারীই হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা কাউকে প্রতিদানশূন্য রাখেন না। তিনি বড়ই দয়ালু এবং অনেক বড় দাতা। মানুষ যখন খোদার সন্তুষ্টির জন্য সৎকর্ম করে বা সৎকর্মের চেষ্টা করে, তখন খোদা তা'লা শুধু এতটুকুই বলেন না যে, ঠিক আছে আমি তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো না, তুমি জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়েছ বরং জাহান্নাম থেকে মুক্তির দশক আখ্যা দিয়ে তিনি (সা.) সত্যিকার অর্থে আমাদেরকে একথাই বলেছেন যে, এরূপ সৎকর্মশীলদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে স্বীয় জান্নাতের শুভসংবাদ দিচ্ছেন। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুস সওম, বাব মা জাআ ফি ফাযলে শাহরে রামাযানা, হাদীস নম্বর: ৬৮২)

যদি স্থায়ীভাবে তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে থাক, ইস্তেগফার করতে থাক, পুণ্যে অবিচলতার জন্য এবং পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য স্থায়ীভাবে যদি খোদার আঁচলকে আঁকড়ে ধরে রাখ, তাহলে জাহান্নামের দ্বার শুধু রমযানেই নয় বরং এই ত্রিশ দিনের ইবাদত, অঙ্গীকার আর অধিকার প্রদান এবং তওবা ও ইস্তেগফারের স্থায়ী অভ্যাস জাহান্নামের দ্বারকে চিরতরে রুদ্ধ করে দেবে।

## জান্নাত এবং জাহান্নামের প্রকৃত মর্ম

**জান্নাত এবং জাহান্নামের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন, "ধর্মের উদ্দেশ্য কি? ধর্মের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'লার সত্তা এবং তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে নিশ্চিত ঈমান অর্জিত হয়ে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে মানুষের মুক্তি লাভ করা, আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বন্ধন রচিত হওয়া। কেননা সত্যিকার অর্থে সেটিই জান্নাত, যা পরলোকে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাবে। আর সত্যিকার খোদা সম্পর্কে অনবহিত থাকা এবং সেই খোদা থেকে দূরে থাকা আর তাঁর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা না রাখা, এটিই বাস্তব অর্থে জাহান্নাম, যা পরলোকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাবে।" (চশমায়ে মসীহি, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৩৫২)

অতএব, এই গূঢ় তত্ত্ব আমাদের বুঝতে হবে যে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের ধারাও এই পৃথিবীতেই সূচিত হয় আর জান্নাত লাভও এই পৃথিবীতেই আরম্ভ হয়ে যায়। এই উভয়টির যে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে, যা বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন রূপে মানুষকে প্রভাবিত করবে, তা মূলত পরকালে হয়ে থাকে।

অতএব, খোদা তা'লার সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক, তওবা ও ইস্তেগফার মানুষকে এই পৃথিবীতেই জান্নাতে ধন্য করে, যার ব্যাপকতর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে পরকালে। আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক এবং ভালোবাসা, তাঁর করুণা এবং ক্ষমা প্রতিনিয়ত যাচনা না করা, তাঁর আদেশ-নিষেধকে জেনেশুনে লঙ্ঘন করারই নামান্তর। এটি খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। এরপর পবিত্র কুরআনের বরাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিষয়টিকে এভাবে খোলাসা করেছেন:

**"জান্নাত এবং জাহান্নামের যে চিত্র পবিত্র কুরআন তুলে ধরেছে তা অন্য কোন গ্রন্থ**

**করেনি।** পবিত্র কুরআন এটি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছে যে, এ পৃথিবীতেই এই ধারার সূচনা হয়। কুরআন বলে, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ (সূরা আর-রহমান: ৪৭) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার কথা ভেবে ভীত, তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে। অর্থাৎ- একটি জান্নাত তো এই পৃথিবীতেই লাভ হয়। কেননা খোদার ভয় এবং ভীতি তাকে পাপ থেকে বিরত রাখে।" (পাপ থেকে বিরত থাকলে জান্নাত লাভ হয়)। "আর পাপের দিকে ধাবিত হওয়া হৃদয়ে এক প্রকার ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তি সৃষ্টি করে, যা নিজেই একটি ভয়াবহ জাহান্নাম।" (খোদাভীতি পাপ থেকে বিরত রাখে আর মানুষ যখন পাপ থেকে বিরত থাকে, তখন সে এই পৃথিবীতেও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পায় আর পাপের দিকে ধাবিত হওয়া এবং পাপ করার ফলে কোন পাপী কখনো শান্তি বা স্বস্তি পায় না। কোন না কোন স্থানে তার ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তি লেগেই থাকে। পাপ করার পর মানুষের এই যে অবস্থা, এটি স্বয়ং এক জাহান্নাম। তিনি (আ.) বলেন,) "কিন্তু যে ব্যক্তি খোদাকে ভয় করে পাপ বর্জন করে সে সেই শাস্তি এবং বেদনা থেকে তাৎক্ষণিকভাবে রক্ষা পায় (যে খোদার ভয় করে সে সহসাই রক্ষা পেলো) যা রিপুর তাড়না এবং কামনা-বাসনার দাসত্বের ফলে সৃষ্টি হয়।" অর্থাৎ মানুষ যে প্রবৃত্তির দাসত্বের শৃংখলে এসে যায় বা রিপুর হাতে জিম্মি হয়ে যায়, খোদাভীতি থাকলে তা থেকে সে রেহাই পেয়ে যায়।

তিনি (আ.) আরও বলেন, "বিশ্বস্ততা এবং খোদার সামনে বিনত হওয়ার ক্ষেত্রে সে উন্নতি করে।" (আর মানুষ যখন এগুলো পরিহার করে চলবে তখন খোদা তা'লার প্রতি বিনত হওয়ার ক্ষেত্রে সে উন্নতি করবে,) "যার ফলে এক স্বাদ এবং প্রশান্তি তাকে দেয়া হয়, আর এভাবে তার জন্য এ পৃথিবীতেই জান্নাতী-জীবনের সূচনা হয়।" (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫-১৫৬)

অতএব, ইহলৌকিক জান্নাতী জীবন বা পরকালে জান্নাত লাভের প্রচেষ্টা এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া কী এবং তা কীভাবে লাভ হতে পারে? তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুসারে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া এবং জান্নাত লাভ করা শুধু পারলৌকিক জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এই পৃথিবীতে বা ইহলৌকিক জান্নাত এবং জাহান্নামও রয়েছে। আর এই জাহান্নাম থেকে তখনই রক্ষা পাওয়া সম্ভব, যদি মানুষ খোদা তা'লাকে ভয় করে। আর যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, সত্যিকার সৎকর্মশীল সে, যার মনমস্তিষ্কে সব সময় এই ধারণা বিরাজমান থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দেখছেন। যখন এই চেতনা থাকে যে, খোদা তা'লা আমাকে দেখছেন, তখনই খোদাভীতি সৃষ্টি হয় আর কেবল তবেই মানুষ পাপ এড়াতে সক্ষম হয়। আর যে পাপ বর্জনে সক্ষম হয়, সে হৃদয়ের উৎকণ্ঠা থেকেও রক্ষা পায়। কোন ব্যক্তি চোর হলে বা অপকর্মশীল হলে সব সময় তার কোন না কোনভাবে এই আশংকা থাকে যে, কোথাও আমি ধরা না পড়ি বা কোন প্রকার দুর্নাম হয়ে না যায়। তিনি (আ.) বলেন, এই ভয় তাকে এই পৃথিবীতেই জাহান্নামে নিপতিত করে।

অতএব, খোদাভীতি যার আছে, সে এই জগতেও এবং পরকালেও জান্নাত লাভ করে। আর পাপ ও রিপুর তাড়নার শিকার ব্যক্তি এই পৃথিবীতেও আর পরকালেও জাহান্নামের ভাগী হয়। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হওয়া এবং তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শনই আসলে জান্নাত আর আল্লাহ্ থেকে দূরে যাওয়াই হল জাহান্নাম। অতএব, জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের অর্থ হল, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মেনে চলা এবং খোদাভীতি ও খোদার তাকওয়াকে সব সময় দৃষ্টিগোচর রাখা।

**অতএব, সংক্ষিপ্ত এই হাদীসে তিনটি কথা উল্লেখ করে** মহানবী (সা.) যেখানে খোদা তা'লার রহমতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেখানে এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য ইস্তেগফার করার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দিয়ে পুনরায় বলেন, মানুষ যদি এটি অর্জনে সক্ষম হয় তাহলে তাঁর প্রতিটি কথা এবং কর্ম খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত হয়, পাপের প্রতি ঘৃণা এবং পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। রমযানের স্থায়ী কল্যাণধারা তার জীবনে প্রবাহিত হয় এবং তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয় আর ইহকাল ও পরকালে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করে সে তাঁর জান্নাতে ধন্য হয়।

## লাইলাতুল কদরের মাহাত্ম্য

অতএব, একথা সর্বদা আমাদের দৃষ্টিগোচর রাখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ভাবতে হবে। রমযানের শেষ-দশকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আর ঈমানকে চির-নিরাপদ রাখার জন্য এবং তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আরও একটি কথা এবং আরো একটি বিষয়ের প্রতিও মহানবী (সা.) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, বরং সুসংবাদ প্রদান করেছেন আর তা হল, রমযানের শেষ-দশকে লায়লাতুল কদর রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যেব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আত্মজিজ্ঞাসার চেতনা নিয়ে রমযানের রোযা রাখে, তার অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে আর যেব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আত্মজিজ্ঞাসার প্রেরণায় লায়লাতুল কদরের রাতে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তার অতীতের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (সহীহ বুখারী, কিতাব ফযলু লাইলাতিল কাদরে, বাব ফযলু লাইলাতিল কাদরে, হাদীস নম্বর: ২০১৪)

**লায়লাতুল কদরের অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে,** কিন্তু রমযানের এই রোযাও একই গুরুত্ব রাখে। এটি সঠিক যে, এক রাতে পাপ ক্ষমা করা হয়। কিন্তু অতীতের নেক কর্মও রয়েছে আর রমযানের ত্রিশ দিনেও যদি একই কাজ করা হয়, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এগুলো হল সেই শর্ত, যা আবশ্যকীয়। অর্থাৎ- ঈমানী চেতনা এবং আত্মজিজ্ঞাসাও আবশ্যক,

একই সাথে রমযানের রোযা রাখা এবং লায়লাতুল কদর পাওয়া ও পাপের ক্ষমা লাভ করাও আবশ্যক। যদি রমযানের প্রথম দিনগুলোতে কোন দুর্বলতা থেকে থাকে, তাহলে শেষ দিনগুলোতে তা দূর করার চেষ্টা থাকা উচিত। মহানবী (সা.) শুধু এই কথা বলেন নি যে, শুধু তার পাপই ক্ষমা করা হবে, যে লায়লাতুল কদর লাভ করবে। বরং প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যে রোযা এবং লায়লাতুল কদর ঈমানের সাথে এবং আত্মজিজ্ঞাসার চেতনা নিয়ে অতিক্রম করে, তার উচিত, আল্লাহ্ তা'লার কাছে ক্ষমা পাওয়ার আশা রাখা। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ক্ষমা করে থাকেন।

মু'মিনের অনেক বিশেষত্ব এবং মু'মিন হওয়ার জন্য অনেক শর্তের কথা আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন। একইভাবে, আল্লাহ্ তা'লা যেখানেই এই শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে অনেক জায়গায় ঈমানকে সৎকর্মের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় ঈমান এবং একই সাথে সৎকর্মের কথা বলা হয়েছে। অতএব, এদিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে যে, ঈমান কাকে বলে?

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনের অনেক চিহ্ন এবং লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। উদাহারণ স্বরূপ, একটি লক্ষণ হল–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

(সূরা আল্ আনফাল: ৩)

অর্থাৎ- মু'মিন কেবল তারাই, যাদের সামনে আল্লাহ্ তা'লার কথা যখন উল্লেখ করা হয়, তখন তাদের হৃদয় ভীত এবং ত্রস্ত হয়। কাজেই মু'মিনের পরিচয় হল, তার যেন সব সময় এই চেতনা থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ অনুসারে জীবনযাপন করা উচিত আর আল্লাহ্ তা'লা এই এই নির্দেশ দিয়েছেন। যখনই আল্লাহ্ তা'লার বরাতে কোন কথা তাকে স্মরণ করানো হয়, তাৎক্ষণিকভাবে সে ভীত হয় এবং সেগুলো মেনে চলার চেষ্টা করে।

অতএব, বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তা'লার বরাতে যখনই সৎকর্ম করার এবং অন্যের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়, তখনই এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত। খোদা তা'লার বরাতে যখন বলা হয় যে, এগুলো পালন কর আর তা সত্ত্বেও মানুষ যদি সেগুলো পালনের প্রতি মনোযোগ না দেয় তাহলে প্রশ্ন হল, এই আয়াতের অধীনে সে কি তখন মু'মিনদের শ্রেণিভুক্ত থাকবে? কিংবা আমরা যদি মনোযোগ না দেই তাহলে কি আমরা মু'মিনদের জামাতভুক্ত? তিনি (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি আত্মজিজ্ঞাসার চেতনা নিয়ে এবং নিজ ঈমানের অবস্থা বিশ্লেষণ সাপেক্ষে রোযা রাখে এবং লায়লাতুল কদর অতিক্রম করে, তাহলে তার পাপ ক্ষমা করা হবে।

অতএব, রমযান এবং লায়লাতুল কদরের কল্যাণ শর্তসাপেক্ষ। যেমনটি আমি শুরুতেও বলেছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলী শর্তসাপেক্ষ হয়ে থাকে। মানুষের ঈমানে যদি দুর্বলতা থাকে আর অন্যের অধিকার যদি সে পদদলিত করে, তারপরও যদি সে লায়লাতুল কদর দেখেছে বলে দাবি করে, যদি তার মাঝে দোয়ার বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয়, জীবনে পূর্ণ বিপ্লব আসে তাহলে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা এবং রহমত তাকে ধন্য করেছে। আর এর দাবি হল, এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলা। অবস্থা যদি এমন না হয়, তাহলে হতে পারে, যাকে সে লায়লাতুল কদর মনে করেছে, সেটি এক আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি (আ.) বলেছেন, ঈমানও পরিপূর্ণ হওয়া চাই এবং আত্মজিজ্ঞাসার চেতনাও থাকা চাই।

এ বিষয়টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, **শুধু সেই বিশেষ রাতই লায়লাতুল কদর নয়। লায়লাতুল কদরের তিনটি রূপ রয়েছে। একটি হল সেই রাত, যা রমযান মাসে আসে। একটি হল, সেই যুগ, যা কিনা নবীর যুগ। আরেকটি হল, মানুষের জন্য বা প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে লায়লাতুল কদর তখন আসে, যখন সে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।** (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৬)

জাগতিক সকল নোংরামি এবং কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ যখন নিজ ঈমানের উপর দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং আত্মজিজ্ঞাসার চেতনা নিয়ে সকল পাপকে যখন সে ঝেড়ে ফেলে, সেটিই সেই লায়লাতুল কদর। এটি যদি লাভ হয় আর আমরা সম্পূর্ণভাবে যদি খোদার হয়ে যাই এবং তাঁর নির্দেশাবলীর মান্যকারী হই, নিজেদের ইবাদতের মানোন্নয়নকারী হয়ে যাই তাহলে এটি আমাদের সেই লক্ষ্য, যা অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা যদি এই মর্যাদায় উপনীত হই বা এটি যদি আমরা অর্জন করতে পারি, তাহলে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি রাত আমাদের দোয়া গৃহীত হওয়ার সময় বলে গণ্য হবে। আমরা যারা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিকের অনুসারী, নিজেদের অবস্থায় বিপ্লব সাধন করে নিজেদের ঈমানকে আমাদের সেই পর্যায়ে উপনীত করা প্রয়োজন, যেখানে আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্ম খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত হবে, আমরা আত্মজিজ্ঞাসার প্রেরণা নিয়ে নিজেদের জীবন যাপনকারী হব আর রমযানের কল্যাণ আমাদের মাঝে চিরস্থায়ী হবে।

**খোদা করুন, আমাদের মাঝে অনেকেই সেই লায়লাতুল কদরের অভিজ্ঞতাও লাভ করুক**, যা দোয়া গৃহীত হওয়ার বিশেষ সুযোগ নিয়ে আসে, যা সেই শেষ-দিনগুলোতে আসে, যার কথা মহানবী (সা.) আমাদেরকে অবহিত করেছেন। এটি পাওয়া আমাদেরকে যেন পুণ্য এবং তাকওয়ার পথে পরিচালিত করে, বরং এক্ষেত্রে যেন আমাদেরকে উন্নত করে। আমাদের অতীতের সকল পাপের যেন ক্ষমা হয় আর ভবিষ্যতের পাপ বর্জনের জন্যও আল্লাহ্ তা'লা নিজ বিশেষ অনুগ্রহে আমাদের মাঝে শক্তি এবং সামর্থ্য সৃষ্টি করুন। (আমীন)

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩১ জুলাই-০৬ আগষ্ট ২০১৫, ২২তম খণ্ড, ৩১তম সংখ্যা, পৃ. ০৫-০৮)

# যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

অনুবাদ– **মরহুম মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাঁর ভালবাসা লাভের জন্যে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করা যেখানে একটি অতি বড় পুণ্য ও মঙ্গল এবং দেশেরও মঙ্গল লাভের একটি বড় প্রত্যাশা সেখানে এটা একটি আর্থিক ইবাদতও বটে।

যে জাতি মজুদ্‌দারী ও ধন-সম্পদ জমা করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় আর জাতীয় প্রয়োজন এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে উদার মনে ব্যয় করতে ইতস্তত করে, ধ্বংস ও বিনাশ এর দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে। ফিৎনা-ফাসাদ এবং নিরাপত্তাহীনতা ও বিশৃঙ্খলা তাদের ললাটের লিখন হয়ে যায়। এতেও কৃপণ জাতি হাবুডুবু খেতে থাকে। মানুষ যে ধন-সম্পদ লাভ করে তা আল্লাহ্‌ই দিয়ে থাকেন। আর এটা তাঁর আমানত। আল্লাহ্‌ তা'লা যদি এ আমানত থেকে কিছু নিতে চান আর বান্দাকে তাঁর দেয়া সম্পদ থেকে তাঁর পথে ব্যয় করতে বলেন তাহলে আনন্দ ও পূর্ণ প্রশান্তির সাথে আল্লাহ্‌ তা'লার এ আদেশকে মান্য করা এবং তাঁর পথে ব্যয় করা মানুষের বড়ই সৌভাগ্য ও তাঁর পক্ষ থেকে আরও কল্যাণ লাভকারী হওয়ার সুনিশ্চিত ও অকাট্য মাধ্যম।

আল্ খলক্বু আয়ালূল্লাহ্‌ (সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পরিবার) হাদীসের অধীনে জীবনের দিক থেকে সব মানুষ আল্লাহ্‌র সকাশে একই রকম অধিকার ও মর্যাদার অধিকারী। আর বিশ্বের সম্পদরাজিতে সবাই একই রকম অংশীদার। যদিও নিজ নিজ উপায় উপকরণ এবং সামর্থ্যের দিক থেকে সকলের মালিকানার পরিমাণ এক নয়। বরং অবস্থার প্রেক্ষিতে কারও কারও নিকট সম্পদ বেশি থাকে এবং কারও নিকট কম। একজন রুজি-রোজগারের পদ্ধতি ভালভাবে জানে। আবার অন্য একজন এ ব্যাপারে আনাড়ি বা অদক্ষ। উপায় উপকরণও নেই। কিন্তু এ পার্থক্যের কারণে দুর্বল, উপায়হীন ও নিঃস্ব নিজ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না। কুরআন করীমের আয়াত ওয়া ফী আমওয়ালিহিম হাক্কুল্লিস্‌সায়িলি ওয়াল মাহ্‌রূম (আর এদের ধন-সম্পদে যারা চায় এদের অধিকার ছিলো আর যারা চাইতে পারে না তাদেরও অধিকার ছিলো (সূরা যারিয়াতঃ ২০)-এ এই তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছে।

অতএব বিত্তবানদের কর্তব্য, তাদের সম্পদে অন্যদের যে অধিকার রয়েছে তা যেন সানন্দে ও পূর্ণ আন্ত-রিকতার সাথে আদায় করে। এতে তাদের নিজেদের মঙ্গল ও তাদের তহবিলে যে অর্থ আছে এর প্রকৃত সংরক্ষণের রহস্য নিহিত। দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি নির্দেশ, তারা অন্যদের ধন-সম্পদের প্রতি ঈর্ষা, লালসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার নিয়্যতে যেন না তাকায়। আর অবৈধ পন্থায় হাতিয়ে নেয়ার ও এর ওপর শক্তিপ্রয়োগে দখল করার পথ যেন অবলম্বন না করে। অন্যদিকে বিত্তবানদের প্রতি নির্দেশ তারা সমাজের দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি যেন দৃষ্টি রাখে এবং জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষ যেমন, খাবার, পোষাক, বাসস্থান প্রভৃতির সমস্যায় এদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে না দেয়, যা এতই করুণ যে বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এতে তাদের সংকীর্ণতা ও বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

অতএব যদি ধনী ও বিত্তবানরা চায়, দরিদ্ররা আল্লাহ্‌ তা'লার এ আদেশ পালন করুক অর্থাৎ অন্যের ধন-সম্পদ জবরদখল না করার যে নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছে, তাহলে তাদেরও (অর্থাৎ ধনীদের) কর্তব্য তারাও আল্লাহ্‌ তা'লার এ নির্দেশ যেন পালন করে এবং নিষ্ঠার সাথে এর প্রতি কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়। পৃথিবী থেকে পরমুখাপেক্ষিতা দূর করার লক্ষ্যে এবং একে নিম্নতম পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌ তা'লার পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে তাদেরকে সে নির্দেশই দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু সবচে' বড় সমস্যা হল ধন-সম্পদের অসম বন্টনের বিষয়টি। একটি গোষ্ঠী যেমন প্রাচুর্যের মাঝে গড়াগড়ি যাচ্ছে তেমনি একটি গোষ্ঠী চরম দারিদ্র ও নিঃস্ব অবস্থায় কালাতিপাত করছে। এ আকাশচুম্বি ব্যবধানের কারণে উভয় গোষ্ঠীর মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে। আর এভাবেই এদের মাঝে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, বিদ্বেষ ও প্রতিশোধের স্পৃহা বারে বারে অস্থিতিশীল অবস্থা ও বিপ্লবী স্লোগানের শিকারের কারণে পরিণত হচ্ছে। বিশ্ব এখন পর্যন্ত এথেকে মুক্তি লাভ করতে পারে নি।

ধনী-দরিদ্রের এ ব্যাপক সমস্যা সমাধানের উত্তম মাধ্যম হলো আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের অভ্যাস থেকে এ

আবেগ জাগ্রত হয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে যে, প্রত্যেকের সঠিক অধিকার লাভ করা আবশ্যক। আর কাউকে লুটতরাজের অধিকার ও কারও মাঝে বঞ্চনার অনুভূতি সৃষ্টি হতে দেয়া উচিত নয়। ইসলাম যেখানে (আল্লাহ্‌র পথে) অর্থ ব্যয়ের ভরপুর আহ্বান জানিয়েছে সেখানে এর উদ্দেশ্যও নির্ধারিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ ব্যয় করেন যিনি তার উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ। এর পেছনে পার্থিব কোন উদ্দেশ্য কাজ করে না। নইলে আত্ম-তুষ্টি, লালসা, অবৈধ আয়ের প্রলোভন আর অন্যদের প্রতি অনুগ্রহের কথা বলে অহমিকাপূর্ণ কুঅভ্যাস থেকে মুক্তি লাভ কষ্টকর হবে। আর সেই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না যার লক্ষ্যে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করতে এতটা তাগিদপূর্ণ আহ্বান জানানো হয়েছে।

## আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের শ্রেণীভেদ

ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের অপর নাম সদকা। আর সদকার কয়েকটি শ্রেণীভেদ রয়েছে, যেমন ঃ

(১) জাতীয় ও সার্বজনীন প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করা। এর জন্যে প্রয়োজন একটি শর্ত। সার্বজনীন ক্ষয়-ক্ষতি দেখা দিলে আর ধর্মীয় নেতৃত্ব থেকে দাবী করা হলে, যার কাছে যা আছে তা নিয়ে আসুক যেন এ ক্ষয়-ক্ষতির মোকাবেলা করা যায়। তখন যার কাছে যা আছে তা নিয়ে উপস্থিত হওয়া সকলের অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। ঐশী নির্দেশ হলো ঃ ইন্নাল্লাহাশ্‌তারা মিনাল মু'মিনীনা আনফুসাহুম ও আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনের কাছ থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদ এ অঙ্গীকারের বদলে ক্রয় করে নিয়েছেন যেন তাদের জান্নাত লাভ হয় (সূরা তাওবা ঃ১১)। এতে এ তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(২) সঞ্চয় ও প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ থেকে ব্যয় করা। এর আবার দু'টি শ্রেণী রয়েছে ঃ (ক) মানুষ স্বেচ্ছায় নিরুপণ করে এমন ব্যয়। যেমন ঐচ্ছিক সদকাসমূহ যেসব মানুষ অভ্যন্তরীণ তাক্‌ওয়ার সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেয়। অনুগ্রহের বদলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, উপহার ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের খাতিরে বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ও ঐচ্ছিক ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) লাযেমী বা অবশ্য দেয় চাঁদা, একজন মুসলামান সাধারণত যা ব্যয় করতে বাধ্য, যেমন সামগ্রিক অবশ্য দেয় চাঁদাগুলো যা সাধারণ সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও ইসলামের প্রচার কাজ অব্যাহত রাখার জন্যে যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে আহূত মজলিসে মুশাভিরাত (পরামর্শ সভা) প্রস্তাব করে এবং যুগ-খলীফা এর অনুমোদন দেন।

(গ) সরকারের পক্ষ থেকে প্রবর্তিত ট্যাক্সসমূহ এর অধীনে আসে।

(ঘ) এছাড়াও নিকটবর্তী লোকদের জন্যে ব্যয় , সেবার দায়িত্ব পালন, ঈদুল ফিতরের সদকা, ফিদিয়া, কাফ্‌ফারা ও নযর বা মানত সম্বন্ধীয় ব্যয়ও দেয় চাঁদার অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) আল্লাহ্‌র পথে একটি আবশ্যিক খরচ এর বিশেষ ও পরিভাষাগত নাম যাকাত। আর এ ব্যয়ের বিস্তারিত কথা এখন দৃষ্টিপটে রয়েছে ঃ

সঞ্চয় থেকে আবশ্যিক খরচের মাঝে যাকাত সবচে' বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কেননা, এটা আল্লাহ্‌র পথে নিম্ন পর্যায়ের ব্যয়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে প্রত্যেক 'সাহেবে নিসাব' মুসলমানের জন্য এটা ব্যয় করা ফরয। সমাজের এটা প্রয়োজন হোক বা না হোক অবশ্যই এ ব্যয়টি জরুরী। এ কারণেই যাকাতের আদায় সেই সময়ও প্রয়োজনীয় হবে যখন সমাজের সব রকমের জাতীয় ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন অন্য মাধ্যমে সহজে পূরণ হতে থাকবে। কেননা, এ অর্থ ব্যয় প্রকৃতপক্ষে এ উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করা হয়েছে যেন আল্লাহ্‌র পথে ব্যক্তির ব্যয় করার অভ্যাসটা চিরস্থায়ী হয়। সংকীর্ণতা, কৃপণতা ও ঈর্ষার মূলোৎপাটন হতে থাকে। আর ঐশী বাণী কাইলা ইয়াকূনা দূলাতাম্ বায়নাল আগনিয়া-ই মিনকুম (সূরা হাশ্‌ র ঃ ৮) অর্থাৎ যেন এটা তোমাদের বিত্তশালীদের মাঝে চক্রাকারে আবর্তিত না হয়– এর উদ্দেশ্য সাধিত হয় আর সমাজে জালেম ও কৃপণ ব্যক্তিদের শোষণ থেকে সুরক্ষা লাভ করে।

## যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য

ইসলাম টাকা-পয়সা আয় করতে নিষেধ করে নি। অবশ্য টাকা-পয়সা আটকে রাখতে বা খরচ না করতে নিষিদ্ধ করেছে। এরপরও যদি কোন ব্যক্তি নিজের ভবিষ্যত প্রয়োজনের খাতিরে সাবধানতাবশত কিছু অর্থ সঞ্চয় করে আর পড়ে থাকতে থাকতে অনেকটা বছর এভাবে কেটে যায় তাহলে টাকা-পয়সার ওপর যাকাত প্রদান অবশ্য-কর্তব্য হয়ে যাবে। এর প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

খুয্ মিন আমওয়ালিহিম সদক্বাতান তুত্বাহহিরুহুম তুয্‌কীহিম অর্থাৎ হে রসূল! এদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করো এভাবেই ওগুলো পাক এবং ওগুলোর পবিত্রতার উপকরণ সৃষ্টি করে দেবে (সূরা তাওবাঃ ১০৩)

## যাকাতের ধন-সম্পদ

যাকাতের ধন-সম্পদ দু'প্রকারের হয়ে থাকে। গুপ্ত ধন-সম্পদ ও বাহ্যিক ধন-সম্পদ। গুপ্ত ধন-সম্পদ নগদ অর্থ, সোনা-রূপা যে আকারেই হোক না কেন, অলংকারাদি হোক বা ব্যবহৃত আর কোন জিনিস।

(ক) বাহ্যিক ধন-সম্পদ ঃ গবাদি পশু। যেমন উট, গাভী, মোষ, ভেরা, ছাগল জাতীয় পশু। শর্ত এই যে, বাইরে সরকারী চারণ ক্ষেত বা এজমালী গ্রাম্য স্থানে চরে খায় আর এদেরকে বেঁধে রীতিমত খাবার দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

(খ) জমিতে উৎপন্ন ফলাদি। যেমন , গম, যব, জোয়ার , ধান-চাল, বজরা, খেজুর, আঙ্গুর, বনের মধু যা কেউ সংগ্রহ করেছে।

(গ) যেসব ধাতব পদার্থ ব্যক্তির নিকট মজুদ আছে যেমন, লোহার খনি, তামার খনি, টিনের খনি, তেলের খনি প্রভৃতি।

(ঘ) ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যবহৃত সম্পদ ঃ শিল্প কারখানার ব্যবহৃত পূঁজি।

(ঙ) বাহ্যিক ধন-সম্পদ থেকে আসলে যাকাত সংগ্রহ করার অধিকার সরকারের। এর কারণে যে, যেসব জমি থেকে সরকার রাজস্ব আদায় করে বা যেসব শিল্প-কারখানার প্রতি ইনকামট্যাক্স (আয়কর) আরোপ করে এর ওপর অতিরিক্ত যাকাত নেই; কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্র ছাড়া যেখানে সরকারী ট্যাক্স যাকাতের নির্ধারিত হার থেকে কম।এক্ষেত্রে যে পার্থক্য এর হিসেবে নিজ থেকে অথবা সরকারের দাবী অনুযায়ী সানন্দে যাকাত আদায় করা কল্যাণ ও মঙ্গলের কারণ আর পুণ্যেরও কারণ।

(চ) গুপ্ত ধন-সম্পদের তদারকি সরকারের পক্ষ থেকে হতে পারে না। যেভাবে জমাকৃত নগদ অর্থ মূল্যবান অলংকারাদি, বিভিন্ন

প্রকার মূল্যবান পাথর পদ্মরাগ, জমরূদ (এক প্রকারের মূল্যবান সবুজ পাথর)। এসব সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করা একজন সত্যিকারের মুসলমানের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। এ যাকাত গরীব মিসকিন অভাবী ব্যক্তিদেরকে স্বয়ং নিজের ইচ্ছায় দিতে পারে আর ধর্মীয় আঞ্জুমান ইশাআতে ইসলামের জন্য কেন্দ্রীয় অফিসাদির মাধ্যমেও বন্টন করা যেতে পারে। অধিকতর উত্তম ও প্রত্যেক দিক থেকে কল্যাণকর পদ্ধতি এই, এ ধরনের সবটা যাকাত যেন যুগ-খলীফার কাছে পাঠানো হয় যাতে গোটা জামাতের গরীব মিসকীন ও অভাবীদের এ সম্পদ থেকে অংশ লাভ হয়। কারণ এটাই, উম্মতের সব আলেম এ নিয়মকে স্বীকার করেছেন। যাকাত বন্টন করা যুগ-ইমামের অধিকার (তশরীহে যাকাত, পৃষ্ঠা ১৩৬)।

## যাকাতের আবশ্যক শর্তাবলী

জমি থেকে উৎপন্ন ফসলাদি যেমন, বিভিন্ন প্রকারের শস্য, খেজুর, আঙ্গুর, মধু, এদের বেলায় তখন যাকাত অবশ্য দেয় হয় যখন এগুলো পাকার উপযুক্ত হয় আর এর নিসাব পূর্ণ হয়। এরপর এ উৎপন্ন দ্রব্য যত বছরই পড়ে থাকুক না কেন এর ওপর যাকাত প্রবর্তিত হবে না।

অন্য রকমের সম্পদ যেমন নগদ অর্থ, সোনা, রূপা, ব্যবসায়ের মালামাল, গবাদি পশু এগুলোর ওপরে যাকাত তখন অবশ্য-কর্তব্য হবে যখন তা নির্ধারিত নিসাব-এর সমান হয় আর সারা বছর অধীনে থাকে। যত বছর অধীনে থাকবে প্রত্যেক বছর এগুলোর ওপর যাকাত অবশ্য-দেয় হবে। গবাদি পশুর জন্যে একটি বিশেষ শর্ত এটাও। এরা বাইরে সরকারী চারণ ক্ষেত্র, জঙ্গল এবং গ্রাম্য চারণ ক্ষেত্রে চরে আর এর ওপর তাদের জীবন নির্বাহ হয়, তাদের স্বয়ং খাবার দিতে হয় না। তদুপরি ওগুলো হালে জোতার এবং বোঝা বহনের কাজেও লাগে না।

গবাদি পশুর যাকাত প্রকৃতপক্ষে এমন দেশ ও এলাকার সাথে সম্পর্ক রাখে যেখানে বিস্তীর্ণ চারণ ক্ষেত্র সহজে পাওয়া যায়। সেখানে হাজার হাজার লাখ লাখ ভেড়া-বকরী ও গাভী পাওয়া যায়। এর উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন ও দুধ বা মাংস রপ্তনী করা হয়ে থাকে অথবা কোন প্রকারের অন্যান্য ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পেশা হিসেবে পশু পালন করা হয়ে থাকে।

**যাকাতের নিসাব ও নিয়মাবলীঃ**

নগদ অর্থ, সোনা, রূপা এবং অন্যান্য সব রকমের মূলধনের জন্যে নিসাবের নিরিখ হলো রূপা অর্থাৎ যার নিকট ৫২ তোলা ৬ মাসা অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা থাকে বা এত রূপা বা সোনা থাকে যা দিয়ে এ পরিমাণ রূপা কেনা যায় তখন এর যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য হবে। যাকাতের বিষয় হলো পুরো মূলধনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা আড়াই (২.৫%)শতাংশ যেমন, ৫২ তোলা ৬ মাসা রূপার মূল্য যদি ১০,৫০০ টাকা হয় আর এত অর্থ তার নিকট থাকে তাহলে ২.৫% হিসেবে নিশ্চিত তাকে ১৬২.৫০ টাকা যাকাত দিতে হবে।

এটা সেই সম্পদের যাকাত যার জন্যে নিসাবের নিরিখ রূপা আর নিসাবের নিরিখ জানার জন্যে ওজন হলো মাধ্যম।

মহিলাদের বক্তিগত ব্যবহারে থাকে এমন সোনা ও রূপার অলংকারাদির বেলায় এবং কখনও কখনও চাওয়ার পরে তারা গরীব স্ত্রীলোকদের ব্যবহার করতে দেয় এর ওপরে যাকাত হবে না। সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন, 'যে অলংকার ব্যবহারে রয়েছে এর যাকাত নেই।' আর রেখে দেয়া হয় এবং কখনও কখনও পরা হয় এর যাকাত দেয়া আবশ্যক। যে অলংকার পরা হয় আর কখনও কখনও দরিদ্র মহিলাদেরকে ব্যবহার করতে দেয়া হয়, কোন কোন লোকের এ ব্যাপারে ফতওয়া এই যে, এর যাকাত নেই। আর যে অলংকার পরা হয় এবং অন্যকে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয় না এর যাকাত দেয়া ভাল। কেননা, এ নিজের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের ঘরে এর ওপর ও নিজেদের বর্তমান অলংকারের ওপর যাকাত দেয়া হয় আর যে অলংকার টাকা পয়সার মত রাখা হয় এর যাকাত দেয়ার প্রসঙ্গে কারও মতভেদ নেই" (মযমুআ ফাতাওয়া আহমদীয়া, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৭, আল্ হাকাম, ১৭ নভেম্বর, ১৯০৫)।

ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত মূলধনের ওপর যাকাত আদায় করার আসল অধিকারী যদিও সরকার আর নিজেদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে তারা ট্যাক্সের পরিমাণও নির্ধারণ করেন। তবুও দিক-নির্দেশনার জন্যে উম্মতের আলেমগণ মূলধনের ওপর যাকাত নির্ধারণের যে নীতি প্রস্তাব করেছেন এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলে অপকার হবে না। শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগকৃত মূলধন থেকে কেবল সেই মূলধনের ওপর যাকাত প্রদেয় যা ব্যবসায়ের আবর্তনে রয়েছে অর্থাৎ মালামাল আনতে ও মালামাল বিক্রি করতে ও মালামাল তৈরী করতে হয়। যে পুঁজি বিনিয়োগকৃত কারখানার মেশিনারী, দালান-কোঠা, প্রয়োজনীয় অফিসাদি, ফার্নিচার ও হিসাব কিতাবের রেজিষ্টার বই খাতা এবং ফাইল ইত্যাদিতে ব্যয় হয়েছে এর ওপর যাকাত প্রদেয় হবে না। এভাবে বাস, ট্রাক, টেক্সি ও ভাড়া দেয়ার নিমিত্তে নির্মাণকৃত দোকান-পাট ও ঘর-বাড়ী নির্মাণের ব্যয়কৃত মূলধনও যাকাত থেকে রেয়ায়েত হবে। এমনিভাবে এসব জিনিষ যা মানুষের আসল প্রয়োজন মিটাতে ব্যয় হয় যেমন থাকার বাড়ী, পরার কাপড়-চোপড়, ঘরের আসবাবপত্র, ফার্নিচার, আসা-যাওয়ার গাড়ী, লাইব্রেরীর পুস্তক ইত্যাদি-এর যতই মূল্য হোক না কেন, লক্ষ লক্ষ টাকারই হোক না কেন এর ওপরও যাকাত প্রদেয় হবে না।

মোটকথা যাকাত চলমান ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধনের প্রতি। যাকাতের হিসাব এভাবে হতে পারে। যত টাকা যে যে মাসে ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয় তত টাকা সেই সেই মাসে উল্লেখ করে সবটা একত্র করে নেয়া হয় আর ১২ দিয়ে ভাগ করে যে সংখ্যা বের হয় এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দিতে হয়। যেমন, ২৫০.০০ টাকা বছরের প্রথম ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হলো যা বছরের শেষ পর্যন্ত বার মাস ঘটলো। ২ মাস পরে ২০ টাকা আরও বিনিয়োগ করা হলো যা ১০ মাস ব্যবসায় ঘাটলো। এর ২ মাস পরে ৫০০.০০ টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হলো যা বছরের শেষ হওয়া পর্যন্ত এভাবে হিসাব করা হয় ২৫০.০০ টাকা ১২ মাস, ২০.০০ টাকা ১০ মাস, ৫০০.০০ টাকা ৮ মাস খাটানো হয়েছে।

| এজন্যে | টাকা | মাস | মোট |
|---|---|---|---|
| | ২৫০ X | ১২ | = ৩,০০০ |
| | ২০ X | ১০ | = ২০০ |
| | ৫০০ X | ৮ | = ৪,০০০ |
| | | | ৭,২০০/- |

সমস্ত বিনিয়োগকৃত মূলধনের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৭,২০০/= টাকা। একে ১২ দিয়ে

ভাগ করলে ৭,২০০/১২= ৬০০। এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ১৫/= যাকাত ধার্য হবে।

## পশুর নিসাব ও যাকাত আদায়ের নিয়ম

যাকাতের পশু অর্থে গৃহপালিত পশু যেমন, উট, গাভী, মোষ, বলদ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা প্রভৃতি। ঘোড়া খচ্চর ও গাধার প্রসঙ্গে মতভেদ আছে। কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ একে যাকাতের মাল হিসাবে গণ্য করেছেন আবার কেউ কেউ করেন নি। তদুপরি গৃহপলিত পশুর ওপর তখন যাকাত অবশ্য-দেয় হবে যখন এরা প্রাকৃতিক চারণ ক্ষেতে চরবে ও লালিত-পালিত হবে এবং ঘরে তাদের খাবার সরবরাহ করার প্রয়োজন হবে না।

## নিসাব

উটের যাকাতের নিসাব পাঁচ। কারও নিকট যদি ৫টি থেকে কম উট থাকে তাহলে এর ওপর যাকাত অবশ্য-দেয় হবে না।

প্রতি ৫ থেকে ৯টি উটের যাকাত ১টি ছাগল বা এর মূল্য। এর পর অতিরিক্ত প্রতি ৪০টি উটের জন্যে দু'বছর বয়সের ১টি উটনী এবং ৫০টি উটের জন্যে ৩ বছর বয়সের ১টি উটনী যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

## গাভী ও মোষের যাকাত

গাভী ও মোষ একই শ্রেণীভুক্ত। আর এতে বলদ ও পুরুষ মোষও অন্তর্ভুক্ত। অতএব এদের নিসাব ও যাকাতের পরিসীমা এর সম্মিলিত সংখ্যার ওপর নির্ণিত হয়। প্রত্যেক পশুর আলাদা আলাদা সংখ্যার ওপর নয়; তা কোন একটির সংখ্যা নিসাবের সংখ্যা থেকে কম হোক না কেন। এসব পশুর (গাভী ও মোষ) যদি সম্মিলিত সংখ্যা নিসাবের সমান সমান হয় তাহলে যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য। এরপর যেখানে 'গাভী' শব্দ ব্যবহৃত হবে এতে গাভী, বলদ, পুরুষ মোষ ও স্ত্রী মোষ প্রভৃতি সবই অন্তর্ভুক্ত হবে।

গাভীর নিসাব ৩০টি। ৩০টির কম পশুর জন্য যাকাত নেই। আর এসব জন্তর যাকাতের নিয়ম প্রতি ৩০টি পশুর জন্য এক বছর বয়সের ১টি গাভী আর প্রতি ৪০টি পশুর জন্যে ২ বছর বয়সের একটি গাভী প্রতি ৩০ থেকে ৩৯টি গাভী পর্যন্ত যাকাত হবে ১ বছর বয়সের ১টি গাভী বা এর সমমূল্য।

## ছাগল ভেড়ার যাকাত

ছাগল, ভেড়া বা এ জাতীয় পশু আর দুম্বা একই শ্রেণীতে গণ্য করা হয়। আর এদের নিসাব ও যাকাতের পরিসীমাও এদের সম্মিলিত সংখ্যার ওপর নির্ধারিত হবে। পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক পশুর ওপর হবে না। পরে যেখানে 'ছাগল' শব্দ ব্যবহৃত হবে এতে ছাগল, পাঠা, ভেড়া, ভেড়ী, দুম্বা, দুম্বী সব অন্তর্ভুক্ত হবে। ছাগলের নিসাব হলো ৪০টি। এর কম সংখ্যার জন্য যাকাত দিতে হবে না। প্রতি ৪০ থেকে ১২০ টি ছাগল পর্যন্ত যাকাত হবে ১টি ছাগল বা এর সমমূল্য। এর বেশি হলে প্রতি ১০০ ছাগলের জন্য একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। (ফিকাহ্‌ আহমদীয়া পৃষ্ঠা ৩৬২-৩৬৫)।

## বিভিন্ন মসলা-মাসায়েল
## বিভিন্ন নিসাব সম্বলিত সম্পদ

কারও কাছে যদি বিভিন্ন রকমের পৃথক পৃথক যাকাতের নিসাবসম্বলিত সম্পদ থাকে কিন্তু ওগুলোর কোনটাই স্বয়ং নিসাব পরিমাণ নয় বরং কম ; এমনকি সবগুলোর সম্মিলিত মূল্য হাজার টাকায় পৌঁছলেও যাকাত অবশ্য-দেয় হবে না। যেমন কারো নিকট ৪টি উট, ২৬টি গাভী, ৩৯টি ছাগল, ৫১ তোলা রূপা আছে এক্ষেত্রে কোনটির ওপরই যাকাত দেয়া হবে না আর সম্মিলিত মূল্যের ভিত্তিতেও যাকাত আদায় করা যাবে না। কেননা, এর মাঝে প্রত্যেক সম্পদের যাকাতের নিসাব আলাদা আলাদা আর তা এ সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত।

প্রশ্ন ঃ সোনা থাকলে এর যাকাত কীভাবে আদায় করা যায় অর্থাৎ এর নিসাব কী?

উত্তর ঃ সোনার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিতে রূপা হলো মাপকাঠি। অর্থাৎ কারো কাছে যদি ৫২.৫ তোলা রূপার সম মূল্যের সোনা থাকে তাহলে এর যাকাত আদায় করা আবশ্যক। তবে শর্ত এই যে, সোনা এমন অলংকার আকারে না হয় যা সাধারণত নিজে ব্যবহার করা হয় আর কখনও কখনও পরে চাইলে কাউকে ব্যবহার করতে দেয়া হয় আর কৃপণতা দেখানো হয় না।

প্রশ্ন ঃ বছরের প্রথমে নিসাব পরিমাণ ধন-সম্পদ ছিলো পরে বছরের মাঝামঝি সময়ে এতে প্রবৃদ্ধি ঘটলে এরকম আধিক্যের কারণে যাকাতের ব্যাপারে আদেশ কী?

উত্তর ঃ বছরের মাঝামাঝি যদি মূলধনে প্রবৃদ্ধি যেমন, ১০ পরিণত হয় ১৫ হাজারে তাহলে যাকাত ১৫ হাজারের ওপরে ধার্য হবে, এমনকি ৫,০০০/= টাকার ব্যাপারটি এমন হয় যে, বছর শেষ হওয়ার এক দু'দিন পূর্বে পাওয়া গেলেও। মোটকথা অতিরিক্ত আয় আগেই মূলধনের অধীন হবে আর এর জন্যে বছর শেষ হওয়ার কোন শর্ত প্রয়োজন হবে না।

প্রশ্ন ঃ সিকিউরিটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মেয়াদি আমানত (ফিক্সডডিপোজিট) যাকাত দেয়া থেকে রেয়ায়েতযোগ্য। কারেন্ট একাউন্টের কী আদেশ রয়েছে?

উত্তর ঃ ঋণ, মেয়াদী আমানত, সিকিউরিটি জমা প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের ওপর যাকাত ধার্য হবে না। তবে যে বছর এসব টাকা পাওয়া যাবে সে বছর এর যাকাত আদায় করতে হবে।

ইমাম মালেক নিজ কিতাব মুয়াত্তা-তে লিখেনঃ

"আমাদের (অর্থাৎ মদীনার আলেমদের) দৃষ্টিতে এ মসলা মুত্তাফাকুন আলায়হে অর্থাৎ সবার একমত যে, ঋণীর নিকট কয়েক বছর ধরে ঋণ রয়েছে এর ওপর যাকাত নেই। যে বছর এ ঋণ আদায় হবে কেবল সেই বছরের যাকাত আদায় করতে হবে (শরাহ্‌ মুয়াত্তা মালেক, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫)

ঋণের বেলায় যে নীতি, মেয়াদি আমানত, সিকিউরিটি জমা প্রভৃতির বেলায় তা-ই। ইমাম মালেক তাঁর চিন্তাধারার সমর্থনে হাদীসও উপস্থাপন করেছেন।

এছাড়াও যাকাত প্রদানের আর একটি উদ্দেশ্য এই ধন-সম্পদ মালিকের কুক্ষিগত হয়ে না থাকে। বরং মূলধনকে বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ে খাটায় বা অন্য কাউকে এথেকে উপকৃত হতে দেয় নতুবা যাকাত তার ধন-সম্পদকে শেষ করে দেবে। বাস্তবত ঋণ মেয়াদি আমানত প্রভৃতির ক্ষেত্রে এ উদ্দেশ্য পুরো হয়ে যায়। এজন্য এমন মূলধনের ওপর যাকাত ধার্য হয় না। তদুপরি এমতাস্থায় যদি যাকাত আবশ্যকীয় হয় তখন কিছু দিন পরে গোটা ঋণ, সব আমানত যাকাত দিতে দিতে শেষ হয়ে যাবে অথচ শরিয়তের উদ্দেশ্য তা নয়।

(পুনর্মুদ্রণ)

# রোযার মাসলা মাসায়েল-সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন এবং এর উত্তর

**মওলানা মুহাম্মদ আকরামুল ইসলাম,** মুরুব্বী সিলসিলাহ্

রোযা ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর একটি আর তা পালন করা আবশ্যিক কর্তব্য। রোযা সম্পর্কে ছোট ছোট কিছু প্রশ্নেরও অবতারণা হয়। যেমন- সেহ্‌রি ও ইফতারের সময় নির্দিষ্টকরণ, অসুস্থ্যতার ক্ষেত্রে, মুসাফির অবস্থায় করণীয় ইত্যাদি। অনুরূপভাবে আরো কিছু প্রশ্ন করা হয়ে থাকে আর সঠিকভাবে রোযা রাখার জন্য এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা একান্ত জরুরী।

এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে হাকাম ও আদল করে পাঠিয়েছেন। যার দায়িত্ব ছিল ইসলামী শিক্ষার উপর ভিত্তি করে ধর্মের বিবাদমান বিষয়গুলো সম্পর্কে ন্যায়-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত প্রদান করা এবং ধর্মীয় বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেয়া। এ অনুসারে আমরা দেখতে পাই তিনি তাঁর দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে গেছেন। ধর্মের যে অঙ্গনেই মতভেদ ও সমস্যা ছিল সেসব ক্ষেত্রেই তিনি ন্যায়-ভিত্তিক মীমাংসা এবং সমধান দিয়ে গেছেন, যা সমস্ত মতভেদ দূর করে যৌক্তিকভাবে ইসলামী শিক্ষাকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করেছে। অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুগে বিভিন্ন মাসলা মাসায়েলের সমাধান পেতে এবং জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আমাদের উচিত তাঁর মূল্যবান এসব মতামত শিরোধার্য করা।

যেমনটি আমি বলেছি রোযার দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন উঠানো হয়,তেমন কিছু প্রশ্নের উত্তর বা এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অবস্থান কী ছিল বা তিনি কী নির্দেশনা দিয়েছেন, তাঁর ফতওয়া কী ছিল, সে সম্পর্কে এখন আমি আলোচনা করব।

অতএব, প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে গুরুত্বপূর্ণ কিছু রোযা-সংক্রান্ত মাসলাহ মাসায়েলের সামধান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের কিছু ঘটনার আলোকে সম্মানিত পাঠকদের জন্য নিম্নে তুলে ধরছি।

এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যেকথাটি স্মরণ রাখতে হবে তা হল, ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি হল তাকওয়া। তাই তাকওয়া সমুন্নত রেখে রোযা-সংক্রান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই উক্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা অত্যন্ত জরুরী যে, "আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নিষ্ঠার সাথে রোযা রাখ।" (কিশতিয়ে নূহ, রুহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ১৫)

রোযা রাখার ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম যে বিষয়টি আসে সেটি হল কখন থেকে রোযা রাখার নির্দেশ। কেননা আমরা আমাদের সমাজে এমন কিছু লোককে দেখতে পাই যারা বলে সৌদি আরবে যেদিন রোযা রাখবে সেদিন থেকেই রোযা রাখতে হবে এবং সৌদি আরবে যেদিন ঈদ করবে সেদিনই ঈদ করতে হবে। তাদের এ কথা অনুযায়ী তারা সাধারণত আমাদের একদিন পূর্বেই রোযা রাখে এবং ঈদও করে। এমন পরিস্থিতিতে ইসলামের শিক্ষা কী তা আমাদের জানা উচিত। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তাই সরল এবং সাধারণ মানুষের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা হল, তারা যেন জ্যোতির্বিদদের মুখাপেক্ষী না থাকে আর কোন তারিখে চাঁদ উদিত হয় তা নিশ্চিৎ হওয়ার জন্য চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে। এতটুকু জ্ঞান থাকা আবশ্যক যে, দিনের সংখ্যা যেন ত্রিশের অধিক না হয়। এটিও স্মরণ রাখা উচিত, যুক্তিগত দিক থেকেই জ্যোতির্বিদদের হিসাবের উপর চাঁদ দেখার বিষয়টির প্রাধান্য রয়েছে। ইউরোপের দার্শনিকেরাও চাঁদ দেখাকে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করার সুবাদে দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগাতে বিভিন্ন প্রকার অনুবীক্ষণ এবং দুর্বীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছে।" (সুরমায়ে চশমায়ে আড়িয়া, রুহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২-১৯৩)

মোট কথা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হল চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখেই ঈদ কর। মহানবী (সা.)-এর হাদীসেও আমরা এ কথাই দেখতে পাই যে, 'চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর।' (তিরমীযি, কিতাবুস সওম, হাদীস নং-৬৮৮)

এ ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা সৃষ্টি হয় আর

তা হল চাঁদ একদিন পূর্বে উদিত হয় এবং কোন কারণে দেখা না যায় আর পরে বুঝা যায় যে, চাঁদ একদিন পূর্বেই উদিত হয়েছে, এমন অবস্থায় কোন্ নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত? কেননা এমন হলে একটি রোযা তো বাদ পড়ে যাবে।এ ক্ষেত্রে কী করতে হবে? এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। শিয়ালকোট থেকে এক বন্ধু এরূপ পরিস্থিতির উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে লিখেন যে, এখানে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায় নি বরং বুধবারে দেখা গেছে অথচ বুধবারে রমযান আরম্ভ হয়ে গেছে। অত্র অঞ্চলে মোটের উপর এটিই হয়েছে আর এ কারণে বৃহস্পতিবারে প্রথম রোযা রাখা হয়। এখন কী করা উচিত? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এর জন্য রমযানের পর একটি রোযা রাখতে হবে। (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৭, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

অনুরূপভাবে, সেহ্‌রি খাওয়ার বিষয়টি রয়েছে। সেহ্‌রির সময় নিয়ে অনেক কথা রয়েছে যার প্রকৃত সমাধান সবারই জানা থাকা জরুরী।

এ-সংক্রান্ত একটি ঘটনার কথা হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেন, কপুরথলার মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, আমি কাদিয়ানে মসজিদে মুবারকের সাথে সন্নিবেশিত কক্ষে অবস্থান করতাম। একবার আমি সেহ্‌রি খাচ্ছিলাম তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসেন। তিনি আমাকে সেহ্‌রি খেতে দেখে বলেন, আপনি কি সেহ্‌রির সময় ডাল-রুটিই খান? আর তখনই তিনি ব্যবস্থাপককে ডেকে বলেন, সেহ্‌রির সময় কি বন্ধুদের এমন খাবারই দেয়া হয়? আমাদের যত বন্ধু আছে তারা সফরে নয়, তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করুন, তাদের কী ধরণের খাবার খাওয়ার অভ্যাস আছে? সেহ্‌রির সময় তারা যা খেতে পছন্দ করে সেই খাবারই যেন তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়। এরপর ব্যবস্থাপক আমার জন্য আরো খাবার নিয়ে আসেন কিন্তু আমি পূর্বেই খাবার শেষ করেছিলাম আর আযানও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হুযূর বলেন, খাও সময়ের পূর্বেই আযান দেয়া হয়েছে, এই ব্যাপারে চিন্তা করো না।" (সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৪র্থ অংশ, পৃ. ১২৭, রেওয়ায়েত নং ১১৬৩)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তাহাজ্জুদ পড়া এবং সেহ্‌রি খাওয়া সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, ডাক্তার মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, ১৮৯৫ সনে পুরো রমযান মাস আমার কাদিয়ানে কাটানোর সৌভাগ্য হয়। আমি পুরো মাস হযরত সাহেবের পেছনে তাহাজ্জুদ অর্থাৎ তারাবী পড়েছি। তাঁর রীতি ছিল তিনি রাতের প্রথম ভাগে বেতের পড়ে নিতেন আর রাতের শেষ প্রহরে পর্যায়ক্রমে দুই দুই রাকাত করে আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন। আর এই নামাযে তিনি সবসময় প্রথম রাকাতে আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করতেন অর্থাৎ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ থেকে (সূরা আল বাকারা: ২৫৬) পর্যন্ত পড়তেন আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। এছাড়া রুকু এবং সিজদায় **'ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম বিরাহমাতিকা আসতাগীস'** প্রায়শ পড়তেন আর এমন স্বরে পড়তেন যে, তাঁর আওয়াজ শোনা যেত। এছাড়া সবসময়ই তিনি তাহাজ্জুদের পর সেহ্‌রি খেতেন। আর সেহ্‌রি খাওয়ার ক্ষেত্রে এত বিলম্ব করতেন যে, অনেক সময় খেতে খেতে আযান হয়ে যেত। অনেক সময় আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি খাবার খাওয়া অব্যাহত রাখতেন। এই অধম (অর্থাৎ মিয়া সাহেব) নিবেদন করছে যে, সত্যিকার অর্থে যতক্ষণ সুবহে সাদিক পূর্ব দিগন্তে দেখা না যায় ততক্ষণ তো সেহ্‌রি খাওয়া বৈধ। আযানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা ফজরের আযানের সময়ও সুবহে সাদিকের সাপেক্ষেই নির্ধারিত হয়, তাই বিভিন্ন স্থানের মানুষ সচরাচর আযানকে সেহ্‌রির শেষ সীমা মনে করে। কাদিয়ানে যেহেতু সুবহে সাদিক প্রস্ফূটিত হতেই ফজরের আযান হয়ে যায় বরং হতে পারে অনেক সময় ভুলবশত বা অসাবধানতাবশত এর পূর্বেও হয়ে যায়, তাই এমন সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আযানের প্রতি কর্ণপাত করতেন না বরং সুবহে সাদিক স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত সেহ্‌রি খেতেন। সত্যিকার অর্থে এ প্রসঙ্গে শরীয়তের উদ্দেশ্য এটি নয় যে, জ্ঞানগত বা হিসাবের দৃষ্টিকোণ থেকে যখন সুবহে সাদিকের উন্মেষ ঘটে তখনই খাবার ছেড়ে দেয়া উচিত। বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য হল, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে যখন সুবহে সাদিকের শুভ্রতা প্রকাশ পায় তখন খাবার ছেড়ে দেয়া উচিত। কেননা 'তাবায়্যান' শব্দ এদিকেই ইঙ্গিত করছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, বেলালের আযান শুনে সেহ্‌রি খাওয়া বন্ধ করবে না বরং ইবনে মাক্‌তূম-এর আযান পর্যন্ত পানাহার অব্যাহত রাখ। ইবনে মাক্‌তূম যেহেতু অন্ধ ছিলেন তাই সকাল হয়ে গেছে বলে হইচই আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।" (সীরতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, সংখ্যা ২ ২য় অংশ, রেওয়ায়েত নং ৩২০, পৃ. ২৯৫-২৯৬)

এ-সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা– হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ডাক্তার খলীফা রশীদ উদ্দিন মরহুম সাহেবের স্ত্রী কাদিয়ানের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র বরাতে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, ১৯০৩ সনের কথা, আমি এবং মরহুম ডাক্তার সাহেব রুঢ়কী থেকে এখানে আসি, চারদিন ছুটি ছিল। হুযূর জিজ্ঞেস করেন, সফরে রোযা রাখেননি তো? আমরা বললাম, না। হুযূর আমাদের থাকার জন্য গোলাপি কক্ষ বরাদ্দ করেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, আমরা রোযা রাখব। তিনি (আ.) বলেন, ভালো কথা। এরপর বলেন, আপনারা সফরে আছেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, কয়েকদিন এখানে অবস্থান করব, তাই রোযা রাখার ইচ্ছা হচ্ছে। তিনি (আ.) বলেন, ঠিক আছে,আমরা আপনাদেরকে কাশ্মীরি পরোটা খাওয়াব। আমরা ভাবছিলাম, আল্লাহ্‌ই জানে, কাশ্মীরি পরোটা না জানি কেমন হয়। যখন সেহ্‌রির সময় হয় আর আমরা তাহাজ্জুদ ও নফল শেষ করি, এরপর খাবার আসে তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং সেই গোলাপি কক্ষে আসেন (যা নিচের তলায় অবস্থিত ছিল)। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব উপরের তিন তলায় থাকতেন। তার বড় স্ত্রী করীম বিবি সাহেবা যাকে মৌলভীয়ানী বলা হত, তিনি কাশ্মীরি ছিলেন। তিনি ভালো পরোটা বানাতে পারতেন। হুযূর আমাদের জন্য তার হাতে

পরোটা বানিয়েছিলেন। উপর থেকে গরম গরম পরোটা আসতো আর হুযূর (আ.) নিজেতা নিয়ে আমাদের সামনে রাখতেন এবং বলতেন, ভালো করে পেট ভরে খাও। আমার লজ্জা হচ্ছিল, ডাক্তার সাহেবও লজ্জিত ছিলেন কিন্তু আমাদের উপর হুযূরের স্নেহ এবং বদান্যতার যে প্রভাব ছিল তার ফলে আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আনন্দের শিহরণ অনুভূত হচ্ছিল। ততক্ষণে আযান হয়ে যায়। হুযূর (আ.) আমাদের বলেন, আরো খাও, এখনো অনেক সময় আছে। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

(সূরা আল্ বাকারা: ১৮৮) মানুষ এটি মেনে চলে না। খাও, এখনো অনেক সময় আছে। মুয়ায্যিন সময় হওয়ার পূর্বেই আযান দিয়ে দিয়েছে। আমরা যতক্ষণ খাচ্ছিলাম হুযূর দাঁড়িয়ে ছিলেন বা পায়চারি করছিলেন। যদিও ডাক্তার সাহেব বলেন, হুযূর! বসুন, আমি পরিচারিকাকে দিয়ে পরোটা আনিয়ে নিব বা আমার স্ত্রী নিয়ে আসবে, কিন্তু হুযূর সেকথা মানেন নি বরং আমাদের অতিথি সেবায় নিয়োজিত থাকেন। এই খাবারে তরকারীও ছিল আর দুধ এবং সেমাই ইত্যাদিও ছিল। (সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৫ম অংশ, পৃ. ২০২-২০৩, রেওয়ায়েত নং ১৩২০)

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আরেকটি গুরুত্ব এবং অধিকাংশ মানুষের প্রশ্ন হল সফরও অসুস্থতার সময়কি রোযা রাখা বৈধ? এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, "আমার ভালোভাবে মনে পড়ে, খুব সম্ভব মির্যা ইয়াকূব বেগ সাহেব, যিনি আজকাল লাহোরী জামা'তের একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য। একবার তিনি বাহির থেকে এখানে আসেন, আসরের সময় ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে জোর দিয়ে বলেন, রোযা ভেঙ্গে ফেল।আরো বলেন, সফরে রোযা রাখা বৈধ নয়। একইভাবে একবার অসুস্থতার প্রশ্ন আসলে তিনি বলেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, ধর্ম যে ছাড় দিয়েছে সেগুলো গ্রহণ করা উচিত। ধর্ম কাঠিন্য নয় বরং স্বাচ্ছন্দ্য শিখায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, কেউ কেউ বলে, মুসাফির ও অসুস্থরা যদি রোযা রাখতে পারে তাহলে রাখা উচিত, আমরা একে সঠিক মনে করি না। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবীর উক্তি শুনিয়েছেন যে, সফর এবং অসুস্থতায় রোযা রাখা তিনি বৈধ মনে করতেন না আর তার দৃষ্টিতে এমন অবস্থায় রোযা রাখলেও,পরে তা আবার রাখা আবশ্যক। এটি শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হ্যাঁ, আমাদেরও একই বিশ্বাস।" (খুতবাতে মাহমুদ, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ৩৭)

আরেকটি ঘটনা রয়েছে, এ থেকে দুটি বিষয় পরিষ্কার হয়। একটি হল সফরে রোযা রাখা এবং আরেকটি কাদিয়ানে রোযা রাখা। একবার বক্তৃতা করার সময় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে আর তা হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রোযা সম্পর্কে এই ফতওয়া দিয়েছেন যে, "রোগী এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে নির্দেশ লঙ্ঘনের ফতওয়া বর্তাবে।" অথচ আল ফযলে আপনার পক্ষ থেকে এই ঘোষণা ছাপা হয়েছে যে, আহমদী বন্ধুরা যারা সালানা জলসায় আসবেন, তারা এখানে এসে রোযা রাখতে পারবেন কিন্তু যারা রোযা রাখবে না এবং পরে রাখবে তাদের বিরুদ্ধেও কোন আপত্তি বর্তাবে না।

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "প্রথমত আমি একথা বলতে চাই যে, আমার কোন ফতওয়া আল ফযলে ছাপেনি। হ্যাঁ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন রেওয়ায়েতের বরাতে একটি ফতওয়া ছেপেছে। আসল কথা হল, খিলাফতের প্রথম দিকে আমি সফরে রোযা রাখতে বারণ করতাম, কেননা আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছি, তিনি মুসাফিরকে রোযা রাখার অনুমতি দিতেন না। একবার আমি দেখেছি, মির্যা আইয়ূব বেগ সাহেব রমযানে এখানে (কাদিয়ানে) আসেন, তিনি রোযা রেখেছিলেন। আসরের সময় তিনি যখন পৌঁছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেন, রোযা ভেঙ্গে ফেলুন, সফরে রোযা রাখা অবৈধ। এটি নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক এবং কথা হয়, যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) চিন্তা করেন, কোথাও আবার কেউ হোঁচট না খায়, তাই তিনি ইবনে আরাবীর উক্তি উপস্থাপন করে বলেন, তিনিও একই কথা বলেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার উপর এই ঘটনার যে প্রভাব ছিল সেই কারণে আমি সফরে রোযা রাখতে বারণ করতাম। ঘটনাক্রমে একবার মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব এখানে রমযান মাস কাটানোর জন্য আসেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি যারা বাহির থেকে আসেন আপনি তাদেরকে রোযা রাখতে বারণ করেন। কিন্তু আমার রেওয়ায়েত হল, এখানে এক ব্যক্তি আসেন, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, আমি এখানে অবস্থান করব, তাই এখন কি আমি রোযা রাখব নাকি রাখব না?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হ্যাঁ আপনি রোযা রাখতে পারেন, কেননা কাদিয়ান আহমদীদের জন্য দ্বিতীয় জন্মভূমির মর্যাদা রাখে। যদিও মরহুম মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খুব কাছের সাহাবী ছিলেন, নৈকট্য প্রাপ্ত ছিলেন, তথাপি আমি শুধু তাঁর রেওয়ায়েতই গ্রহণ করিনি, এ সম্পর্কে মানুষের সাক্ষ্যও গ্রহণ করেছি আর জানা গেছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কাদিয়ানে অবস্থানকালে রোযা রাখার অনুমতি দিতেন, অবশ্য আসা এবং যাওয়ার দিন অনুমতি দিতেন না, সেকারণে আমার প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হয়েছে। এবার রমযানে যখন বার্ষিক জলসা ঘনিয়ে আসছিল আর প্রশ্ন উঠানো হয় যে, তাদের রোযা রাখা উচিত কিনা তখন এক ব্যক্তি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে রমযানে যখন জলসা হত আমরা স্বয়ং অতিথিদের সেহ্‌রি খাইয়েছি। এই প্রেক্ষিতে আমি যে, এখানে জলসায় আগমনকারীদের রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছি, তা-ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরই একটি ফতওয়া। পূর্বের আলেমগণ সফরে রোযা রাখা বৈধ আখ্যা দিয়ে দিত আর অ-আহমদী মৌলভীরা তো বর্তমান সময়ের সফরকে সফর বলেই গণ্য করে না। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সফরে রোযা রাখতে বারণ করেছেন, আবার তিনি নিজেই এ

কথা বলেন, কাদিয়ানে এসে রোযা রাখা বৈধ। এখন তাঁর একটি ফতওয়া আমরা গ্রহণ করব আর অপরটি প্রত্যাখ্যান করব, এমনটি হওয়া উচিত নয়। এভাবে সেই কথাই প্রযোজ্য হবে যা এক পাঠান সম্পর্কে প্রসিদ্ধ রয়েছে। পাঠানরা ফিকাহ্ শাস্ত্রকে কঠোরভাবে মেনে চলে। এক পাঠান ছাত্র ছিল। সেপড়েছে যে, নামাযে"হরকতে কবীরা' বা খুব বেশি নড়াচড়া (যেমন নামায ছেড়ে দরজা খুলে দেয়া ইত্যাদি) করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। মহানবী (সা.) সম্পর্কে হাদিসে সে পড়ল যে, তিনি একবার নামাযে নড়াচড়া করেছেন তখন সে বলল, ও-হো, মুহাম্মদ (সা.)-এর তো তাহলে নামায নষ্ট হয়ে গেছে। কেননা কদূরী-তে লেখা আছে, 'হরকতে কবীরা'বা খুব বেশি নড়াচড়া করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়।অতএব, যিনি এই ফতওয়া দিয়েছেন যে, সফরে রোযা রাখা উচিত নয়, তিনি আবার একথাও বলেছেন, কাদিয়ান আহমদীদের জন্য দ্বিতীয় মাতৃভূমি আর এখানে রোযা রাখা বৈধ। তাই এখানে রোযা রাখা তাঁর প্রদত্ত ফতওয়া অনুসারেই সঠিক, যদিও এর আরো কারণাদি রয়েছে।" (আল ফযল, ৪ জানুয়ারি, ১৯৩৪, পৃ. ৩-৪, ২১তম খণ্ড, সংখ্যা ৮০)

কোন একস্থানে অবস্থান কালে রোযা রাখা সম্পর্কে হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ সরওয়ার শাহ্ সাহেব লিখেন, রোযা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তিকে এক জায়গায় তিন দিনের অধিককাল পর্যন্ত অবস্থান করতে হয় তাহলে তার রোযা রাখা উচিত। তিন দিনের কম যদি থাকতে হয় তাহলে রোযা রাখা উচিত নয়। আর কাদিয়ানে যদি স্বল্পকাল অবস্থান সত্ত্বেও কেউ রোযা রাখে তাহলে পরে আর রোযা রাখার প্রয়োজন নেই। (ফতওয়ায়ে হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ সারওয়ার শাহ্ সাহেব, রিজিষ্ট্রার নং ৫, দারুল ইফতাহ্, রাবওয়া, ফিকাহ আল মাসীহ্, পৃ. ২০৮, বাব রোযা অর রমাযান)

যেহেতু কাদিয়ান আহমদীদের দ্বিতীয় মাতৃভূমি, তাই এখানে তিন দিনের চেয়ে কম সময় অবস্থান হলেও রোযা রাখতে পারে, কিন্তু অন্য স্থানে তিন দিন অবস্থান করলে রোযা রাখতে পারবে।

মুসাফির ও রুগ্নদের রোযা না রাখা-সংক্রান্ত একটি ঘটনা রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটি জানতে পারেন যে, লাহোর থেকে শেখ মুহাম্মদ চট্টু সাহেব নামে এক ব্যক্তি এসেছেন আর অন্য মানুষও এসেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিনে বাহিরে আসেন, উদ্দেশ্য ছিল তিনি ভ্রমণের জন্য বাহিরে যাবেন আর বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতেরও উপলক্ষ সৃষ্টি হবে, যারা বাহির থেকে এসেছেন তাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে। অন্যরাও জানতে পারে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাহিরে আসবেন। তাই অনেকেই ছোট মসজিদে (অর্থাৎ মসজিদে মুবারকে) সমবেত হন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দরজার বাহিরে আসেন রীতি অনুসারে খোদ্দামরা পতঙ্গের মত তাঁর দিকে ছুটে যায়, তিনি শেখ সাহেবের দিকে তাকিয়ে সালামের পর বলেন, আপনি কেমন আছেন? তিনি পুরোনো জানাশোনা মানুষ ছিলেন বয়োবৃদ্ধ চট্টু সাহেব বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাকীম মুহাম্মদ হোসাঈন কোরেশী সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন, তার যেন কোন কষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করা আপনার দায়িত্ব, তার থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করুন। যে জিনিসেরই প্রয়োজন হয় আমাকে জানান আর মিয়াঁ নাজমুউদ্দিন সাহেবকে তাগাদা দিন যে, তার খাবারের জন্য যা যথাযথ এবং যা তিনি খেতে পছন্দ করেন তা যেন প্রস্তুত করেন। হাকীম সাহেব বলেন, জি ঠিক আছে। ইনশাআল্লাহ্, কোন কষ্ট হবে না। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অতিথিকে সম্বোধন করে বলেন, আপনি নিশ্চয় রোযা রাখেন নি। সেই ব্যক্তি বলেন, আমি রোযা রেখেছি। তিনি আহমদী ছিলেন না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কুরআন যেসব ছাড় দিয়েছে সেগুলো অনুসরণ করাও তাকওয়া। আল্লাহ্ তা'লা মুসাফির এবং রুগ্নদের অন্য সময় রোযা রাখার অনুমতি এবং ছাড় দিয়েছেন, তাই এই নির্দেশও মেনে চলা উচিত। তিনি বলেন, আমি পড়েছি অধিকাংশ জ্যেষ্ঠ বা উম্মতের বুযূর্গদের মতামত হল, যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় এবং সফরে রোযা রাখে সে পাপ করে। কেননা আসল বিষয় হল, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, নিজের ইচ্ছায় নয় বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তাঁর আনুগত্যের মাঝে নিহিত। অর্থাৎ তিনি যে নির্দেশ দেন তার আনুগত্য করা উচিত আর নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন কথা যোগ করা উচিত নয়। তিনি এই নির্দেশই দিয়েছেন যে,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

(সূরা আল্ বাকারা: ১৮৫) এতে অন্য কোন শর্ত রাখেন নি যে, এমন সফর হতে হবে আর এ ধরণের অসুস্থতা হতে হবে। আমি সফরে রোযা রাখি না অনুরূপভাবে, অসুস্থ অবস্থায়ও রোযা রাখি না। আজও আমার স্বাস্থ্য ভালো না, তাই আমি রোযা রাখি নি। হাঁটাচলা করলে রোগের প্রকোপ কিছুটা কমে যায়, তাই আমি বাহিরে যাব। (অতিথিকে তিনি জিজ্ঞেস করেন,) আপনিও যাবেন নাকি?বয়োবৃদ্ধ চট্টু সাহেব বলেন, না আমি যেতে পারব না, আপনি ঘুরে আসুন। পবিত্র কুরআনে নিঃসন্দেহেএই নির্দেশ রয়েছে কিন্তু সফরে যদি কোন কষ্ট না হয় তাহলে রোযা কেন রাখা হবে না? হুযূর বলেন, এটি আপনার মতামত, কুরআন শরীফে কষ্ট হওয়া বা কষ্ট না হওয়ার কথা আদৌ উল্লেখ করা হয় নি। আপনি খুবই বয়োবৃদ্ধ এক ব্যক্তি। জীবনের কোন ভরসা নেই, মানুষের সেই পথই অনুসরণ করা উচিত, যাতে খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হন এবং সিরাতে মুস্তাকীম পাওয়া যায়। তখন বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোক বলেন, আমি তো এ জন্যই এসেছি যেন আপনার কাছে অবস্থান করে কিছুটা উপকৃত হতে পারি। এই পথই যদি সত্য হয় তাহলে কোথাও এমন যেন না হয় যে, আমরা ঔদাসিন্যের মাঝে থেকেই মারা যাই। হুযূর (আ.) বলেন, এটি খুবই ভালো কথা। এরপর তিনি বলেন, আমি কিছুটা ঘুরে আসি, আপনি বিশ্রাম করুন।" (আল হাকাম, ৩১ জানুয়ারি ১৯০৭, পৃ. ১৪, ১১তম খণ্ড, সংখ্যা ৪)

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে রুগ্ন এবং মুসাফিরের রোযা রাখার প্রসঙ্গে কথা উঠে। হযরত মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেব পূর্বের কথাই শুনিয়েছেন যে, শেখ ইবনে আরাবীর উক্তি রয়েছে, রুগ্ন এবং মুসাফির রোযার সময় রোযা রাখলেও

আরোগ্য লাভের পর অর্থাৎ রমযানের পর তার জন্য পুনরায় রোযা রাখা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

(সূরা আল্ বাকারা: ১৮৫) অর্থাৎ তোমাদের মাঝে যারা অসুস্থ বা সফরে থাকে তারা রমযান মাসের দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর রোযা রাখবে। এখানে আল্লাহ্ তা'লা একথা বলেন নি যে, রুগ্ন ব্যক্তি বা মুসাফির যদি হঠকারিতা প্রদর্শন করে বা নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করে এই দিনগুলিতে রোযা রাখে তাহলে পরবর্তীতে আর রোযা রাখার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'লার স্পষ্ট নির্দেশ হল, তাকে পরেও রোযা রাখতে হবে।পরবর্তীতে রোযা রাখা তার জন্য আবশ্যক। সে যদি রোযা রাখে এটি তার জন্য অতিরিক্ত একটি বিষয়, এটি তার নিজেরই সিদ্ধান্ত, এর ফলে পরে রোযা রাখা সম্পর্কে খোদার যে নির্দেশ রয়েছে সেটি টলতে পারে না। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি সফর এবং অসুস্থ অবস্থায় রমযান মাসে রোযা রাখে, সে আল্লাহ্‌র স্পষ্ট নির্দেশের অবাধ্যতা করে। আল্লাহ্‌র পরিস্কার নির্দেশ হল, রুগ্ন এবং মুসাফির যেন রোযা না রাখে। সুস্থ হওয়ার পর আর সফর সমাপ্তির পর সে রোযা রাখবে। আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ মেনে চলা উচিত, কেননা পরিত্রাণ লাভ হয় খোদার অনুগ্রহে, কর্মবলে কেউ মুক্তি পেতে পারে না। রোযার মাধ্যমে কেউ মুক্তি লাভ করতে পারবে না। খোদা তা'লা এই কথা বলেন নি যে, রোগ সামান্য না বেশি, সফর সংক্ষিপ্ত নাকি দীর্ঘ, বরং এটি সর্বজনীন একটি নির্দেশ, এটি মেনে চলা উচিত। রুগী এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তারা নির্দেশ লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী হবে।" (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৩০-৪৩১, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, মিয়া আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেবের পুত্র মিয়া রহমতুল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, একবার হুযূর (আ.) লুধিয়ানায় আসেন। পবিত্র রমযান মাস ছিল, আমরা সবাই গওসগড় থেকে রোযা রেখে লুধিয়ানা যাই, হুযূর আমার পিতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন বা অন্য কারো কাছ থেকে জানতে পারেন, (যা এখন আমার মনে নেই,) গওসগড় থেকে যারা এসেছেন তারা সবাই রোযাদার। হুযূর (আ.) বলেন, মিয়া আব্দুল্লাহ্! যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, একইভাবে সফরে রোযা না রাখারও নির্দেশ দিয়েছেন। আপনারা সবাই রোযা ভেঙ্গে ফেলুন। এটি যোহরের পরের কথা।" এরপর সবার রোযা খুলে দেয়া হয়েছে। (সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৪র্থ অংশ, পৃ. ১২৫, রেওয়ায়েত নম্বর ১১৫৯)

আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব নিজেই লিখেন, মিয়া আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব বর্ণনা করেন, "প্রথম যুগের কথা, একবার রমযান মাসে এখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে কোন অতিথি আসেন। তিনি রোযা রেখেছিলেন, দিনের বেশির ভাগ সময় কেটে গিয়েছিল, খুব সম্ভব এটি আসরের পরের কথা। হুযূর তাকে বলেন, আপনি রোযা ভেঙ্গে ফেলুন। সেই ব্যক্তি বলেন, এখন তো সামান্য সময় অবশিষ্ট আছে, রোযা ভেঙ্গে কি লাভ? হুযূর বলেন, আপনি কি বাহুবলে খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চান? খোদা তা'লাকে বাহুবলে সন্তুষ্ট করা যায় না বরং তাঁকে আনুগত্যের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা যায়। যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মুসাফির রোযা রাখবে না, সেখানে রোযা রাখা উচিত নয়। তখন সেই অতিথি রোযা ভেঙ্গে ফেলেন।" (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃ. ৯৭, রেওয়ায়েত নম্বর-১১৭)

একইভাবে, কপুরথলা নিবাসী হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব বলেন, একবার আমি এবং হযরত মুন্সী আরোড়া খান সাহেব এবং লুধিয়ানা নিবাসী হযরত খান সাহেব মুহাম্মদ খান সাহেব হুযূরের সকাশে উপস্থিত হই। রমযান মাস ছিল, আমি রোযা রেখেছিলাম আর আমার সাথীরা রোযা রাখেন নি। আমরা যখন হুযূরের কাছে উপস্থিত হই তখন সূর্যাস্তের কিছু সময় বাকি ছিল মাত্র। আমার সাথীরা হুযূরকে বলেন, জাফর আহমদ রোযা রেখেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাৎক্ষণিকভাবে ভেতরে যান এবং এক গ্লাস শরবত নিয়ে আসেন আর বলেন, রোযা ভেঙ্গে ফেল, সফরে রোযা রাখা উচিত নয়, আমি নির্দেশ মান্য করি। আর সেখানে অবস্থানের সুবাদে এরপর রোযা রাখতে আরম্ভ করি। একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইফতারের সময় একটি থালা বা ট্রেতে করে বড়বড় তিনটি শরবতের গ্লাস নিয়ে আসেন। আমরা রোযা খুলতে যাচ্ছিলাম, আমি বললাম, হুযূর! মুন্সিজী আরোড়া খান সাহেবের এক গ্লাসে কিছু হয় না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুচকি হাসেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে ঘরের ভেতরে গিয়ে একটি বড় জগ ভর্তি করে শরবত নিয়ে আসেন আর মুন্সিজীকে পান করান। মুন্সিজী মনে করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে শরবত পান করছি, তাই তিনি পান করতে থাকেন এবং পুরো জগ পান করে ফেলেন। [আসহাবে আহমদ (আ.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৪, নব সংস্করণ, রেওয়ায়েত হযরত মুন্সি জাফর আহমদ সাহেব (রা.)]

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, পেনশনার মওলা বক্স সাহেব মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব মুবাশ্বেরের বরাতে লিখে পাঠিয়েছেন যে, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রমযান মাসে অমৃতসর আসেন, সেখানে মুন্ডুয়া বাবুঘনিয়া লাল(যার বর্তমান নাম 'বন্দে মাতরম পাল') নামক স্থানে তাঁর বক্তৃতা ছিল। সফরের কারণে হুযূর রোযা রাখেন নি।

বক্তৃতা চলাকালে মুফতি ফজলুর রহমান সাহেব হুযূরকে চায়ের পেয়ালা দেন, হুযূর এদিকে দৃষ্টি দেন নি, তিনি আরো কিছুটা এগিয়ে আসেন, তখন হুযূর বক্তৃতায় ব্যস্ত ছিলেন, এরপর মুফতি সাহেব পেয়ালা তাঁর আরো কাছে নিয়ে আসেন, হুযূর তা থেকে এক চুমুক পান করেন। তখন মানুষ হইচই আরম্ভ করে যে, এই হল রমযান মাসের সম্মান, ইনি রোযা রাখেন না। তারা অশালীন কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করে এবং বক্তৃতা বন্ধ হয়ে যায়। হুযূর পর্দার অড়ালে চলে যান। গাড়ী অপর দিক থেকে দরজার সামনে আনা হয়, হুযূর এতে প্রবেশ করেন, মানুষ ইট, পাথর ইত্যাদি ছুঁড়তে আরম্ভ করে এবং অনেক হট্টগোল করে। গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে যায় কিন্তু হুযূর নিরাপদে তাঁর আবাসস্থলে পৌঁছে যান। পরে শোনা গেছে যে, একজন অ-আহমদী মৌলভী এসব কিছু সত্ত্বেও বলত, আজকে মানুষ মির্যাকে নবী

বানিয়ে দিয়েছে। আমি স্বয়ং তাঁর মুখে একথা শুনিনি। এরপর হযরত মৌলভী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের সাথে আমরা বাহিরে যাই। আমি তাঁকে বললাম, মানুষ ইট পাথর ছুড়ছে, হট্টগোল হচ্ছে, কিছুক্ষণ পর বের হন, তখন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, 'যাকে পাথর মারত তিনি চলে গেছেন, আমাকে কে পাথর মারবে!' যেহেতু মুফতি ফজলুর রহমান সাহেবের চা পরিবেশনের কারণে এই গন্ডগোল, তাই সবাই তাকে বলতে আরম্ভ করে, তুমি কেন এমনটি করলে? সব আহমদী তাকে দোষারোপ করতে থাকে।আমিও তাকে এমনটিই বললাম, তিনি পরে বিরক্ত হয়ে যান। পরে মরহুম মিয়াঁ আব্দুল খালেক সাহেব আহমদী আমাকে বলেন, এই বিষয়টি যখন হুযূরের সামনে উপস্থাপন করা হয় যে, মুফতি সাহেব অনর্থক বক্তৃতা নষ্ট করেছেন তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মুফতি সাহেব কোন অপছন্দনীয় কাজ করেন নি। এটি আল্লাহ্ তা'লার একটি নির্দেশ যে, সফরে রোযা রাখবে না, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই কাজের মাধ্যমে এই নির্দেশ প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। এই উত্তর শুনে মুফতি সাহেবের সাহস আরো বেড়ে যায়।" (সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৪র্থ অংশ, পৃ. ১৪৭, রেওয়ায়েত নম্বর-১২০২)

অসুস্থ হলে রোযা ভেঙ্গে ফেলা সম্পর্কে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, ডাক্তার মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বর্ণনা করেন, একবার লুধিয়ানায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রোযা রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর রক্তচাপ কমে যায় এবং হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যেতে থাকে। তখন সূর্য ডুবার উপক্রম ছিল, কিন্তু তিনি তাৎক্ষণিকভাবে রোযা ভেঙ্গে ফেলেন। তিনি সব সময় শরীয়তের সহজ পন্থাকে প্রাধান্য দিতেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, এই অধম বর্ণনা করছে যে, হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.) সম্পর্কেও এমনটিই দেখা যায় আর তা হল তিনি সব সময় দুটি বৈধ পথের মাঝে সহজ পথকে বেছে নিতেন।" (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ৩য় অংশ, পৃ. ৬৩৭, রেওয়ায়েত নম্বর-৬৯৭)

একবার প্রশ্ন করা হয় যে, অনেক সময় রমযান মাস এমন মৌসুমে আসে যখন কৃষকদের কাজ অনেক বেশি থাকে, যেমন ফসল রোপন বা কাটার মৌসুম। এমন অবস্থায় যারা শ্রমজীবী তাদের জন্য রোযা রাখা সম্ভব হয় না, এ সম্পর্কে কী শিক্ষা? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'আল আ'মালু বিন্ নিয়্যত' এরা নিজেদের অবস্থা গোপন রাখে। তাকওয়া এবং পবিত্রতার নিরিখে নিজের অবস্থা মানুষ যাচাই করতে পারে। কেউ যদি মজদুরী করা সত্ত্বেও রোযা রাখতে পারে তাহলে তার রাখা উচিত নতুবা সে রুগীদের মাঝে গণ্য হবে, এরপর সুযোগ হলেরাখবে। সেখানে মজদুরীর কারণে তারা পরে রোযা রাখতে পারে। আর

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ

(সূরা আল্ বাকারা:১৮৫) সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হল যারা অপারগ।" (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৪, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

রমযানে যারা রোযা রাখতে পারে না এবং ফিদিয়া দেয় তাদের সম্পর্কে নির্দেশনা কী? এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "একবার আমার হৃদয়ে প্রশ্নোদয় হল, ফিদিয়া নির্ধারণের কারণ কী? তখন জানতে পারলাম, এটি সামর্থ্য লাভের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ এর মাধ্যমে যেন রোযা রাখার সামর্থ্য অর্জিত হয়। খোদা তা'লার পবিত্র সত্তাই শক্তি যুগিয়ে থাকে, তাই সবকিছু তাঁর কাছেই চাওয়া উচিত। খোদা তা'লা সর্বশক্তির আধার। তিনি চাইলে একজন যক্ষ্মা রোগীকেও রোযা রাখার সামর্থ্য দিতে পারেন। ফিদিয়ার উদ্দেশ্যই হল, সেই শক্তি লাভ করা আর এটি খোদার কৃপাগুণেই লাভ হয়। অতএব, আমার মতে এভাবে দোয়া করলে খুব ভালো হয় যে, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এটি তোমার আশিসপূর্ণ একটি মাস অথচ আমি এ থেকে বঞ্চিত। জানি না, আগামী বছর বাঁচব কিনা কিংবা বাদ পড়া রোযাগুলো রাখতে পারব কিনা? তাঁর কাছে যদি এভাবে শক্তি চায় তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এমন হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিকে খোদা তা'লা শক্তি দান করবেন"। (মলফুযাত ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৮-২৫৯, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, "ফিদিয়া দিলেই রোযা মাফ হয়ে যায় না, বরং দেওয়ার উদ্দেশ্য হল, এই বরকতময় দিনগুলোতে শরীয়তের অনুমোদিত কোন বৈধ কারণে অন্য মুসলমানদের সাথে একত্রে রোযা রাখা সম্ভব হয় নি। এই যে ছাড়, এটি দুধরণের হয়ে থাকে, একটি সাময়িক, আরেকটি স্থায়ী। ফিদিয়া সাধ্যানুসারে উভয় অবস্থায় দেয়া উচিত। এক কথায়, কেউ ফিদিয়া দিলেও এক বছর, দুবছর বা তিন বছর পর যখনই তার স্বাস্থ্য অনুমতি দেয়, তাকে পুনরায় রোযা রাখতে হবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, পূর্বের রোগ সাময়িক ছিল আর স্বাস্থ্য লাভের পর তার রোযা রাখার সিদ্ধান্ত নিতে নিতেই যদি পুনরায় সে স্থায়ীভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে সে ফিদিয়া দেবে। বাকি যে খাবার খাওয়ানোর সামার্থ্য রাখে সে যদি অসুস্থ হয় বা মুসাফির হয় তাহলে তার জন্য আবশ্যক হবে রমযান মাসে একজন মিসকিনকে ফিদিয়াস্বরূপ খাবার খাওয়ানো আর বছরের অন্য সময় সে রোযা রাখবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রীতি এটিই ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সব সময় ফিদিয়াও দিতেন, পরে আবার রোযাও রাখতেন আর অন্যদেরকেও এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশই দিতেন।" (তাফসিরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৯)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে একটি প্রশ্ন করা হয়, যে ব্যক্তি রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে না এর বিনিময়ে তার মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হয়। এ খাতে যা ব্যয় হয় তা কাদিয়ানের এতিম তহবিলে দেয়া বৈধ কিনা? হুযূর (আ.) বলেন, একই কথা, শহরে মিসকীনকেও খাওয়াতে পারে বা এতিম ও মিসকীন তহবিলেও দিতে পারে।" (মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭১, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

অজান্তে পানাহার করলে রোযা ভাঙ্গে না, এই বিষয়ে তাঁর সামনে (এক ব্যক্তির) একটি চিঠি উপস্থাপন করা হয়, রমযান মাসে সেহরির সময় অজান্তে ভেতরে বসে খাওয়া অব্যাহত রাখি আর বাহিরে এসে দেখি যে, ফর্শা হয়ে গেছে। আমার জন্য সেই রোযা পরে রাখা আবশ্যক কিনা? উত্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অজান্তে খেলে বা পান করলে সেই রোযার স্থলে আরেকটি রোযা রাখা আবশ্যক নয়।"

(মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

বয়সের প্রশ্ন, কোন বয়সে রোযা রাখা উচিত? এ বিষয়ে অনেক বাচ্চাও জিজ্ঞেস করে আর বয়স্করাও। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "স্মরণ রাখা উচিত, শরীয়ত অপ্রাপ্ত বয়স্কদের রোযা রাখতে বারণ করেছে কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে রোযা রাখার অভ্যাস অবশ্যই করা উচিত। তিনি (রা.) বলেন, আমার যতটা মনে পড়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে ১২ বা ১৩ বছর বয়সে প্রথম রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু কোন কোন নির্বোধ ৬/৭ বছরের শিশুদের রোযা রাখতে বাধ্য করে আর মনে করে, আমরা পুণ্যের ভাগী হব। এটি পুণ্য নয় বরং এটি এক অন্যায়। কেননা এটি দেহ গঠনের বয়স। অবশ্য যৌবনে পদার্পনের নিকটবর্তী সময়ে, যখন রোযা আবশ্যক হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে তখন রোযা রাখার চর্চা অবশ্যই করানো উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুমতি ও রীতি যদি দেখা হয় তাহলে ১২/১৩ বছর বয়সে কিছুটা অভ্যাস করানো উচিত এবং প্রত্যেক বছর কয়েকটি রোযা রাখানো উচিত, যতদিন না বয়স ১৮ হয়, যা আমার মতে রোযার জন্য পূর্ণ বয়স। প্রথম বছর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে শুধু একটি রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন। এ বয়সে রোযার একটি ঔৎসক্য থাকে, সেই আগ্রহের কারণে বাচ্চারা বেশি রোযা রাখতে চায়, তখন পিতামাতার উচিত তাদের বারণ করা। এরপর বয়সের এক পর্যায়ে বাচ্চাদের উৎসাহ যোগানো উচিত, যেন কয়েকটি হলেও তারা রোযা রাখে। একই সাথে এটিও দেখা উচিত, বেশি রোযা যেন না রাখে। আর যারা দেখে তাদের আপত্তি করা উচিত নয় যে, সব রোযা কেন রাখে না। কেননা কিশোর-কিশোরীরা যদি এই বয়সে সবগুলো রোযা রাখে তাহলে পরে আর রাখতে পারবে না।

অনুরূপভাবে, কোন কোন ছেলেমেয়ে গঠনগত দিক থেকে দুর্বল হয়ে থাকে। আমি দেখেছি অনেকেই তাদের ছেলেমেয়েদের সাক্ষাতের জন্য আমার কাছে নিয়ে আসে আর বলে, এর বয়স ১৫ বছর অথচ দেখতে মনে হয় ৭/৮ বছর। আমি মনে করি এমন ছেলেমেয়ে হয়ত ২১ বছর বয়সে রোযার জন্য সাবালক হবে। পক্ষান্তরে এক সুঠাম বালককে হয়ত ১৫ বছর বয়সেই ১৮ বছরের মনে হয় কিন্তু আমার এই শব্দগুলো নিয়ে যদি সে শঠতা প্রদর্শন করে যে, রোযার জন্য উপযুক্ত হওয়ার বয়স হল ১৮ তাহলে সে আমার উপরও যুলুম করবে না আর খোদার বিরুদ্ধেও অন্যায় করবে না, বরং নিজ প্রাণের উপর নিজেই অন্যায় করবে। অনুরূপভাবে, কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা যদি রোযা না রাখে আর মানুষ তার সমালোচনা করে তাহলে এমন সমালোচনাকারী নিজের বিরুদ্ধেই অন্যায় করবে।" (তফসিরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫)

হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ কন্যাছিলেন। তিনি বলেন, যৌবনে পদার্পণের পূর্বে স্বল্প বয়সে তিনি (আ.) রোযা রাখানো পছন্দ করতেন না, দু–একটি রোযা রাখাকেই যথেষ্ট মনে করা হত। হযরত আম্মাজান যেদিন আমার প্রথম রোযা রাখিয়েছেন সেদিন মানুষকে ইফতারির দাওয়াত দিয়েছেন, জামা'তের সব মহিলাদের ডেকেছেন। এই রমযানের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় রমযানে আমি আবার রোযা রাখি আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে বলি, আজকে আমি আবার রোযা রেখেছি। তিনি কক্ষেই ছিলেন, পাশের টুলে দুটি পান ছিল, খুব সম্ভব হযরত আম্মাজান বানিয়ে রেখেছিলেন। তিনি একটি পান হাতে নিয়ে আমাকে বলেন, নাও এই পানটি খাও। তুমি দুর্বল, রোযা রাখবে না, রোযা ভেঙ্গে ফেল। আমি পান খেয়ে ফেলি, একই সাথে বলি, সালেহাওরোযা রেখেছেন। তিনিও স্বল্প বয়স্কাই ছিলেন, তার রোযাও ভাঙ্গিয়ে দিন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তাকেও ডাক। আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসি। তিনি আসলে মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে দ্বিতীয় পানটি ধরিয়ে দেন আর বলেন, খাও, তোমার রোযা নেই। সম্ভবত আমার বয়স হয়ত তখন ১০ বছর হবে। (তাহরীরাতে মুবারেকা, ফিকহুল মসীহ্, পৃ. ২১৪, বাব রোযা এবং রমযান)

অনুরূপভাবে, তারাবী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করা হয়। যেমন– গোলেকীর আকমল সাহেব লিখিতভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করেন, রমযান মাসে রাতে উঠা এবং নামায পড়ার তাকিদ রয়েছে, কিন্তু সচরাচর পরিশ্রমী শ্রমিক ও কৃষকরা এমন কাজের ক্ষেত্রে আলস্য দেখায়, তাদেরকে রাতের প্রথম প্রহরে যদি তাহাজ্জুদের পরিবর্তে ১১ রাকাত নামায পড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে তা বৈধ হবে কিনা? হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "কোন অসুবিধা নেই, তারা পড়ে নিতে পারে।" (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬৫, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

আবার তারাবী সম্পর্কে নিবেদন করা হয় যে, এটি যেহেতু তাহাজ্জুদ, তাই ২০ রাকাত পড়া সম্পর্কে হুযূরের মতামত কী? তাহাজ্জুদ তো বেতেরসহ ১১ বা ১৩ রাকাত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর স্থায়ী রীতি হল ৮ রাকাত পড়া আর তিনি তাহাজ্জুদের সময়ই পড়তেন আর এটিই উত্তম। কিন্তু রাতের প্রথম প্রহরে পড়াও বৈধ। আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি রাতের প্রথম প্রহরে এটি পড়েছেন। ২০ রাকাত পরে পড়া হয়েছে কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রীতি তাই ছিল যা পূর্বে বলা হয়েছে।" (মলফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১১৩, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

এক ব্যক্তি হুযূরের কাছে একটি পত্র লিখে, যার সারাংশ হল, সফরে কীভাবে নামায পড়তে হয় আর তারাবী সম্পর্কে কী নির্দেশ? তিনি (আ.) বলেন, "সফরে দুরাকাত নামায পড়াই সুন্নত আর তারাবীও সুন্নত, তা-ও পড়ুন। কখনো ঘরে একাও পড়তে পারেন, কেননা তারাবী আসলে তাহাজ্জুদ, নতুন কোন নামায নয় আর বেতের যেভাবে পড়ে থাকেন সেভাবেই পড়ুন।"(মলফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২২, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

অতএব, রোযা–সংক্রান্ত এই কয়েকটি কথা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আশা করি এ থেকে পাঠকবৃন্দ কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন এবং অনেকেই তাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে যাবেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সঠিক নিয়মে রোযা রাখার তৌফিক দান করুন।

# বিশ্বশান্তিঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

**হযরত মির্যা তাহের আহমদ**
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(৩০তম কিস্তি)

**সুদঃ শান্তির প্রতি হুমকি স্বরূপ**

অতীব গুরুত্ববহ এই সতর্কবাণী যা উচ্চারিত হয়েছে অত্যন্ত জোরালোভাবে মানবজাতির সম্মুখে পবিত্র কুরআন কর্তৃক আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে, যাতে বলা হয়েছে যে, সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি পরিণামে গোটা মানবজাতিকে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের প্রতি ধাবিত করবে।

"যারা সুদ খায় তারা সেইভাবে দাঁড়ায় যেভাবে ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায় যাকে শয়তান সংস্পর্শে এনে জ্ঞান-বুদ্ধিহারা করে ফেলে। এটা এই কারণে যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয়ও সুদেরই মত'; অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালার করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যার নিকট তার প্রভুর পক্ষ থেকে কোন উপদেশ আসে এবং সে বিরত হয়, তাহলে অতীতে যা কিছু হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকট ন্যস্ত। এবং যারা পুনরায় ইহা করবে, তারা নিশ্চয় অগ্নিবাসী হবে, সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে।'

'আল্লাহ্ সুদকে বিলুপ্ত করবেন এবং দানকে বৃদ্ধি করবেন। বস্তুতঃ, কোন কাফের, পাপীকে আল্লাহ্ আদৌ ভালবাসেন না।

'নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রভুর নিকট আছে, এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, এবং যদি তোমরা মু'মিন হও, তাহলে তোমরা সুদের যা কিছু বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও।'

'এবং যদি তোমরা তা না কর, তাহলে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা শ্রবণ কর, কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন রয়েছে। এইরূপে তোমরা কারো ওপর যুলুম করবে না, এবং তোমাদের ওপরও যুলুম করা হবে না এবং যদি কোন (ঋণ) ব্যক্তি দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তাহলে তাকে (তার) স্বচ্ছলতা (আসা) পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে, এবং তোমাদের দানরূপে ছেড়ে দেওয়া তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।" (আল্ বাকারা- ২:২৭৬-২৮১)

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে খোদা তা'লার তরফ থেকে যুদ্ধ সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, খোদার নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক নিয়মাবলী পুঁজিবাদী সমাজগুলোকে শাস্তি দান করা শুরু করবে তখন, যখন ইতোপূর্বে আলোচিত বিষয়গুলো আখেরে মানুষকে পরিচালিত করবে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের দিকে। গরীবের অধিকার যখন হরণ করা হয়, যখন সমাজে শোষণ চলতে থাকে তখনই শুরু হয় বিশৃংখলা, অরাজকতা এবং যুদ্ধ। 'তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা শ্রবণ কর'– কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে, যে রাষ্ট্র সুদের ওপর নির্ভর করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তা এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়ে অনিবার্যরূপেই শেষ হয়ে যাবে, যখন জাতিগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

হাতে সময় থাকলে আমি সুদের এই দিকটা নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করতে পারতাম। পবিত্র কুরআনে যে সমস্ত আয়াতে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, তার পরবর্তী আয়াতগুলোতেই যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা সুদ ও যুদ্ধের মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। যারা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস জানেন তারা মনে করতে পারবেন যে, পুঁজিবাদ শুধু এই সব যুদ্ধ লাগানোর পিছনেই ধ্বংসাত্মক ভূমিকাই পালন করেনি, এগুলোকে দীর্ঘায়িত করার পিছনেও একই ভূমিকা পালন করেছে।

**সম্পদ মজুদ করা নিষেধ**

ইসলাম সব ধরনের শোষণ এবং অসদুপায়কে প্রত্যাখ্যান করে। যেমন, সম্পদ, পুঁজি, দ্রব্য-সামগ্রী জমিয়ে রাখা এবং সরবরাহকে এমনভাবে চালিয়ে দেওয়া যাতে করে মূল্যের গতি উর্ধ্বমুখী হয় এবং ব্যাপকভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। পবিত্র কুরআন বলে:

"হে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় ইহুদী যাজক ও সন্ন্যাসীদের মধ্য থেকে অধিকাংশই অন্যায়ভাবে লোকের ধনসম্পদ গ্রাস করে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।

'(সেই দিন) যেদিন উহাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং উহা দ্বারা তাদের কপালে, তাদের পার্শ্বদেশে এবং তাদের পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে (এবং তাদেরকে বলা হবে) এ তো সেই বস্তু যা তোমরা নিজেদের জন্য মজুদ করতে, সুতরাং তোমরা যা মজুদ করতে (এখন)

তার স্বাদ গ্রহণ কর।" (আত্ তাওবা-৯:৩৪,৩৫)

তথাপি, ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৈধভাবে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় উপার্জন করবার স্বাধীনতা দান করে। প্রত্যেক ব্যক্তির এই স্বাধীনতা বা অধিকার রয়েছে যে, সে সম্পদ আহরণ করবে এবং এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগও গ্রহণ করবে।

দেশের অর্থনীতিকে গড়ে তোলার ব্যাপারে সব দেশের সরকারগুলোর দৃষ্টি যে বিষয়টার প্রতি নিবদ্ধ থাকে, তা হচ্ছে, কীভাবে সমাজের এক ব্যক্তি তার জীবিকা উপার্জন করে। ট্যাক্স ধার্য করা হয় বিক্রয়ের পরিমাণের ওপরে, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের মুনাফার ওপরে এবং চাকুরীর উপার্জনের ওপরে। এটা করা হয়ে গেলে, বক্তির আর্থিক ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করা হয় না। মোটকথা, জাতীয় স্বার্থ শুধু একজনের আয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু সেই ব্যক্তি কীভাবে ও কেমনভাবে তার অর্জিত ও মজুদকৃত আয় খরচ করছে সে ব্যাপারে রাষ্ট্রগুলোর প্রায় কোনটারই কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। কেউ যদি ইচ্ছা করে, তবে সে তার ব্যক্তিগত আয় বা সম্পদ নর্দমায় ফেলে দিতে পারে। সে ইচ্ছা করলে দু'হাতে সম্পদ উড়াতে পারে, আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে। অথবা, সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সে ইচ্ছা করলে কৃপণতা অবলম্বন করতে পারে। সে কি করে, কীভাবে তার টাকা-পয়সা খরচ করবে বা তা কাজে লাগাবে সে ব্যাপারে রাষ্ট্রের করণীয় কিছুই নেই।

কিন্তু ধর্ম এই এলাকার ভিতরেও পা বাড়ায়। ধর্ম এটা করে উপদেশ ও পরামর্শদান করার মাধ্যমে। ধর্ম কোন ব্যক্তিকে শুধু এটাই বলে না যে, কীভাবে তার উপার্জন করা উচিত; বরং এও বলে যে, কীভাবে তার অর্জিত সম্পদ খরচ করা উচিত, কিংবা উচিত নয়। ব্যয় সম্পর্কিত প্রায় সব দেশেই প্রাথমিকভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নির্দেশ স্বরূপ। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, ইসলাম যখন মদ্যপান, জুয়াখেলা, সুখ ও আনন্দভোগের বাড়াবাড়ি নিষেধ করে, তখন যদিও তা সরাসরি এই উদ্দেশ্যে করা হয় না যে, এতে করে ব্যয় বাজেট সঠিকভাবে নিরূপিত হবে, তবু সেই লক্ষ্যটিও অর্জিত হয়ে যায়, এবং তা অর্জিত হয় ধর্মীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার উপজাত হিসেবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিগুলোতে, এই জাতীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদেশাবলীকে মনে করা হয় মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনধিকার চর্চা, এবং ব্যক্তির ব্যয় করার অধিকারের ওপরে হস্তক্ষেপ করা। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গীটা মানুষের কাছে নতুন কিছু নয়। পবিত্র কুরআনের মতে, পূর্ববর্তী যামানার জাতিসমূহ এবং সভ্যতাগুলোও ধর্ম সম্পর্কে অনুরূপ মনোভাবই প্রদর্শন করতো। যার ফলে, অনেক সময় এই বিতর্কের সৃষ্টি হতো যে, মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে ধর্মের হস্তক্ষেপ করা উচিত কিনা। যখন হযরত শোয়াইব (আ. প্রাচীনকালের একজন নবী) মিদীয়ানের অধিবাসীদেরকে এই শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে, কীভাবে টাকা-কড়ি খরচ করা উচিত, এবং কীভাবে উচিত নয়, তার উত্তরে লোকেরা তাঁকে তিরস্কার করতো–

"তারা বললো, হে শোয়াইব! তোমার এবাদত-বন্দেগী কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যার উপাসনা করে আসছে আমরা তাকে পরিত্যাগ করি, অথবা আমাদের ধনসম্পদ দ্বারা আমরা যা করতে চাই তাও (পরিত্যাগ করি)? তুমি তো দেখছি বড় বুদ্ধিমান, ন্যায় বিচারক!" (হুদ, ১১:৮৮)

### সাদাসিধে জীবনযাপন

ইসলাম সাধাসিধেভাবে জীবনযাপন করতে বলে। অপব্যয় করতে নিষেধ করে, কৃপণতা করতে বারণ করেঃ

"এবং (কৃপণতা করে) তুমি তোমার হাত বেঁধে রেখো না, এবং (অপব্যয় করে) তা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করো না, অন্যথায় তুমি নিন্দিত, ক্লান্ত হয়ে বসে পড়বে।" (বনী ইসরাঈল- ১৭:৩০)

"এবং আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দাও, এইরূপে মিসকীন ও পথচারীদেরকেও। এবং (তোমাদের ধন-সম্পদ) কোন প্রকারে অপব্যয় করো না।

"নিশ্চয় অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই, এবং শয়তান তার প্রভুর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।" (বনী ইসরাঈল- ১৭ঃ২৭, ২৮)

### বিয়ে-শাদীতে ব্যয়

বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানাদি গরীব ও ধনী পরিবারগুলোর মধ্যে যে, কায়দায় উদযাপিত হয়ে থাকে তা রীতিমত একটা স্পর্শকাতর ব্যাপার। ব্যাবধানটা এত বিরাট যে, এতে করে যেসব গরীব পিতামাতার ঘরে বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে তাদের জন্য ব্যাপারটা ভয়ানক উৎকণ্ঠা ও অন্তর্জ্বালার কারণ না হয়ে পারে না।

প্রচুর-ব্যয়-বহুল বিবাহোৎসব, জাঁকজমক, ধুমধাম, ফুটানি, বড়লোকী দেখানো প্রভৃতি সব কিছুকেই ইসলাম নিন্দা করে। বস্তুতঃ আমরা ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে দেখতে পাই যে, বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠাগুলোকে এত সাদাসিধে ভাবে উদযাপিত হতো যে, অনেকের কাছে সেগুলোকে মনে হতো বিবর্ণ। যদিও আশেপাশের সমাজগুলোর প্রথাপর্ব, রীতি-নীতি থেকে নানা নতুনত্ব ও কদাচার মুসলিম বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রেও অনুপ্রবেশ করেছিল, তবু এর মৌলিক যে অনুষ্ঠান তা ধনী-দরিদ্র উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান সরল, সাদামাটা এবং ব্যয়বাহুল্যহীন।

'নিকাহ্'- অর্থাৎ বিয়ের ঘোষণা দেওয়া হয় সাধারণতঃ মসজিদে সকলের উপস্থিতিতে, যেখান ধনী-দরিদ্র সবাই একইভাবে সমবেত থাকে। মসজিদ তো আর ধুমধাম করা বা জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনীর জায়গা নয়, মসজিদ হচ্ছে এবাদতের ঘর।

আনন্দ ও খুশী প্রকাশের জন্য যে বিবাহোত্তর দাওয়াত বা ওলীমা ইত্যাদি করা হয়, তার ব্যাপারে ধনীদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যে অনুষ্ঠানে গরীবদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয় না তা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অভিশপ্ত। সুতরাং, এসব অনুষ্ঠানে আপনি দামী দামী পোষাক পরিহিত সুসজ্জিত ধনীদের পাশাপাশি অতি নিম্নমানের পোষাক পরিহিত গরীবি হালতে উপস্থিতি গরীবদেরকেও দেখতে পাবেন। এতে যেমন ধনীদের চোখ খুলে, তেমনি গরীবরাও তাদের সঙ্গে একত্রে বসে উন্নত মানের সুস্বাদু খাদ্য পানীয়, ফল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপভোগ করতে পারে।

(চলবে)

# আহমদী ও অ-আহমদীর মধ্যে পার্থক্য

মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ

(শেষ কিস্তি)

## ২) 'ইমাম মাহ্‌দী (আ.)'-এর আগমনের বিষয়ঃ

বিধাতার চিরবিধান ক্রম আবর্তন-বিবর্তন, উত্থান-পতন আদিকাল থেকে প্রত্যেকটি বস্তুর মাঝে পরিচালিত হচ্ছে। উত্তাল নদ-নদী ও সাগর তরঙ্গও এই সত্য বহন করছে। কেয়ামত অবধি প্রবহমান ও চলমান পরিপূর্ণ ও কামেল ধর্ম ইসলামের অনুসারী মুসলিম জাতির বেলায়ও উক্ত বিধানের ব্যতিক্রম ঘটে নি ও ঘটবে না। তাই ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) স্পষ্ট ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, **"মুসলিম জাতি যেমনিভাবে তার উত্থানের স্বর্ণযুগ অতিক্রম করতে থাকবে তেমনিভাবে তার সুন্দর ও উজ্জ্বল চেহারা ধীরে ধীরে ম্লান হতে থাকবে এমনকি বনী ইসরাঈলদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইহুদীদের চেয়ে নিকৃষ্টতর হয়ে যাবে।"** (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান)

চৌদ্দ শতাব্দী পর্যন্ত চরম অধঃপতন ঘটবে; আমাবস্যার রাত্রির ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে; তখন বনী ইসরাঈল জাতিতে যেরূপ চৌদ্দ শতাব্দির শিরোভাগে ঈসা ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হয়েছিলেন তদ্রুপ নবী করীম (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতেও চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে ঈসা ইবনে মরিয়মের রঙে রঙিন ইমাম মাহ্‌দী আবির্ভূত হবেন। ঈসা-মসীহ্ এবং ইমাম মাহ্‌দী তাঁর দু'টি গুণবাচক নাম হবে এবং তাঁর আসল নাম আমার নামের মত হবে। (মিশকাত, কিতাবুল ফিতান)

তাঁর আগমনের ফলে সেই আমাবস্যার রাত্রি বিদায় নিবে এবং শুভ প্রভাতের উদয় হবে; যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **"ওয়াল্লাইলি ইযা 'আস'আসা। ওয়াস্ সুবহি ইযা তানাফ্‌ফাসা।"** অর্থাৎ, 'রাতের শপথ যখন তা শেষ প্রহরে পৌঁছবে এবং প্রভাতের শপথ যখন তা সজোরে নিঃশ্বাস ফেলতে আরম্ভ করবে।' (সূরা আত্ তাকভীর: ১৮-১৯)।

বড়ই আশ্চর্যের ও চিন্তার বিষয় যে, ইমাম মাহ্‌দীর আগমন সম্পর্কে পার্শিয়ান ধর্মগ্রন্থ 'যিন্দাবিস্তা' এবং হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, এই উম্মতের ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত নাম **'আহমদ'** হবে। নবী করীম (সা.)ও ইমাম মাহ্‌দীর জামানার শত শত লক্ষণ ও চিহ্নের কথা বর্ণনা করেছেন। শত বছর পূর্বেকার হযরত মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবী তাঁর বিখ্যাত বই **'ফুসূসুল হিকাম'**-এ লিখেছেন, 'ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর সঙ্গে যমজ বোন জন্মগ্রহণ করবে, প্রথমে বোন হবে পরে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন।' এই ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। একইভাবে আমাদের উপমহাদেশের অনেক বুযুর্গ ব্যক্তিরাও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। সেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ হলেন, **হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)**।

কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা **'প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী'** সম্পর্কে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ভবিষ্যদ্বাণীটি হল–

**"হুয়াল্লাযি বায়াসা ফিল উম্মিয়্যিনা রাসূলাম্ মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি ওয়া ইউযাক্কিহিম ওয়া ইউয়াল্লিমুহুমুল্ কিতাবা ওয়াল হিকমাহ্; ওয়া ইন কানু মিন কাবলু লাফি দালালিম্ মুবিন।**

**ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম; ওয়া হুয়াল আযিযুল হাকীম।"** (সূরা আল্ জুমু'আ: ৩-৪)

অর্থ: "তিনি নিরক্ষরদের মাঝ থেকে তাদেরই একজনকে এক মহান রসূল করে আবির্ভূত করেছেন। সে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শুনায়, তাদের পবিত্র করে এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিখায়। অথচ এর পূর্বে তারা নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় (পড়ে) ছিল।

আর তাদেরই মাঝ থেকে অন্যদের প্রতিও (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন), যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয় নি। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।"

উক্ত আয়াতের অবতরণ সম্বন্ধে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, "আমরা হযরত নবী করীম (সা.)-এর নিকট বসেছিলাম। তখন সূরা জুমুআ' যার মধ্যে **'ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম'** আয়াত আছে, অবতীর্ণ হল। বর্ণনাকারী বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! তারা কারা (যারা এখনও আমাদের সঙ্গে মিলিত হন নি)? কিন্তু তিনি এর কোন উত্তর দেন নি, এমনকি তিনবার জিজ্ঞাসা করা হল। সে সময় সালমান ফারসীও আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। মহানবী (সা.) সালমান ফারসী (রা.)-এর কাঁধের উপর হাত রেখে বললেন, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে চলে গেলেও তাঁদের (পারস্য বংশোদ্ভূত) এক বা একাধিক ব্যক্তি তথা হতে তাকে

নামিয়ে আনবে।" (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর, খণ্ড: ২, ১৯৩২ ইং সনে মিশরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত)।

**আবার হযরত রসূলে করীম (সা.) ইমাম মাহ্‌দীর সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ বলেন,** "নিশ্চয় আমাদের মাহ্‌দীর সত্যতার এমন দুইটি লক্ষণ আছে, যা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত অন্য কারও সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শিত হয় নি। একই রমযান মাসে (চন্দ্র গ্রহণের) প্রথম রাত্রে চন্দ্র গ্রহণ হবে এবং (সূর্য গ্রহণের) মধ্যম তারিখে সূর্য গ্রহণ হবে।" (দারকুতনী, পৃ: ১৮৮ এবং আরও ছয়টি প্রসিদ্ধ কিতাবে এ হাদিস বর্ণিত হয়েছে)।

উল্লিখিত গ্রহণদ্বয় ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে হয়ে গিয়েছে। আযাদ পত্রিকা উর্দু লাহোর, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে, সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট, লাহোর, ৬ই ডিসেম্বর ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দ মাওলানা শাহ্ রফিউদ্দিন সাহেব লিখিত 'কিয়ামত নামার' ভূমিকা (উর্দু) এবং ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সুরেশ্বর নিবাসী মরহুম মাওলানা জান শরীফ সাহেব প্রণীত 'মদীনা কলকি অবতারের ছফিনা' দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত কুরআনের বাণী এবং হাদীস দ্বারা প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হচ্ছে, দুনিয়াতে যে যুগে প্রকৃত ঈমান থাকবে না তখন পারস্য বংশীয় এক বা একাধিক বিশেষ ব্যক্তি ঈমানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। আর তিনি হলেন ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বা প্রতিশ্রুত মসীহ। বস্তুতঃ ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবিদার হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) কেননা তিনি পারস্য বংশীয় ছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুত রূহানী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

## আহমদীদের একজন ইমাম এবং স্বতন্ত্র জামাত রয়েছে:

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মুখ-নিঃসৃত বাণী সূর্য হতেও উজ্জ্বল এবং সত্য। কোন মু'মিন তাঁর (সা.) বাণীকে অবহেলা করে এড়িয়ে যেতে পারে না। বলা বাহুল্য, হুযূর আকদাস (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ উম্মতের মধ্যে ৭৩ ফিরকা হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ফিরকাকে সত্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত ফিরকা বিশ্বাস করে গর্ব ও আনন্দ বোধ করে। যেমন- আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"কিন্তু তারা নিজেদের ধর্মকে খন্ড বিখন্ড করে নিয়েছে। (এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে।) প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা কিছু আছে তা নিয়ে আনন্দিত। সুতরাং তুমি তাদেরকে কিছুকালের জন্য তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের মধ্যে ছেড়ে দাও।"** (সূরা মু'মিনুন: ৫৪-৫৫)

এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন, "এমন এক জামানা আসবে যখন মুসলমান জাতি বহু দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। (মতবিরোধের কারণে) যেভাবে ইহুদীগণ ৭২টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল আমার উম্মতের লোকেরাও তদ্রুপ বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত হয়ে ৭২ এর স্থলে ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। এসব দলের মধ্যে ১ টি দল ব্যতিরেকে বাকী সব দল হয়ে যাবে আগুনের অধিবাসী।" (মিশকাত, কিতাবুল ঈমান, পৃ: ৩০)

উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই একটি মাত্র বেহেশতি দলের লক্ষণ কি হবে? উত্তরে মহানবী (সা.) বললেন, "সেটা একটা **'জামাত'** হবে। আর জামাতের উপরেই আল্লাহ্‌র হাত (তথা ঐশী সাহায্য) থাকবে।"

তিনি (সা.) আরো বললেন, **"তালযামু জামায়াতুল মুসলিমীনা ওয়া ইমামুহুম।"** অর্থাৎ, তোমরা মুসলমানদের ঐ জামাতভুক্ত হবে যাদের এক ইমাম হবে।"

একইসাথে আরো বলেন, "যে ব্যক্তি জামানার ইমামের হাতে বয়আত গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করবে, তার জাহেলিয়্যাতের মৃত্যু হবে।" (মিশকাত)

উপরোক্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, একমাত্র আহমদীদের কাছেই ইমাম আছে যার কথায় তারা ওঠে-বসে। পক্ষান্তরে অ-আহমদীরা বহুধা দলে বিভক্ত যাদের কোন ইমাম নেই। এক ইমাম তো দূরের কথা, তাদের এক মসজিদের ইমামই আরেক মসজিদের ইমামের ফতোয়া মানে না।

## আরো কিছু পার্থক্য:

আহমদী এবং অ-আহমদীদের মধ্যে আরো কিছু পার্থক্য রয়েছে যেগুলোও কোন অংশে কম গুরুত্ব রাখে না। যেমন–

*** অ-আহমদী ইমামের পিছনে আহমদীরা নামায পড়ে না–**

আহমদীরা কোন অ-আহমদী ইমামের পিছনে নামায পড়ে না। এর কারণ হলো:

১) রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, **"ইমামুকুম মিনকুম"** অর্থাৎ, তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকে হবে। এছাড়া ইমাম মাহদী (আ.) আসলে তাঁকে মানতে হবে আর আমরা তাঁকে মান্য করেছি। অ-আহমদী ভাইয়েরা যেহেতু হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে মানেন না, তাই আমরা তাদের পিছনে নামায পড়িনা।

২) হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার খলীফা ইমাম মাহদী আসবেন, তোমরা তাঁর আগমনবার্তা শোনা মাত্রই তাঁর নিকট হাজির হয়ে বয়আত করবে।" (মিসবাহ্ যুজাজা, হাসিয়া ইবনে মাজা, বাবু খুরুজুল মাহদী)

এছাড়া হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগে মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেবের নেতৃত্বে উপমহাদেশের সব ফিরকার আলেমরা সম্মিলিতভাবে তাঁকে কাফের ফতোয়া দিয়েছিল। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, দুই মুমেন ভাইয়ের কেউ যদি তার অপর ভাইকে কাফের বলে তবে সে কাফের হলে বিষয়টি তার উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি কাফের না হয় তবে ফতোয়াটি উল্টো ফতোয়া দানকারীর উপর বর্তাবে। যেহেতু অন্যান্য কাফের ফতোয়া দিয়ে রেখেছে। তাই দুই পক্ষের

যে কোন এক পক্ষ তো কাফের হবে। তাই আমরা অ-আহমদীদের পিছনে নামায পড়ি না।

* **প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র একটি ফিরকাই সত্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত হবে।** এ বিষয়ের মীমাংসা স্বয়ং নবী করীম (সা.) করে দিয়েছেন এবং এ সত্য ও মুক্তি-প্রাপ্ত ফিরকাকে চিনবার জন্য এই মাপ-কাঠিও উম্মতের হাতে তুলে দিয়েছেন– যে ফিরকা নবী করীম (সা.) ও তাঁর সাহাবাগণের পথে পরিচালিত হবে এবং তাঁদের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবে কেবল সেই ফিরকাই সত্য ও মুক্তি-প্রাপ্ত হবে। সাহাবাদের পথ ও কার্যাবলীর দৃষ্টান্ত এমন ছিল যে, যতদিন নবী করীম (সা.) সাহাবাদের মধ্যে ছিলেন ততদিন তারা তাঁকে সর্বান্তঃকরণে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করে গিয়েছেন, এবং হুযূর আকদাস (সা.)-এর ইন্তেকালের পরক্ষণেই তাদের মধ্যে–

১) খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার মাধ্যমে সাহাবাগণ একতা-শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক মহব্বতের ভিত্তিতে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছিলেন এবং খলীফার নেতৃত্বাধীনে তাঁরা পারস্য, সিরিয়া, ইরাক ও মিশর প্রভৃতি দেশ জয় করে ইসলামী পতাকার ছায়াতলে এনে এক স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত করেছিলেন।

২) তাদের একটি কেন্দ্র ছিল।

৩) তাদের বায়তুল মাল ছিল।

৪) খলীফাকে পরামর্শ দেয়ার জন্য মজলিসে শূরা (পরামর্শ সভা) ছিল।

৫) তাঁদের মধ্যে পরম ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল এবং একে অপরের জন্য প্রিয় হতে প্রিয়তর বস্তু এমনকি তাঁরা জীবন পর্যন্ত কুরবান করতেন।

৬) তারা ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত থাকতেন।

বর্তমান যুগে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত **"আহ্‌মদীয়া"** জামাত ছাড়া কোন ফিরকার মধ্যে সাহাবাদের এই গুণাবলীর সমাবেশ আছে বলে কেউ দাবি করতে পারে না। কেননা আহমদীদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত আছে। আহমদীদের বায়তুল মাল আছে যেখানে তারা নিয়মিত আর্থিক কুরবানী দিয়ে চলেছে। পক্ষান্তরে হলফ করে বলা যায়, অ-আহমদীদের কেউই নিয়মিত আর্থিক কুরবানী করে না। খলীফা যেখানে আহমদীদের কেন্দ্র সেখানে। আহমদীদের মাঝেই প্রতি বছর শূরা (পরামর্শ সভা) অনুষ্ঠিত হয় যাতে করে পূর্বের তুলনায় আরো বেশি ইসলামের সেবা করা যায়। বর্তমানে আহমদীরাই সারাবিশ্বে নিয়মিত মানবসেবা করে যাচ্ছে। এজন্য তাদের মাঝে **"হিউম্যানিটি ফার্স্ট"** নামে একটি সংগঠনও রয়েছে। আজ সমগ্র বিশ্বে মোট ২১০টি দেশে এই আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম বিস্তৃত হয়েছে আর প্রতি বছরই নতুন কোন না কোন দেশ আহমদীয়াতের পতাকাতলে যুক্ত হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

**সুধী পাঠকবৃন্দ! পার্থক্য নির্ণয়ে এস্থলে আপনাদের জন্য বিষদ চিন্তার খোরাক রয়েছে।**

## দোয়া আধ্যাত্মিক জীবনের মূল ভিত্তিঃ

আহমদী এবং অ-আহমদীদের মাঝে অন্যতম একটি পার্থক্য হলো **"দোয়া"**। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) যে জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন তা কোন রাজনৈতিক দল বা প্রতিষ্ঠান নয়। এটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক একটি দল বা জামাত যারা হুবহু মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে চলে। মহানবী (সা.)-এর যেমন কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না, তেমনি আহমদীয়া জামাতও কেবল আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থণের ভিত্তিতেই এগিয়ে চলেছে। এ জামাতের মূল অস্ত্র হল **"দোয়া"**। আল্লাহ্ তা'লার কাছেই আহমদীরা সবকিছু প্রার্থনা করে থাকে। পাশ্চাত্যের ধর্ম প্রচারকগণ, যারা আমাদের ঘরে এসে আমাদের মানুষকে বিপথগামী করছিল, সেই শত্রুতার মহান প্রতিরোধে আহমদী মুবাল্লেগগণ (ধর্ম প্রচারক) পৃথিবীর সর্বত্র তাদের ঘরে গিয়ে আজ তাদের মানুষকে ইসলামের আশিস বিতরণ করে সত্য পথে আনছেন। ঘরে বাইরে প্রত্যেক আহ্‌মদী আজ ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য নিজ নিজ স্থানে অতন্দ্র প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান। চোখে তাদের স্বর্গীয় আলো, অন্তরে দৃঢ় ঐশী-পণ। তারা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর চলা পথে ঈমান ও আমল, যুক্তি ও নিদর্শন দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে জগতে বিশ্বনবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে। আর এ কাজটির মূল ভিত্তি হল **"দোয়া"**।

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, "খোদা তা'লা মহা সম্মানিত। তাঁর সম্মানের এক গভীর সমুদ্র রয়েছে যা কখনো শেষ হতে পারে না। তাই রাতের বেলায় উঠে তোমাদের দোয়া করা এবং খোদার ফযল অন্বেষণ করা উচিত। দোয়া চাওয়া খোদা তা'লার নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ ভাবে আমরা দেখে থাকি, যখন শিশু কান্নাকাটি করে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তখন মা নিতান্ত বিচলিত হয়ে তাকে দুধ দেয়। প্রভূত্ব ও দাসত্বের মাঝে এমন এক সম্পর্ক রয়েছে যা সবাই বুঝতে পারে না। যখন মানুষ আল্লাহ্‌র দরবারে পড়ে যায় এবং খুবই বিনয়, আকুতি ও মিনতির সাথে কান্নাকাটি করে ও তাঁর সামনে নিজ অবস্থা উপস্থাপন করে নিজ প্রয়োজন পুরো করতে প্রার্থনা জানায় তখন আল্লাহ্‌র দয়া উৎসারিত হয় এবং সেই ব্যাক্তির উপর রহম করা হয়। আল্লাহ তা'লার ফযলের দুধও এক কাকুতি-মিনতির প্রত্যাশা করে। তাই তাঁর সামনে অশ্রুসিক্ত নয়নে দাঁড়ানো উচিত।" (মলফুযাত, খন্ড: ১,পৃ: ৩৫১-৫২)

এ যুগের হাকাম ও আদল হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আরো বলেন, "দোয়া এমন জিনিস যা শুকনো খড়িকেও সবুজ সতেজ করতে পারে এবং মৃতকে জীবিত করতে পারে। আল্লাহ তা'লা যেভাবে তাঁর তকদীর ও ইচ্ছাকে রেখেছেন সে অনুযায়ী যে কোন পাপী ব্যাক্তি যে ধরণেরই বিপদে বা কষ্টে নিপতিত হোক, দোয়া তাকে

রক্ষা করতে পারে। (আল হাকাম, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৩)

**পরিশেষঃ**

প্রখ্যাত কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবাল তার **"শিকওয়া"** নামক শোকগাঁথার মধ্যে অনুশোচনার কণ্ঠে বলেন,

"বেশভূষাতে তোমরা খ্রীষ্টান
সভ্যতাতে হও হনুদ
এইতো মুসলিম দেখতে যারে
লজ্জা আজি পায় ইয়াহুদ"

এ থেকে বুঝা যায়, মুসলমানরা বর্তমানে কত নিকৃষ্টতায় পরিণত হয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য করেই বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

"বাহিরের দিকে মরিয়াছি যত, ভিতরের দিকে তত,
গণতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু ছাগলেন মত"

অনেকে এমনও বলে থাকেন যে, অন্য কোথাও না থাকলেও অন্ততঃ পবিত্র আরব ভূমিতে খাঁটি ইসলাম বিদ্যমান রয়েছে। এ কথার উত্তরে কবি নজরুল দুঃখ করে বলেন,

"খালেদ! জজিরাতুল সে আরবের পাক মাটি
পলিদ হলো, খুলেছে সেখানে ইউরোপ, 'পাপের ভাটি'

আলেমগণ আপোষে কুফরীর টীকা বিনিময় করে সকল মুসলমানের কপালে তাদের অজান্তে এই টীকা এঁকে দিয়ে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ওলামা এবং সাধারণ সকল মুসলমানকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রেমের ডাক দিয়ে ঈমান ও আমলের জ্যোতির্ময় ভূষণে ভূষিত করে নব জীবনের অভিষেক দিতে এসেছেন। সেসব জীবন ও জ্যোতিঃ লাভ করে সকলকে আজ ইসলামের বিশ্ব-বিজয় অভিযানে বের হতে হবে। হে ভাই মুসলমান! ইসলামকে রক্ষা করার দায়িত্ব আজ আপনারও।

আসুন! হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে আশিস গ্রহণ করুন। চলুন! আমাদের অতীতের ভুল-ত্রুটি পূরণের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে জগতে বিশ্বনবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা সকলে এক লক্ষ্যে হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজে নামি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সহায়। বিজয় অবশ্যই হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর জন্য নির্ধারিত। এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.) বলেন,

**"জিতে জি কাদরে বাশার কি নেহী হোতি পেয়ারো!
ইয়াদ আয়েঙ্গে তুমহেঁ মেরে সুখান মেরে বাদ"**

অর্থ: 'হে প্রিয়গণ! জীবিত অবস্থায় মানুষের কদর হয় না, আমার মৃত্যুর পরে তোমরা আমার কথা ঠিক মনে করবে।' (ফতেহ ইসলাম, বাংলা অনুবাদ, পৃ: ৪২)

তিন (আ.) আরো বলেন, "আজ সেই দিন আগত প্রায় যখন সত্যের দেদীপ্যমান সূর্য পশ্চিম হতে উদিত হবে এবং ইউরোপবাসী সত্য খোদার সন্ধান লাভ করবে। ... সে দিন নিকটবর্তী যখন ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্ম লোপ পাবে এবং সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে কিন্তু ইসলামের ঐশী অস্ত্র ততদিন পর্যন্ত ভাংবেওনা আবার তীক্ষ্ণতাও হারাবেনা, যতদিন পর্যন্ত না সেটি দাজ্জালী শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে খোদা তা'লার সেই খাঁটি তৌহীদ যা মরূপ্রান্তরের অধিবাসীগণ এবং যারা সর্বপ্রকার জ্ঞানালোক হতে বঞ্চিত তারাও নিজ অন্তরে উপলব্ধি করবে এবং অচিরেই তা সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। সেদিন কোন কল্পিত প্রায়শ্চিত্ত এবং কোন কল্পিত খোদা কোনকিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। আল্লাহ্ তা'লার একটি আঘাতে কুফরের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কিন্তু তা কোন তরবারীর সাহায্যে বা কোন বন্দুকের মাধ্যমে হবে না বরং তা সত্যানুসন্ধিৎসু আত্মাকে আলোক প্রদানের মাধ্যমে হবে। আমি যা বলছি, তখন তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারবে।" (তাযকেরা, পৃ: ২৯৯)।

**আল্লাহ্ তা'লা সকল মুসলমান ভাইকে সুমতি দান করুন! তিনি হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর মাধ্যমে যে মহা সুসংবাদ দিয়েছেন তা অচিরেই পূর্ণ হোক এবং সারা বিশ্বের জনগণ ইসলামের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করে ধন্য হোক। আমীন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার জন্য।**

## ঈদগাহে যাতায়াতের সময় নিম্নলিখিত তকবীর পাঠ করা উচিত-

**"আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।"**

অর্থ: আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র।

এ তকবীর ঈদুল ফিতরের নামাযের পর ইমাম ও মুক্তাদীগণ কমপক্ষে তিনবার উচ্চঃস্বরে পাঠ করবেন।

ঈদগাহে আসা-যাওয়ার পথে নবী করীম (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ (রা.)-ও এ তকবীর বেশি বেশি পড়তেন।

ঈদের দিনে মেসওয়াক করা, গোসল করা, আতর বা অন্য সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা, নতুন বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা এবং উত্তম খাদ্য গ্রহণ করা সুন্নত।

ঈদুল ফিতরের নামাযের পূর্বে কিছু খেয়ে মসজিদে যাওয়া আর কুরবানীর ঈদের নামাযের পর নামায থেকে এসে কিছু খাওয়া সুন্নত।

# খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণরাজি

**শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন,** মুরব্বী সিলসিলাহ্

(২য় কিস্তি)

**তথ্যপ্রযুক্তিকে ইসলামের কাজে ব্যবহার**

তথ্যপ্রযুক্তিকে ইসলামের কাজে ব্যবহার এটাও আহমদীয়া খেলাফতের এক বিশেষ কল্যাণ। এ ক্ষেত্রে অগ্রগন্য ভূমিকা রেখেছে **এমটিএ** (মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া)। ৩টি স্বতন্ত্র চ্যানেল ও ৮টি অডিও সম্মলিত এই টিভি চ্যানেলটি ২৪ ঘন্টা বিরামহীন ভাবে সারা বিশ্বে খাটি ইসলামের বাণী প্রচার করে যাচ্ছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিনিয়ত ইসলামের বাণী জানার , বুঝার ও মানার সুযোগ পাচ্ছে। আজ পৃথিবীর এমন কোন জাযগা নেই যেখানে ইসলামের বাণী পৌছাঁচ্ছে না।

এমটিএ এই কাজের পাশাপাশি আরও একটি গুরত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে। আর তা হল- আপনারা সবাই জানেন, পাকিস্তানে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ ও ১৯৮৪ ইং সালে জঘন্যতম ঘৃন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। যে কারণে অবশেষে বাধ্য হয়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় খলিফাকে হিজরত করতে হয়েছিল। এতে বিরুদ্ধবাদীরা সেদিন খুবই খুশি হয়েছিল। তারা মনে করেছিল আহমদীদেরকে তারা খলীফা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পেরেছে। কিন্তু এমটিএ-র কল্যাণে এ ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। তাদের আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়েছে। আজ প্রতিনিয়ত আহমদীরা তাদের খলীফাকে দেখছে এবং তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছে। ঘরে বসেই তাৎক্ষণিক দিকনির্দেশনা সরাসরি পেয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে আফ্রিরিকার দেশগুলোতে রেডিও-এর মাধ্যমেও আহমদীয়া জামাত ইসলামের তবলীগ করে যাচ্ছে। এসব দেশে রেডিও অনুষ্ঠানগুলো ইতিমধ্যে বেশ জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে।

অনুরূপভাবে ইন্টারনেট, ইউটিউব, ফেইজবুক, স্কাইপের মাধ্যমেও খেলাফতের কল্যাণে আহমদীরা ইসলাম প্রচারের কাজ করে যাচ্ছে। শুধুমাত্র alislam.org ওয়েবেই মূল ইংরেজী ছাড়াও আরও ৩২ ভাষায় browsing করার সুযোগ পাচ্ছে। এ ছাড়া প্রত্যেক দেশের অংগ-সংগঠনগুলোর আলাদা আলাদা ওয়েব সাইট তো রয়েছেই।

**(প্রিন্ট মিডিয়া)**

খেলাফতের কল্যাণে প্রিন্ট মিডিয়াতে ব্যাপক কাজ হচ্ছে। আহমদীয়া জামাত ১৭ টি ভাষায় বিভিন্ন দেশে ৭৮টি পত্রিকা প্রকাশ করে ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে। এছাড়াও খেলাফতের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর বিভিন্ন ভাষায় কোটি কোটি বই ও লিফলেট প্রকাশ করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে ইসলামের বাণী প্রচার করা হচ্ছে।

**অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি**

খেলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণে আজ জামাতে আহমদীয়া অর্থনৈতিক ভাবেও সমৃদ্ধ। আজ থেকে প্রায় একশ বছর পূর্বে যখন লাহোরী জামাতের সদস্যরা বায়তুল মালের সমস্ত অর্থ নিয়ে লাহোরে চলে যায়, তখন খলীফার হাতে, বায়তুল মালে মাত্র ১৪ আনা ছিল। আর ১৮হাজার রুপি ঋনের বোঝা ছিল। আজ আমাদের পঞ্চম খলীফার অধীনস্ত বায়তুল মালে প্রতি বছর হাজার কোটি টাকারও বেশি জমা হচ্ছে।

আজ থেকে ৩৪ বছর পূর্বে পাকিস্তানের একজন সৈরশাসক অত্যন্ত দাম্ভিকতার সাথে ঘোষণা দিয়েছিল– আমরা আহমদীয়া খলীফার হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দেব। রাবওযাবাসীরা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাবওয়ার অলি গলিতে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু আজ ৩৪ বছর পর খেলাফতের কল্যাণে আহমদীয়াতের বর্তমান যে অবস্থান তা দেখার মত। বর্তমানে রাবওয়া পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পাকিস্তানের সবচেয়ে ধনী শহর হিসেবে স্বীকৃত, সবচেয়ে শিক্ষিত শহর হিসেবে স্বীকৃত, সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় শহর হিসেবে স্বীকৃত। তৃতীয় বিশ্বের দেশ পাকিস্তানের শহর হওয়া সত্ত্বেও সেখানে সদকা দেওয়ার জন্য লোক খুজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে পাকিস্তানের চলতে হয় অন্যের সাহায্য নিয়ে, ঋন নিয়ে, ভিক্ষা নিয়ে। নিজেদের দেশ চালানোর জন্য অন্যের সাহায্যের উপর, ভিক্ষার উপর নির্ভর করতে হয়। ২০১৩ সনের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাদের দেশের প্রত্যেক নাগরিকের উপর গড়ে ১১৫,০০০ টাকার ঋনের বোঝা রয়েছে। (২০১৭ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে) অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রত্যেকটি শিশু ১১৫,০০০ টাকা ঋনের বোঝা নিয়ে জন্ম গ্রহন করে। পক্ষান্তরে খেলাফতের কল্যাণে আজ শুধু পাকিস্তানে নয় বিশ্বের কোথাও আহমদীদের ক্ষুধার্ত দিন কাটাতে হয় না। কোথাও আহমদী কোন ভিক্ষুক নেই। টাকার অভাবে গরীব ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা বন্ধ করতে হয় না, গরীব মেয়েদের বিয়ে আটকে থাকে না। বস্ত্র, বাসস্থানহীন দিনের পর দিন কাটাতে হয় না।

খেলাফতের এ কল্যাণ আজ শুধু আহমদীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আফ্রিকা ও বিশ্বের অন্যান্য জায়গার অনেক গরীব মানুষ প্রতিনিয়ত খেলাফতের কল্যাণ ভোগ করছে। খেলাফত অধিনে আফ্রিকা মহাদেশে

নুসরত জাঁহা স্কীমের আওতায় গরীব মানুষের পড়ালেখার ব্যবস্থা করার জন্য ৫১০ টি স্কুল কাজ করে যাচ্ছে। ১২টি দেশে ৪২টি হাসপাতাল লক্ষ লক্ষ মানুষকে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও তাদের জন্য পানি, বিদ্যুৎ, খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। হিউমিনিটি ফার্স্ট খেলাফতের আরেক কল্যাণের নাম। যেখানে মানবতা বিপন্ন হয় , মানুষ দূর্যোগ ও দূর্ভোগের শিকার হয়। সেখানে দূর্গতের পাশে সাহায্যেও জন্য গিয়ে দাড়ায় হিউমিনিটি ফার্স্ট। এক্ষেত্রে ধনী গরীর কোন বাধ বিচার করা হয় না। অতি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমেরিকা ও কানাডাতে ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনা ও সানডি, জাপানে ভূমিকম্প ও সুনামী, পাকিস্তানে ভূমিকম্প ও ভয়াবহ বন্যা , হাইতিতে ভূমিকম্প, ইন্দোনেশিয়াতে সুনামী, বাংলাদেশে আইলা ও সিডর আঘাত হানে তখন ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাড়াঁয় হিউমিনিটি ফার্স্ট। এছাড়াও বসনিয়া, নাইজার, নাইজেরিয়া ও সিরিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা যখন জাতিগত সহিংসতায় বিপর্যস্থ তখন হিউমিনিটি ফ্রার্স্ট তাদের পাশেও গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি অতি সাম্প্রতিক রোহিঙ্গাদের ব্যাপক খাদ্য ও চিকিৎসা সাহায্য করা হয়েছে।

### মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা

খাতামান্নাবীঈন, সায়্যেদুল মুরসালিন মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা:)-এর মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা, তাঁর প্রতি যে কোন ধরনের আক্রমন প্রতিহত করা, তাঁর মহান শিক্ষা ও আদর্শকে জগতের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আহমদীয়া খেলাফত সদা সোচ্চার। এ ক্ষেত্রে তাঁরা অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় কাজ করে যাচ্ছেন।

আমাদের দ্বিতীয় খলীফার যুগে মহানবী (সা:)-এর অবমাননা করে ‘রঙ্গিলা রসূল’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখা হয়। হুযূর তখন রসূল (সা.)-এর জীবনী ব্যাপকভাবে আলোচনার জন্য সীরাতুন্নবী (সা.) জলসার প্রবর্তন করেন। ১৭ জুন ১৯২৮ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে সীরাতুন্নবী জলসা উদযাপন করেন।

খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর যুগে সালমান রুশদী ‘সেটানিক ভার্সেস’ নামে এক নোংরা পুস্তক লিখে। হুযূর এর প্রতিবাদে জুমার খুতবা প্রদান করেন, পুস্তক লিখেন। পুস্তকে দাতভাঙ্গা জবাব দেন।

খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুগে ২০০৬ সালে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট রসূল (সা.)-কে কটাক্ষ করেন। একই বছর ডেনমার্কের একজন কার্টুনিষ্ট রসূল (সা.) নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র লিখে। হুযূর (আই.)-এর প্রেক্ষিতে ৫ টি জুমআর খুতবা প্রদান করেন। আহমদীদের সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলোতে গণসংযোগ করতে, প্রবন্ধ লিখতে নির্দেশ দেন। ডেনমার্কের মুবাল্লেগ সাহেব ঐ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে পাঠান। প্রবন্ধ ছাপা হয়। পরবর্তীতে মোবাল্লেগ সাহেবকে সাংবাদিকদের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রন জানানো হয়। তিনি সেখানে তাঁর জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন। কার্টুনিষ্ট বলতে বাধ্য হয়, এমন আলোচনা পূর্বে হলে আমি কার্টুন লিখতাম না।

২০১২ সালে the innocence of muslims নামে একটি নোংরা সিনেমা বানানো হয়। হুযূর ২১ সেপ্টেম্বর তাঁর জুমআর খুতবায় এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। বিভিন্ন গণমাধ্যমে এর প্রতিবাদ করেন। হুযূর আহমদীদেরকে রসূল (সা:)- এর আর্দশ বেশি বেশি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার আহবান জানান।

### খেলাফতে আহমদীয়া আমাদের জন্য এক নিরাপদ ও সুরক্ষিত দূর্গ

খেলাফতে আহমদীয়া আমাদের জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়, এক সুরক্ষিত দূর্গ। মুরগী যেমন বিপদের সময় মা মুরগীর ডানার নিচে আশ্রয় দিয়ে তার বাচ্চাদের সুরক্ষিত রাখে, তেমনি খেলাফতে আহমদীয়ার ছায়া তলে আমরা প্রতিটি কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদেও সুরক্ষিত রয়েছি।

১৯১৪ ও ১৯৩৯-৪৫ সালে দুটি বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষের প্রাণহানী ও ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে। কিন্তু আমরা আহমদীরা সুরক্ষিত রয়েছি। জাতি জাতিতে, দেশে দেশে বিশ্বের কোন না কোন স্থানে সংঘর্ষ, যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই রয়েছে। আহমদীরা এসবের মধ্যেও নিরাপদ রয়েছি। আজ মুসলমানরা ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়া ও পাকিস্তানে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ করে মরছে। অপরদিকে পশ্চিমাদের কাছে টেরোরিষ্ট হিসেবে চিহ্নিত হয়ে মার খাচ্ছে। কোথায়ও তাদের শান্তি নাই। কিন্তু আমরা সব জায়গায় নিরাপদ রয়েছি।

অপরদিকে আহমদীয়াতের শত্রুরাও নিরবে বসে নেই। তারা অবিরাম আহমদীয়াতের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। ১৯৩৪ সালে মজলিসে আহরার, ১৯৫৩ সালে মওদুদীর নেতৃত্বে জামাতে ইসলামী আমাদের মিটানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। ১৯৭৪ সালে জুলফিকার আলী ভূট্টো, ১৯৮৪ সালে জেনারেল জিয়াউল হকও জামাতকে ধ্বংস করার শেষ চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্রীয় শক্তি ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছে। কিন্তু এরপরও তারা ব্যর্থ হয়েছে। খেলাফতের গায়ে আঁচ পর্যন্ত লাগাতে পারেনি। আহমদীয়া জামাতের অগ্রগতিকে থামাতে পারেনি।

### খলীফা দোয়ার এক জীবন্ত ভান্ডার

খলীফা আমাদের জন্য দোয়ার এক মূর্তমান, অফূরন্ত ও জীবন্ত ভান্ডার। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন–

“তোমাদের জন্য একজন আছেন, যিনি তোমাদের ব্যথা হৃদয়ে রাখেন। তোমাদের ভালোবাসেন, তোমাদের দুঃখ বোঝেন। তোমাদের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করেন। তোমাদের চিন্তায় তিনি অস্থির থাকেন। তোমাদের কষ্ট দূর করার জন্য তিনি আপন প্রভুর সমীপে ছটফট করতে থাকেন।” (বারাকাতে খেলাফত, আনওয়ারুল উলুম, খ. ২, পৃ. ১৫৬)

চৌধুরী হাকীম দীন সাহেব বর্ননা করেন। আমার স্ত্রী তার প্রথম বাচ্চা জন্মের সময় খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। ঐ কষ্টকর

পরিস্থিতিতে রাত ১২টার সময় আমি খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর বাসায় গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ি। শব্দ শুনে হুযূর জিজ্ঞেস করলেন কে? আমি অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে পুরো ঘটনা বলি ও দোয়ার আবেদন করি। হুযূর তৎক্ষনাৎ উঠে গেলেন। ভেতর থেকে একটি খেজুর আনলেন, দোয়া করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এটা তোমার স্ত্রীকে খাওয়াবে। বাচ্চা যখন হবে তখন আমাকে জানাবে। তিনি বলেন, আমি ফেরত এসে স্ত্রীকে খেজুর খাইয়ে দেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাচ্চা হয়ে যায়। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। আমি ভাবলাম, এত রাত হয়েছে এখন হুযূরকে গিয়ে জাগানো ঠিক হবে না। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ফজরের নামাজের সময় উপস্থিত হয়ে হুযূরকে সংবাদ দেই। হুযূর বলেন– মিয়া হাকীম দীন! তুমি তোমার স্ত্রীকে খেজুর খাইয়ে দিয়েছ, তোমার স্ত্রীর বাচ্চা প্রসব হয়ে গেছে। তোমরা দুজন আরামে ঘুমিয়ে গেছ। আমাকে যদি সংবাদ পাঠাতে তাহলে আমিও আরামে ঘুমাতে পারতাম। আমি তো সারা রাত জেগে তোমার স্ত্রীর জন্য দোয়া করেছি।"

**আমাদের খলিফা সমগ্র জগতের আস্থাবান নেতা**

আল্লাহর খলিফারা কেমন হয়ে থাকেন দেখুন। তারা সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যানের উৎস হন। মুসলিম অমুসলিম সবার আশা আকাঙ্খার কেন্দ্রস্থল হন। সবার আরাধনার বস্তু হন। শান্তির দূত হন। তারা যেখানে যান সেখানে শান্তির বাণী নিয়ে যান। খেলাফতের ছায়া পেলে মুসলিম অমুসলিম সবাই স্বস্থি পায়, আনন্দিত হয়। হাত তোলে খোদার কাছে, ঈশ্বরের কাছে তার উন্নতি কামনা করে তার জন্য মন উজার করে দোয়া করে।

আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে খেলাফতে রাশেদার যুগ দেখুন– বিদ্রোহ, উস্কানী ইত্যাদির কারণে হযরত উমর (রা.)এর যুগে পারস্যে অভিযান প্রেরণ করতে হয়েছিল। সেনাপতি একটা বিশাল অংশ দখল করার পর হযরত উমরকে বার্তা পাঠালেন আমাদের সামনে একটি নদী রয়েছে। আপনি অনুমতি দিলে নদী পার হয়ে বাকি অংশটাও জয় করে নিতে পারি। হযরত উমর বলে পাঠালেন আর নয়। এই নদী যেন আমার আর পারস্যবাসীদের মাঝে আগুনের প্রাচীররূপে বাধার কারণ হয়ে দাড়ায়। আমরা আর দখল চাই না, আমরা মানুষের রক্ত চাই না, আমরা শান্তি চাই।

আরেকবার ফিলিস্তিনে যুদ্ধ হচ্ছে। শত্রুপক্ষ খৃষ্টানরা কেল্লার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছে। পরাজিত করা যাচ্ছিল না। তারা সংবাদ পাঠালো আমরা আত্মসর্মপন করবো যদি খলিফা উমর নিজে আসেন। সংবাদ পেয়ে খলিফা ছুটে আসলেন। রক্তপাতহীন বিজয়ের পথটাকে বেছে নিলেন।

নামাযের সময় হলে খৃষ্টানরা তাকে তখন তাদের হেকেলে সুলায়মান অর্থাৎ টেম্পলের ভিতরে নামায পড়তে বলে। তিনি সেখানে পড়েননি। বরং তিনি এর চারপাশের বাউন্ডারীরও বাহিরের একটি জায়গা যেখানে ময়লা ফেলা হতো সেটা পরিস্কার করান এবং সেখানে নামায় পড়েন। তার ভয় ছিল এখন আমি এখানে নামায় পড়লে পরে মুসলমানরা এই অজুহাত দিয়ে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ বানিয়ে ফেলবে। আর তার এ আশংকা পরে সত্যি হয়েছে। তিনি যেখানে নামায পড়েছেন সেখানে মসজিদে উমর নামে একটি মসজিদ বানানো হয়েছে। যেটির অবস্থান হেকেলের প্রাচীর ঘেষে।

হযরত উমরের যুগে জেরুজালেমেরই একটি এলাকা ছেড়ে মুসলমানদেরকে চলে আসতে হয়। তখন উমরের নির্দেশে তাদের নিরাপত্তার জন্য যে জিজিয়া কর নেয়া হয়েছিল। এটা ফেরৎ দেয়া হয়। তারা খৃষ্টান ছিল। তারা জিজ্ঞেস করে এ টাকা কেন ফেরৎ দিচ্চ? বলা হলো- আমরা এ শর্তে টাকা নিয়েছিলাম তোমাদের নিরাপত্তা দিব। কিন্তু এখন যেহেতু তোমাদের নিরাপত্তা দিতে পারছি না তাই আমাদের খলিফার নিদের্শে এটা আমরা ফেরৎ দিচ্ছি। তারা অবাক হলো- কোন বাদশা টাকা নিলে ফেরৎ দেয় এটা তো দেখিনি। এমনকি আমাদের স্বজাতির লোকেরা এটা কখনও করে না। তখন আবেগে তারা কাদলো। আর হাত তোলে দোয়া করলো। হে ঈশ্বর! তুমি এদের মঙ্গল কর। এদের মত শাসককে তুমি অচিরেই আমাদের মাঝে ফিরিয়ে নিয়ে আস।

ইসলামের খলিফার, আল্লাহর মনোনিত খলিফার মঙ্গল বিধর্মীরাও চায়। তারা তার উন্নরিতর জন্য দোয়া করে। তারা তার দাসত্ব বরনে আনন্দিত হয়।

এই দৃশ্যটিকে সামনে রাখুন। আর আইসিস এর স্বঘোষিত রক্তপিপাসু খলিফা এবং জামাতে আহমদীয়ার খলিফাকে দেখুন। তাহলে সহজে বুঝতে পারবেন কে আল্লাহর খলিফা?

আবু বকর আল বাগদাদী ও তার বাহিনী যেখানে যাচ্ছে রক্তের বন্যা বহাচ্ছে। ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। লাইন ধরে দাড় করিয়ে পুরুষ মহিলাকে হত্যা করছে। পুরিয়ে মারছে। দেশান্তরিত করছে। মহিলাদের উপর পাশবিক নির্যাতন করছে। ফলে স্বজাতি বিজাতী সব মানুষ তাদের ধিক্কার জানাচ্ছে। তাদের ধ্বংস কামনা করছে। ধ্বংস করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সবাই বিশ্বশান্তির জন্য তাদেরকে হুমকি মনে করছে।

পক্ষান্তকে আহমদীয়া খেলাফতের বিষয়টি দেখুন- প্রাশ্চাত্য যারা সারা বিশ্ব নিয়ন্ত্রন করে। যারা সারা বিশ্বের পলিসি মেকার-নীতি নির্ধারক। যারা তৃতীয় বিশ্বের লোকদের মানুষই মনে করে না। যারা নিজেদেরকে পৃথিবীর হর্তা কর্তা মনে করে। তারা অর্থাৎ এই পশ্চিমা জগত যখন অর্থনৈতিক মন্দায় জর্জরিত হয়ে এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়ে অথবা এই সন্ত্রাসের শিকার হয়ে, বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। পরিস্থিতি দিনদিন শুধু খারাপই হচ্ছে। তারা এ থেকে মুক্তির পথ খুজে পাচ্ছে না। তখন এই অবস্থা থেকে নিজেদেরকে উত্তরনের জন্য, মুক্তির জন্য কি শিক্ষা হওয়া দরকার? কি নীতি হওয়া দরকার?

কি প্রদক্ষেপ নেয়া দরকার। এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা লাভের জন্য-তারা আমাদের প্রাণপ্রিয় খলিফা হযরত মাসরুর আহমদ (আই.)-কে রাষ্ট্রীয় সম্মান দিয়ে, তারা তাদের পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখার আমন্ত্রন জানিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে হুযূর (আই.) গত ৩০ মে ২০১২ সনে জার্মানীর মিলিটারী হেডকোয়াটারে , ২৭ জুন ২০১২ সনে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হিলে, ৪ ডিসেম্বর ২০১২ সনে ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টে ৩০টি দেশের ৩৫০জন সদস্যের উপস্থিতিতে এবং ১১জুন ২০১৩ সনে যুক্তরাজ্যের হাউজ অপ পার্লামেন্টে বক্তব্য রেখেছেন।

হুযূর তাঁর বক্তব্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও জোরালো ভাবে তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে তাদের ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ নীতিগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রাশ্চাত্যের ডাবল স্টেন্ডার অর্থাৎ দ্বৈত নীতির কড়া সমালোচনা করেছেন। বিশ্বশান্তির জন্য , তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষাগুলোকে তুলে ধরে এ গুলোকে গ্রহন করার উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন।

হুযূরের বক্তৃতা চলাকালে, বক্তৃতার শেষে তারা করতালী বাজিয়ে উচ্চাস প্রকাশ করেছে। তারা পিনপতন নিরবতায় হুযূরের বক্তব্য মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনেছে। হুযূরের বক্তৃতার শেষে তাদের অভিব্যাক্তি বর্ণনায় তারা হুযূরের বক্তৃতার উচ্ছসিত প্রশংসা করেছে। অকপটে মেনে নিয়ে নিয়েছে-এই বক্তব্যের শিক্ষাই সর্বোত্তম শিক্ষা। এটাই তাদের নীতি হওয়া আবশ্যক। পাশ্চাত্বের মানুষ, মিডিয়া হুযূরকে **'ম্যান অব পিস'** বলে আখ্যায়িত করছে। আজ পাশ্চাত্বের বিভিন্ন শহরের চাবি হুযূরের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

অনেকে মসীহ মাওউদ(আ.)-এর বিশব্যাপী বিজয় দেখতে চায়। প্রশ্ন করে, কোথায় ইমাম মাহদী বিশ্ব বিজয় করলেন। আজ তারা যদি অন্ধ না হন, তাহলে বলছি সামনে তাকান আর দেখেন। আমরা আজ ঐ বিজয়ের মাহিন্দ্রক্ষনে দাড়িয়ে আছি। পশ্চিমা জগত এখনও না মানলেও দ্বেথহীন ভাবে স্বীকার করেছে- আজ ইসলামের খলীফার মত নেতা, ইসলামের শিক্ষার মত আদর্শ তাদের হওয়া উচিত। তাই আমরা বিশ্বাস করি সেই দিন আর বেশি দূরে নয় অতি সন্নিকটে, যেদিন এই স্বীকৃতিই তাদের বিশ্বাসে রূপান্তরিত হবে। তারাও খলীফাকে মেনে নিবে। ইসলামের অনুসারী হবে। খেলাফতের আশীষ ও কল্যাণ তারাও লাভ করবে।

শুরুতে যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি এতে আল্লাহ তালা ঘোষণা দিয়েছেন–

আল্লাহ তালা অঙ্গিকার করেছেন, যারা ঈমান আনয়নকারী হবে, সৎকর্মশীল হবে, তিনি তাদের মাঝে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। এই অঙ্গিকার অনুযায়ী আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে সায়্যেদুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম যাঁদের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তালা বলেছেন–

অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট, আর তারা আল্লাহ প্রতি সন্তুষ্ট, সেই সাহাবাদের মাঝে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আহমদীয়া খেলাফতের সর্বপ্রথম নিয়ামত হল– খিলাফত আমাদের মত অযোগ্য, দুর্বলদেরকে এক বিরল সম্মানে ভূষিত করেছে। আর তা হল আল্লাহর ওয়াদা ছিল– যারা ঈমান আনয়নকারী এবং সৎকর্মশীল হবে তাদের মাঝে তিনি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র আমাদের মধ্যে খিলাফত রয়েছে। তাই এই খেলাফত প্রমান করেছে–

**প্রথমত**, এ যুগে আল্লাহ তালার দৃষ্টিতে আমরাই ঈমান আনয়নকারী ও সৎকর্মশীল।

**দ্বিতীয়ত**, খেলাফত শুধুমাত্র সাহাবীদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর কারো মাঝে ছিল না। বর্তমানে রয়েছে শুধু আমাদের মাঝে। তাই আমাদের মাঝে খেলাফত থাকাটা প্রমাণ করে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণা–

অর্থাৎ পরবর্তীতে এমন একটা দল আসবে যারা সাহাবীদের মধ্যে গন্য হবে। নিঃসন্দেহে আমরাই সেই দল। যারা পরে এসেও সাহাবীদের মাঝে গন্য হবার বিরল সম্মানে ভূষিত। আর এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তালার ব্যবহারিক সাক্ষ্য ও সমর্থন আমাদের সপক্ষে বিদ্যমান।

আমি সবশেষে হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। হুযূর (আ.) বলেন– "খোদা আমাকে সম্মোধন করে বলেছেন, 'তোমাদের প্রতি আশিষের পর আশিষ বর্ষণ করা হবে। এমন কি সম্রাটগণ তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ খুজবে।"

# খলীফা আমাদের প্রাণ

**সাব্বির আহমদ (মুত্তাকী)**
(ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া, শেষ বর্ষ )

প্রাণ এমন এক অস্তিত্ব যা ছাড়া কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। তাই একজন মানুষের প্রাণের চেয়ে অধিকতর প্রিয় কিছু নেই। নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য সে সর্বপ্রকার ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, প্রাণের সন্তুষ্টি ও প্রশান্তির জন্য যতটুকু চেষ্টা করা সম্ভব মানুষ করে থাকে। কিন্তু প্রাণ কখনও নিজের সন্তুষ্টি, আরাম আয়েশ সুখ শান্তির কথা চিন্তা করে না, বরং নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিলিয়ে দেয়। এরূপভাবে যুগ খলীফা আমাদের প্রিয় ইমাম আমাদের প্রাণ, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন, আমাদের সঞ্জীবনী শক্তি। প্রাণ ছাড়া দেহ যেমন নিথর ও নির্জীব তেমনি আজ এক মুহূর্তের জন্যও যদি আমাদের মাঝে খলীফা না থাকে তাহলে জামাতে আহমদীয়ার অবস্থা সেই দেহের ন্যায় হয়ে যাবে যাতে কোন প্রাণ নেই। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এই বিষয়টিই এভাবে তুলে ধরেন : অর্থাৎ 'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি তোমাদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে ডাক দেন।' (সূরা আনফাল ঃ ২৫)

বর্তমানে যুগ খলীফাই হচ্ছেন আল্লাহ্ ও তার রসূলের স্থলাভিষিক্ত আধ্যাত্মিক নেতা। তিনি যখন আমাদেরকে আহ্বান করেন আর এর উত্তরে আমরা লাব্বায়েক বলি– তখন আমরা মৃত অবস্থা থেকে জীবিত হই। তাই খিলাফত আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী এবং আমাদের নিকট প্রাণের চেয়েও প্রিয়। যতদিন আমাদের খেলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক থাকবে ততদিন আমরা সঞ্জীবিত থাকব। সুতরাং খেলাফত নামক প্রাণকে সুরক্ষিত রাখতে আমরা আমাদের শরীরের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও চেষ্টা করে যাব, ইনশাআল্লাহ্। অপরদিকে যিনি খেলাফতের আসনে আসীন থাকেন তিনি তাঁর প্রাণ, চিন্তা-ভাবনা, তার সময়-পরিশ্রম সবকিছু জামাতের জন্য উৎসর্গ করে দেন। মানুষের সুখের জন্য নিজের সুখকে কুরবানী করেন। তিনি নিজের স্ত্রী সন্তান-সন্ততি, পরিবার আত্মীয়-স্বজন, নিজ প্রাণের চেয়েও আমাদেরকে বেশী ভালবাসেন। এখন আমি খলীফাগণের নিজ জামাতের সদস্যদের প্রতি কিরূপ স্নেহ ও ভালবাসা রাখতেন তার কতিপয় দৃষ্টান্ত পেশ করছি:

১। হযরত চৌধুরী হাকেম দ্বীন সাহেব যিনি বোর্ডিং হাউসে একজন সাধারণ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন– "আমার প্রথম সন্তান জন্মের সময় আমার স্ত্রীর প্রসব ব্যাথা অনেক বেড়ে যায়। আমি রাত ১১ টায় কোন উপায় না দেখে হযরত খলীফা নূরুদ্দীন (রা.)-এর বাসায় যাই এবং চৌকিদারকে বলি, আমি কি এখন হযরত সাহেবের সাথে দেখা করতে পারব? চৌকিদার না করে দিল। কিন্তু হুযূর ভেতরে আমার কথা শুনেন এবং আমাকে ভেতরে ডেকে নেন। আমি হুযূরকে আমার স্ত্রীর কষ্টের কথা জানালাম। তিনি একটি খেজুরের মধ্যে দোয়া পড়ে আমাকে দিলেন এবং বললেন, এটি নিয়ে তুমি তোমার স্ত্রীকে খাইয়ে দাও। যখন বাচ্চা হয়ে যাবে আমাকে জানিয়ে যাবে। আমি যেয়ে এটি আমার স্ত্রীকে খাইয়ে দিই। এই খেজুর চমৎকারভাবে আমার স্ত্রীর ওপর প্রভাব ফেলেছে এবং কিছুক্ষণ পর আমার সন্তানের জন্ম হয়। হাকেম দ্বীন সাহেব বলেন, আমি রাতে হুযূরকে ডাকা ঠিক মনে করি নি, হয়ত তিনি ঘুমিয়ে গেছেন। ভোরে আযানের সময় উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা তার খেদমতে পেশ করলাম। তখন হুযূর বললেন, সন্তান জন্ম হওয়ার পর তোমরা স্বামী-স্ত্রী তো শান্তিতে ঘুমিয়েছ, যদি আমাকেও জানাতে তাহলে আমিও আরাম করতে পারতাম, আমি সারা রাত তোমার স্ত্রীর জন্য দোয়া করছিলাম। এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হাকেম দ্বীন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং বলতে লাগলেন, কোথায় চাপরাশি হাকেম দ্বীন আর কোথায় মহান নূরুদ্দীন!

২। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) জামাতের সদস্যদের প্রতি খলীফার ভালবাসা বুঝাতে গিয়ে বলেন, "তোমাদের জন্য এক ব্যক্তি তোমাদের ব্যথা অনুভব করেন, এবং তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করেন এবং তোমাদের দু:খকে নিজের দু:খ মনে করেন এবং তোমাদের জন্য খোদার দরবারে দোয়া করেন এবং তোমাদের জন্য মওলা খোদার দরবারে আকুতি মিনতি করতে থাকেন। হযরত সৈয়দ মেহরাপা বর্ণনা করেন,

"১৯৫৩ সালে বিদ্রোহের সময় শুধুমাত্র আহমদীয়াতের প্রতি শত্রুতার করণে হযরত মির্যা নাযের আহমদ সাহেব এবং হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবকে জেলবন্দী করা হল। প্রচন্ড গরমের দিন ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) গরমের প্রচন্ডতার উল্লেখ করেন এশার সময় আমরা রীতি অনুযায়ী উঠানে বসে রাতের খাবার খাচ্ছিলাম। এমন সময় অচেতন মনে আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়' জানি না, মিঞা নাসের আহমদ সাহেব এবং মিয়া শরীফ আহমদ সাহেবের এই গরমে কি অবস্থা। আল্লাহ্ জানে তাদের জেলে কোন সুযোগ সুবিধা আছে কি নাই।" হযরত মুসলেহ মাওউদ

(রা.) তখন বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা তাদের ওপর কৃপা করুন। তারা শুধু এই দোষে দোষী যে, তাদের কোন দোষ নেই। তাই আমার খোদার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস যে তিনি দ্রুত তাদের ওপর কৃপা করবেন। এরপর আমি দেখি তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং তিনি এশার নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যান। আমি সেই ব্যকুলতা ও আকুতি মিনতির অবস্থা ভুলতে পারব না- যা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এই ব্যকুল দোয়ার মধ্যে অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল। এই দৃশ্য আমি তাহাজ্জুদেও দেখি। সেই সময় তিনি উচ্চস্বরে অত্যন্ত কোমলতার সাথে আকুতি মিনতি ভরে দোয়া করেছেন। এরপর দিনের শুরুতেই ডাক আসার সময় হল এবং সর্বপ্রথম যে টেলিগ্রাম ছিল তাতে এই খবর ছিল যে, হযরত মিঞা নাসের আহমদ সাহেব এবং মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব মুক্তি পেয়েছেন।"

৩। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, "রাবওয়াতে আমার কাছে এক ব্যক্তির চিঠি পৌঁছে যে, তার দুই আত্মীয়ের মৃত্যুর ফয়সালা শুনানো হয়েছে। প্রকৃত দোষী বেঁচে গেছে আর আমাদের যারা দোষী নয় তারা শাস্তি পাচ্ছে। হাইকোর্ট এবং সুপ্রিমকোর্টও মৃত্যুর সাজা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বাহ্যত বাঁচার কোন সম্ভবনা নেই। এখন আমরা ক্ষমার জন্য আপিল করছি। আপনি দোয়া করুন। তখন আমি তাকে লিখলাম, আমি দোয়া করব। খোদা তা'লা সর্বশক্তিমান এবং দয়ালু। তাঁর কাছে কোন বিষয় অসম্ভব নয়। নিরাশা হয়ো না। কিছুদিন পর এই ব্যক্তির চিঠি আসে যে, খোদার ফযলে আদালত তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দেয়।

৪। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) পাকিস্তান থেকে লন্ডনে হিজরতের পূর্বে জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে এক সভায় বলেন, আমি আপনাদের এজন্য এখানে বসাই নি যে, আমি আপনাদের সামনে বক্তৃতা করব বরং আমি আপনাদেরকে দেখার জন্য এখানে বসিয়েছি। আমার চোখ আপনাদেরকে দেখে স্নিগ্ধতা লাভ করে, আমার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে, আপনাদের প্রতি আমার যে প্রেম ও ভালবাস আছে, খোদার কসম! কোন মা'রও তার সন্তানের প্রতি এমন ভালবাসা থাকতে পারে না। খলীফাগণের এমন ঘটনা অজস্র যার একশ ভাগের এক ভাগও এখনে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

৫। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর এমন ভালবাসা ও স্নেহের ঘটনাও অগণিত। ২০১০ সালের ২৮ মে লাহোরের দু'টি আহমদী মসজিদে একযোগে হামলা হয়। যার ফলে ৮৫ জন আহমদী সদস্য শাহাদত বরণ করেন এবং বহু আহমদী মর্মান্তিকভাবে আহত হন। আমাদের প্রিয় হুযূর লন্ডনে থেকে তাদের জন্য এতটা ব্যথা অনুভব করেন যে, তিনি প্রত্যেক শহিদ আহমদী পরিবারে টেলিফোন করে তাদের সান্তনা প্রদান করেন এবং তাদের ধৈর্য্যের জন্য দোয়া করেন আর যারা আহত হয়েছিলেন তাদের খোঁজ খবর নেন, তাদের প্রয়োজনীয়তার খবর নিয়ে সমাধানের ব্যবস্থা করেন। সেই আহমদী সদস্যদের প্রতি হুযূরের স্নেহ ও ভালবাসা এতই প্রকট ছিল যে, এক শিশু তো তার পিতাকে বলেই ফেলে–"আব্বু তুমিও যদি শহীদ হতে তাহলে হুযূর আমাদের বাসায় ফোন করতেন।"

অনেক মানুষ তাদের সমস্যার কথা জানিয়ে হুযূরকে লিখলে হুযূর তাদের জন্য খাসভাবে দোয়া করেন এবং চিঠির উত্তরে আস্বস্ত করেন। একবার এক ব্যক্তি লিখে আমার স্ত্রী যখনই সন্তান সম্ভবা হয়, কোন রোগের কারণে সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। তিনবার এমন হয়েছে। হুযূর বলেন, আগে বললেই এই বাচ্চাটিও নষ্ট হত না। ভবিষ্যতে গর্ভে সন্তান এলে আমাকে দ্রুত জানাবে। পরবর্তীতে সন্তান সম্ভবা হলে তিনি ফোনে হুযূরকে জানান। হুযূর বলেন, খুব ভাল করেছ জানিয়েছ, ইনশাআল্লাহ্ এবার বাচ্চা নষ্ট হবে না। এরপর সুস্থ ও সুন্দরভাবে সন্তান জন্ম নিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

খলীফাগণের আমাদের প্রতি এমন অকৃত্রিম ভালবাসা আমাদের কাছে এই দাবী রাখে– আমরাও যেন খলীফাগণকে এমন ভালবাসি, এবং খলীফার পরিপূর্ণ আনুগত্য করি। খলীফাগণের আমাদের কষ্টে ব্যথিত হওয়া আমাদের কাছে দাবী রাখে– আমরা যেন খলীফার আশা আকাঙ্খা, ইচ্ছাকে পূর্ণ করি। খলীফাগণের আমাদের জন্য অবিরত দোয়া আমাদের কাছে এই দাবী রাখে– আমরা যেন খলীফার জন্য সদা-সর্বদা দোয়া করি। খলীফাগণের আমাদের জন্য ব্যকুলতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়া আমাদেরকে শেখায় আমরা যেন মনে প্রাণে খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকি, খলীফার কথা শুনা ও মানার জন্য ব্যকুল ও অস্থির হয়ে যাই, নিষ্ঠা প্রদর্শন করি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতে আহমদীয়ার সদস্য/সদস্যারা খলীফার প্রতি নিজেদের ভালবাসা, ব্যকুলতা ও নিষ্ঠার প্রমাণ দিয়েছে। এখনও দিয়ে যাচ্ছে এবং এ ধরণের ঘটনাও সারা বিশ্বে প্রতিনিয়ত অহরহ ঘটছে। এর মধ্য থেকে দু-একটি আপনাদের সামনে পেশ করছি। এসব ঘটনা আমাদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক ও অনুসরণীয়।

১। একবার কানাডা সফরে কানাডার সদস্য সদস্যাদের হুযূর (আই.) এর সাথে মুলাকাতের জন্য সময় নির্ধারিত ছিল। নির্ধারিত সময়ের ১ ঘন্টা পূর্বেই প্রায় ৫০০০ আহমদী সদস্য/সদস্যা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে গেল। হঠাৎ আকাশে মেঘ জমল এবং বৃষ্টি শুরু হল। তারা যখন হুযূরের সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছিল তখন তাদের সারা শরীর ভিজে গিয়েছিল। ঠান্ডায় তাদের শরীর কাঁপছিল এবং ঠোট নীলাভ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খেলাফতের সাথে অসাধারণ ভালবাসার কারণে তাদের না বৃষ্টির ভয় ছিল, না ছিল ঠান্ডা লাগার ভয়। ভয় তো শুধু এতটুকু ছিল যে, মুসাফার সময়ে তাদের ভেজা হাতের কারণে না জানি আবার হুযূরের ঠান্ডা লেগে যায়।

২। খলীফা খামেস (আই.) যখন উগান্ডা সফরে যান, এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করে এয়ারপোর্ট থেকে গাড়িতে করে বের হন। তখন এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটছিলেন। মা একটু পর পর বাচ্চার মুখ হুযূরের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন আর দৌড়াচ্ছিলেন। ভীড়ের কারণে অনেকের

সাথে ধাক্কা লাগছিল, কিন্ত মা অস্থিরভাবে দৌড়াচ্ছেন। অবশেষে বাচ্চার চোখ যখন হুযূরের চেহারার ওপর পড়ল তখন সে হেসে উঠে এবং হাত নাড়ায়। তখন মাও প্রশান্তি লাভ করেন। হুযূরও এ বিষয়টি লক্ষ্য করেন। পরবর্তীতে তিনি তার বক্তৃতায় ঘটনাটি উল্লেখ করে বলেন, যতদিন পর্যন্ত জামাতে আহমদীয়ায় এমন মা সৃষ্টি হবে যাদের কোলে খলীফা প্রেমিক এমন সন্তান জন্ম নিবে ততদিন পর্যন্ত খেলাফতের কোন বিপদ হবে না।

৩। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) লন্ডনে হিজরত করে যাওয়ার কিছুদিন পর এক মহিলা লন্ডন যাওয়ার জন্য ভিসার আবেদন করেন। ভিসা অফিসার তাকে লন্ডনে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সেখানে আমার ইমাম আছে, আমি আমার ইমামকে দেখতে যেতে চাই। আনুসঙ্গিক আরো কথা বলার পর অফিসার আবার তাকে জিজ্ঞেস করে সেখানে তোমার কোন আত্মীয় আছে কি? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ আমার ছেলে আছে। অফিসার বলল, এটি কেন বলছ না যে, আমার ছেলেকে দেখতে যেতে চাই। তখন তিনি তৎক্ষণাৎ আবেগতাড়িত হয়ে রাগস্বরে বলে উঠেন যে, আমার ছেলে সেখানে ত্রিশ বছর ধরে আছে, কোন দিন সেদিকে ফিরেও তাকাই নি। এখন আমার ইমাম সেখানে গেছে,

তাই আমার হৃদয় সেখানে যাওয়ার জন্য ব্যকুল হয়ে আছে।

এ ধরণের বহু ঘটনা আছে যারা শুধুমাত্র খলীফাকে এক নজর দর্শনের জন্য হাজার হাজার মাইল দূর থেকে, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে লন্ডনে যাচ্ছেন। এগুলো খলীফার প্রতি ভালবাসা নয় তো আর কি?

৪। ১৯৪৭ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর আদেশে অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় ৩১৩ জন নওজোয়ান নিজেদের জীবনের বাজি রেখে কাদিয়ানে থেকে গিয়েছিলেন যাদেরকে আমরা দরবেশ বলে সম্বোধন করে থাকি। তারা খেলাফতের সন্তুষ্টির জন্য পূর্ণ এতায়াত প্রদর্শনের খাতিরে নিজেদের জীবন কুরবানী দিতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন।

৫। ১৯২৩ সালে ভারতের মালাকানা এলাকায় মুসলমানদের হিন্দু বানানোর প্রোপাগান্ডা চলছিল। খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) সেই সময় আহমদীদেরকে নিজ খরচে সেই এলাকায় যাওয়ার এবং মুরতাদদের ইসলামে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনার তাহরীক করেন। এই তাহরীক অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের সাত শত আহমদী সেখানে যেয়ে তবলীগের কাজ করতে থাকেন। একজন বৃদ্ধ বাঙ্গালী যুবক ক্বারী নাঈম উদ্দিন সাহেব হুযূর যখন সভায় আসেন অনুমতি নিয়ে বলেন, যদিও আমার পুত্র জিল্লুর রহমান এবং মতিউর রহমান মোয়াল্লেম আমাকে বলেছে যে, 'যাবে না'। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, হুযূর সেখানে যেয়ে নিজ খরচে তবলীগ করার জন্য ওয়াকফে জিন্দেগীর তাহরীক করেছেন এবং সেখানে অবস্থানের যে শর্ত নির্ধারণ করেছেন, হয়ত তাদের এটি মনে হয়েছে যে, যদি তারা হুযূরের খেদমতে নিজেদেরকে পেশ করে তাহলে আমার অর্থাৎ তাদের বৃদ্ধ পিতার কষ্ট হবে। কিন্তু আমি হুযূরের সামনে খোদাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমার তাদের সেখানে যাওয়া এবং কষ্ট করাতে সামান্যতম দু:খ নেই। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি যে, যদি এই দুইজন খোদার পথে কাজ করতে করতে মরেও যায় তাহলে আমি এক ফোটা চোখের পানিও ফেলব না, বরং খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। শুধু এই দুইজনই নয়, আমার তৃতীয় ছেলে মাহবুবুর রহমান যদি ইসলামের খেদমত করতে গিয়ে মারা যায়, এরপর আমার যদি দশ ছেলে হয় আর তারাও যদি মারা যায় তাহলেও আমি কোন দু:খ করব না। (আল ফযল, ১৫ মার্চ, ১৯২৩)

৬। সিরিয়ার একজন আহমদী বন্ধু রাফাত ইউনুস সাহেব জার্মানিতে যখন প্রথমবার খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.)-এর সাথে মুলাকাত হয় তিনি হুযূরের পায়ে পড়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেন। তিনি বার বার এটিই বলেছিলেন যে, আমি হুযূরের সাথে থাকতে চাই। হুযূর (রাহে.) বলেন, বাহ্যিকভাবে তো তুমি সর্বদা আমার সাথে থাকতে পারবে না, তবে এমন একটি পদ্ধতি রয়েছে যার মাধ্যমে তুমি সর্বদা আমার সাথে থাকতে পারবে। আর তা হল, 'সর্বদা খলীফায়ে ওয়াক্তের সকল কথা আনুগত্য কর।'

এ ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মাণ হয় যে, আমরা যদি খলীফাকে অনেক ভালবাসি তাহলে আমাদের খেলাফতের আনুগত্য করতে হবে, তাহলেই আমরা সর্বদা খেলাফতের পাশে থাকতে পারব। যেরূপভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের ফলে অনেক উন্নতি সম্ভব এবং অবাধ্যতার ফলে খোদার ক্রোধের কারণ হয়ে যায়, একইভাবে খলীফায়ে আহমদীয়ার আনুগত্যও আবশ্যক। এখন সর্বপ্রকার উন্নতি ও কল্যাণ খেলাফতে আহমদীয়ার সাথেই সম্পৃক্ত। পৃথিবী আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। এমতাবস্থায় একমাত্র খেলাফতের ছায়াতলে থাকলেই আমরা নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ থাকব। মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) আমাদেরকে এই আদেশই দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর আর পরস্পর বিভক্ত হয়ো না। (আলে ইমরান ঃ ১০৪)

রসূলুল্লাহ্ (সা.) খেলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের আদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন,

অর্থাৎ তোমরা যাদি পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলীফাকে দেখতে পাও তাহলে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হও যদি তোমাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত করা হয় এবং তোমাদের ধন সম্পদ লুট করা হয়। (মুসনাদ আহমদ হাম্বল)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছেন,– "খেলাফত শব্দের অর্থ হল, যখনই খলীফার মুখ থেকে কোন শব্দ বের হয় তখন অন্য সকল স্কীম, সকল প্রস্তাব ও সকল পরিকল্পনা পরিত্যাগ করা হোক এবং এটি মনে করা হোক যে, এখন এই স্কীম, এই প্রস্তাব এবং এই পরিকল্পনাই কল্যাণকর যা খলীফায়ে ওয়াক্তের পক্ষ থেকে আদেশ করা হয়েছে।" আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে খেলাফতের সাথে পরিপূর্ণভাবে সম্পৃক্ত থাকার এবং খলীফার পূর্ণ আনুগত্য করার তৌফিক দান করুন। ওয়া আখিরু দাওনা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

# সুস্থ্যভাবে বাঁচার বিজ্ঞান ভিত্তিক কার্যকর উপায়
# শুধু রমযানের ফরয রোযাই নয় নফল রোযাও কল্যাণকর
# হুযূর (আই.) নির্দেশিত সাপ্তাহিক নফলও নিষ্ঠার সাথে পালন করা উচিত

হিন্দু বা বৌদ্ধরা না খেয়ে থাকলে তাকে বলা হয় 'উপবাস'। মুসলিমরা রোযা রাখলে তাকে বলা হয় 'সিয়াম'।

খ্রিস্টানরা না খেয়ে থাকলে তাকে বলা হয় 'ফাস্টিং'।

বিপ্লবীরা না খেয়ে থাকলে তাকে বলা হয় 'অনশন'।

আর মেডিক্যাল সাইন্সে উপবাস করলে তাকে বলা হয় ' অটোফেজি'। খুব বেশি দিন হয় নি, মেডিক্যাল সাইন্স 'অটোফেজি'র সাথে পরিচিত হয়েছে।

২০১৬ সালে নোবেল কমিটি জাপানের ডাক্তার 'ওশিনরি ওসুমি'-কে অটোফেজি আবিষ্কারের জন্যে পুরষ্কার দেন। এরপর থেকে আধুনিক মানুষেরা ব্যাপকভাবে উপবাস করতে শুরু করেছে।

যাই হোক, 'Autophagy' কি.? এবার তাই বলি। Autophagy শব্দটি একটি গ্রিক শব্দ। Auto অর্থ নিজে নিজে এবং Phagy অর্থ খাওয়া। সুতরাং, অটোফেজি মানে নিজেই নিজেকে খাওয়া।

না, মেডিক্যাল সাইন্স নিজের মাংস নিজেকে খেতে বলে না। শরীরের কোষগুলো বাইরে থেকে কোনো খাবার না পেয়ে নিজেই যখন নিজের অসুস্থ কোষগুলো খেতে শুরু করে, তখন মেডিক্যাল সাইন্সের ভাষায় তাকেই বলা হয় 'অটোফেজি'।

আরেকটু সহজভাবে বলি?

আমাদের ঘরে যেমন ডাস্টবিন থাকে, অথবা আমাদের কম্পিউটারে যেমন 'রিসাইকেল বিন' থাকে, তেমনি আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষের মাঝেও একটি করে ডাস্টবিন আছে। সারা বছরধরে শরীরের কোষগুলো খুব ব্যস্ত থাকার কারণে, ডাস্টবিন পরিষ্কার করার সময় পায় না। ফলে, কোষগুলোতে অনেক আবর্জনা ও ময়লা জমে যায়।

শরীরের কোষগুলো যদি নিয়মিত তাদের ডাস্টবিন পরিষ্কার করতে না পারে, তাহলে কোষগুলো একসময় নিষ্ক্রিয় হয়ে শরীরে বিভিন্ন প্রকারের রোগের প্রদুর্ভাব ঘটায়। ভয়াবহ জীবননাশী ক্যান্সার আর ডায়াবেটিসের মতন অনেক বড় বড় রোগের শুরু হয় এখান থেকেই।

তবে মানুষ যখন খালি পেটে থাকে, তখন শরীরের কোষগুলো অনেকটা বেকার হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা তো আর আমাদের মত অলস হয়ে বসে থাকে না, তাই প্রতিটি কোষ তার ভিতরের আবর্জনা ও ময়লাগুলো পরিষ্কার করতে শুরু করে দেয়। কোষগুলোর আমাদের মতন আবর্জনা ফেলার জায়গা নেই বলে তারা নিজের আবর্জনা নিজেই খেয়ে ফেলে। মেডিক্যাল সাইন্সে এই পদ্ধতিকে 'অটোফেজি' বলা হয়।

শুধুমাত্র শারীরবৃত্তীয় এই জৈবনিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতি আবিষ্কার করেই জাপানের চিকিৎসা বিজ্ঞানী ওশিনরি ওসুমি (Yoshinori Ohsumi) ২০১৬ সালে নোবেল পুরস্কারটা নিয়ে গেলেন।

বিজ্ঞানভিত্তিক এই তথ্যটি জানার পর নিজের ধর্ম অনুযায়ী, মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণে আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নমুনা অনুকরণে ফরয ও নফল আদায়ের পাশাপাশি হুযূর (আই.) নির্দেশিত সাপ্তাহিক নফল পালনে আমরা আরো বেশী যত্নবান থাকব।

এতে করে পূণ্যার্জন যেমন হবে, তেমনই দেহ-মন তারুণ্যের সজীবতায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। ইনশা'আল্লাহ্!

**যুবায়ের সৈয়দ মহিউদ্দীন আহমদ**
সেক্রেটারী তরবীয়ত
এল. ডব্লিও মর্ডেন জামা'ত, লণ্ডন

# ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে

## হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর পাকিস্তান থেকে যুক্তরাজ্যে হিজরত

## অসাধারণ কল্যাণমণ্ডিত এক ঐশী-পরিকল্পনা

**মোহাম্মদ ফজলুর রহমান**

জামাতের কার্যক্রমে স্বাচ্ছন্দ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর এমন একটি দেশ থেকে প্রস্থান, যেটা এককালে ছিল খিলাফতের আবাসভূমি।

সেই দেশ থেকে ভিন্ন দেশে সফরের নিমিত্তে হুযূও (রাহে.)- কে আমরা চূড়ান্ত এক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখবো, যেটা ইতিহাসের গতিপথকে বদলে দিয়েছে। আমরা ফিরে তাকাবো ১৯৮৪ সনের এপ্রিলের ঘটনাপ্রবাহের দিকে, যখন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) হযরত মির্যা তাহের আহমদ সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যেটা জামাতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। পাকিস্তানের রাবওয়া থেকে যুক্তরাজ্যের লন্ডন পর্যন্ত তার (রাহে.) যে হিজরত, সেটা ততটা সহজ ছিল না, যতটা আজ মনে করা হয়। এ পর্যায়ে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ এর মোকাবিলাই করতে হয়েছে, যা কেবল তার (রাহে.) পরিবারের জন্যেই ছিল না, বরং তা ছিল সমগ্র জামাতের কল্যাণার্থে। হুযূর (রাহে.)-এর হিজরতে যাত্রাকালীন সেসব কঠোর পরিস্থিতির প্রতি আমরা ফিরে তাকানোর প্রয়াস নেব আর সংঘটিত ঘটনাগুলোর ক্রমধারা সংক্ষেপে তুলে ধরবো।

### একটি কালানুক্রমিক বর্ণনা

**২৬ এপ্রিল ১৯৮৪:**

পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যে পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তেজনাপূর্ণ হতে থাকে। এ পরিস্থিতির পরিমাণ নিরূপন করা হয় এবং এ উদ্দেশ্যে বেশ ক'টি সভা করা হয়। এর আগের দিন কলিমুল্লাহ্ খান সাহেব অত্যাসন্ন অর্ডিন্যান্স ২০ সম্পর্কে জানতে পান এবং এদিন রাবওয়া পৌঁছে যান আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র সাথে মিলিত হয়ে পরামর্শকবৃন্দের কাছে পরিস্থিতি বর্ণনা করেন।

* হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কলিমুল্লাহ্ সাহেবকে লাহোর যেতে নির্দেশ দেন এবং এ বিষয়ে লাহোর জামাতে আহমদীয়ার আমীর চৌধুর হামিদ নসরুল্লাহ্ সাহেবের সাথে আলাপ করেন।

* চৌধুরী হামিদ নসরুল্লাহ্ সাহেব আহমদী আইনজীবিদেরকে নিয়ে একটি সভা করেন এবং পরের দিন তারা তাদের রিপোর্ট পেশ করেন।

* অর্ডিন্যান্স-২০ জারি হচ্ছে মর্মে ঘোষণাটি রেডিও পাকিস্তানের সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সংবাদ বুলেটিন-এ প্রচার করা হয়।

* এতে রাবওয়ায় এক জরুরী পরামর্শ-সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেটা গভীর রাত পর্যন্ত চলে।

**২৭ এপ্রিল ১৯৮৪:**

পাকিস্তানের বিভিন্ন জামাত থেকে প্রতিনিধিবৃন্দ রাবওয়া পৌঁছতে থাকে, বিভিন্ন কমিটি ও সাব-কমিটিতে বিভক্ত হয়ে যারা আলোচনা চালাতে থাকে। মির্যা মোবারক আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটিটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর হিজরতের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে।

* কমিটি হুযূর (রাহে.)-এর পাকিস্তান থেকে হিজরত করার সুপারিশ পেশ করে।

* হুযূর (রাহে.) এ কারণে এ সুপারিশটি গ্রহণ করেন যে, এই অর্ডিন্যান্সটির উপস্থিতিতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

* তখনকার উকিলুত তবশীর মাসউদ ঝেলামি সাহেব হুযূর (রাহে.) এর সফরের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে তাৎক্ষণিকভাবে করাচী গমন করেন।

রাবওয়া থেকে করাচী সড়কপথে যাত্রার মানচিত্র

**২৮ এপ্রিল ১৯৮৪:**

* কমিটিতে হুযূর (রাহে.)-এর হিজরতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়।

* ব্রিগেডিয়ার ওয়াকিউজ্জামান সাহেব সফরের ব্যবস্থাটির দেখাশুনা করেন।

* মাসউদ ঝেলামী সাহেব হুযূর (রাহে.) এর বিমান-ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন আর চৌধুরী নসরুল্লাহ্ সাহেব রাবওয়া থেকে করাচী ভ্রমণে মোটরগাড়ী ও এর চালকের

ব্যবস্থা করেন। করাচী জামাতের আমীর চৌধুরী আহমদ মুখতার সাহেবকে করাচী থেকে প্রস্থানের ব্যবস্থাপনা দেখাশুনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

* ব্রিগেডিয়ার ওয়াকিউজ্জামান এবং চৌধুরী হামিদ নসরুল্লাহ্ সাহেবকে লন্ডন পর্যন্ত হুযূর (রাহে.)-র সফরসঙ্গী হবার নির্দেশ দান করা হয়।

* একই দিন বিকালে চৌধুরী আহমদ মুখতার সাহেব করাচী গমন করেন এবং সাখ্‌খার (পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের সংযোগ-সীমানা) থেকে সড়কপথে পরবর্তী যাত্রাপথ, পথিমধ্যে বিরতি, ইত্যাদি বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্যে একটি সভা করেন।

* করাচীতে হুযূর (রাহে.) এর সাময়িক বিরতিকালে অবস্থানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পড়ে জারতাস্ত মুনির খান সাহেব (তদানিন্তন কায়েদ, ম.খো.আ. করাচী) এর ওপর আর করাচী বিমান বন্দরে ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দেয়া হয় রাজা শহীদ আহমদ এবং রাজা নাসির আহমদ সাহেবদ্বয়ের ওপর।

* লাহোর থেকে ড্রাইভারবৃন্দ তাদের স্ব স্ব গাড়ীসহ এসে মির্যা খুরশীদ সাহেব ও মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের বাড়ীতে অবস্থান করে।

* করাচী বিমান বন্দরে যাবার জন্যে হুযূর (রাহে.) নিজ গৃহ (কাসরে খিলাফত) ত্যাগ করে একটি প্রাভেট কারে উঠেন এবং রাত ১১টায় আল বুশরায় (মির্যা হামিদ আহমদ সাহেবের বাড়ী) পৌঁছেন।

* যাত্রীর আসনে উপবিষ্ট মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব সহ এ গাড়ীটি ড্রাইভ করেন মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব আর হুযূর (রাহে.), তার স্ত্রী এবং কনিষ্ঠা দুই কন্যা পিছনের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

* নিজ গৃহ থেকে আলবুশরা পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত এ সফরকালে হুযূর (রাহে.) তার পাগড়ী পরিধান না করে একটি টুপি পড়েন।

* গোপনীয়তাই ছিল প্রধানতম বিষয়, তার সে রাতে তাই গৃহে কে অবস্থান করছে, তা এমনকি মির্যা হামিদ আহমদ সাহেবকেও অবহিত করা হয় নি।

* সেসব দিনে মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব এবং মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের মা সঙ্কটাপন্নভাবে পীড়িত ছিলেন আর তাই ঐ রাতে তাদের বাড়ীর চারপাশে এসব গাড়ীর অস্বাভাবিক সংখ্যায় অবস্থান বাস্তব পরিস্থিতিকে আচ্ছাদিত কওে রেখেছিল; ফলে দর্শক ও পথচারীরা কোন কৌতুহল বোধ করেনি।

* খিলাফতে আহমদীয়া পাকিস্তান থেকে যুক্তরাজ্যে এ ঐতিহাসিক হিজরতটি পরদিন সকালে শুরু হওয়া নির্ধারিত ছিল।

**২৯ এপ্রিল ১৯৮৪:**

খিলাফতে আহমদীয়ার পাকিস্তান থেকে ইংল্যাণ্ডে ঐতিহাসিক এ হিজরতটি শুরু হয় ভোরের আগেই।

* ১ম গাড়ী: সর্দার আব্দুস সামী (লাহোর), মালিক সুলতান হারুন (কোট ফতেহ খান, আটক), শেখ আমীর আহমদ (লাহোর), চৌধুরী ইদ্রিস নসরুল্লাহ্ খান (চালক)।

* ২য় গাড়ী : হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.), হযরত সৈয়দা আছিফা বেগম সাহেবা, হুযূর (রাহে.) এর দুই ছোট কন্যা, চৌধুরী হামিদ নসরুল্লাহ্ খান (চালক)

* ৩য় গাড়ী: ব্রিগেডিয়ার ওয়াকিউজ্জামান, শেখ মুবাশ্বের আহমদ (চালক), শেখ সাঈদ আহমদ, মালীক ফারুক আহমদ, (সহ: চালক)।

৪র্থ গাড়ী: মির্যা খুরশীদ আহমদ (সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার প্রতিনিধি), মির্যা মুজিব আহমদ (চালক), মির্যা লুকমান আহমদ, ফাইজা বেগম, মির্যা উসমান আহমদ।

* মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব যখন হুযূর (রাহে.) সমীপে এ বার্তা প্রেরণ করেন যে যাবার সময় হচ্ছে এটিই, সে সময় হুযূর (রাহে.) তাহাজ্জুদ নামায পড়ছিলেন।

* দশমিনিট পর হুযূর (রাহে.) বাইরে আসেন এবং গাড়ীতে আসন গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সাদা পোশাকে সজ্জিত, একটি ওভার কোট ও টুপি পরিহিত।

* সকাল ৪ ঘটিকায় এ যাত্রীদলটি রাবওয়া ত্যাগ করে। ইতোমধ্যেই চারটি গাড়ীর তিনটিই একযোগে যাত্রা করে সারগোদা রোডের প্রধান সড়কে পূর্ব থেকেই অবস্থান নেয়, আর পথপ্রদর্শক গাড়ীটি গিয়ে ঐ তিনটি গাড়ীর সাথে যুক্ত হলে বহর চলতে শুরু।

* গাড়ীবহরটি সারগোদার দিকে অগ্রসর হয়ে ঠিক লালিয়াঁর আগে বামদিকে মোড় নিয়ে তারখানাওয়ালার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সংকীর্ণ এই রাস্তাটি আরো পড়ে গিয়ে সারগোদা- জং এর রাস্তায় মিলিত হয়।

* এর আগে গাড়ীবহরটি রাবওয়া থাকাকালেই হুযূর (রাহে.) সেনাবাহিনীর একজন গুপ্তচরকে নিঃস্ব ব্যক্তির ছদ্মবেশে দেখতে পান, তবে সে ছিল আর্মির বুটজুতা পরিহিত। লালিয়াঁ ও জং এর মধ্যবর্তী স্থানেও তিনি আরো এমন কয়েকজন গুপ্তচরকে দেখতে পান, বুটজুতার কারণে যাদের চেনা যাচ্ছিল।

* এ দলযাত্রার এক ঘন্টা পর মির্যা মনসুর

আহমদ সাহেব আরেকটি কার পাঠান, যেটাকে এই গাড়ীবহরের পিছনে এক ঘন্টার পথের দুরত্ব রেখে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেয়া হয়।

* শুক্কুরের প্রায় ৮০ মাইল আগে ৪নং গাড়ীর একটি টায়ার ফেটে যায়। এতে এ গাড়ীবরহটি থেমে যায় এবং সে সময় মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব তার সামানের গাড়ীতে উপবিষ্ট হুযূর (রাহে.)-এর কাছ থেকে এ মর্মে এক বার্তা পান যে, রাস্তার পাশের দোকান থেকে যেন হালকা খাবার কেনা হয় আর সেমতে কিছুটা পথ পেরোতেই একটি দোকান থেকে খাবার কেনা হল।

* গাড়ীবহরটি বিকাল আনুমানিক ২ ঘটিকায় শুক্কুর বাইপাছ-এর কাছে দুপুরের খাবার খেতে থেমে যায়। যোহরের নামায এখানেই আদায় করা হয়।

* এস্থলেই করাচী থেকে আগত তিনটি কারের একটি বহর এই গাড়ীবহরের সাথে যুক্ত হয়ে এ বহরটিকে পরিচলনা করে এগিয়ে নিতে থাকে।

* সূর্যাস্তের সময় এ গাড়ীবহরটি করাচী পৌঁছে এবং মালীর টোল প্লাজার কাছে সংক্ষিপ্ত এক বিরতি দেয়। এরপর কিছু আলাপ-আলোচনার পর পুরো গাড়িবহরটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে সেদিকে অগ্রসর হতে থাকে, যেখানে আবাসের ব্যবস্থা করা ছিল।

* হুযূর (রাহে.) এর গাড়ীর সঙ্গী-গাড়ী তিনটি কলিমুল্লাহ্ খান সাহেবের গৃহে যায়, আর অন্যরা প্রতিরক্ষা-এলাকাস্থ শেখ আব্দুল মজিদ সাহেবের বাড়ী যায়।

* এর অব্যবহিত পরেই মাসুদ ঝিলামী সাহেব (ওকীলুত তবশীর) এবং রাজা শহীদ সাহেব যাত্রীদের পাশপোর্টসহ সেগুলোকে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত করতে বিমান বন্দর যান।

* লন্ডনগামী এ ছয়জন যাত্রী বিমান বন্দর পৌঁছার পূর্বেই বিমানে আরোহণের জন্য তাদের পাশপোর্টগুলো প্রস্তুত হয়ে যায় (সে সময় যুক্তরাজ্যে যাওয়ার জন্য ভিসার কোন প্রয়োজন ছিল না)।

* সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে হুযূর (রাহে.)-এর পাসপোর্টটির প্রক্রিয়াকরণ আলাদাভাবে করা হয়। হুযূর (রাহে.)-এর

হুযুর (রাহে.)-কে এল এম এর বিমানে করে করাচী থেকে লন্ডনে যাচ্ছেন

পাসপোর্টটিতে তার পেশা হিসেবে পরিস্কারভাবে "আহমদীয়া জামাতের প্রধান"– কথাটি লিখা ছিল।

* জারতাস্ত মুনির সাহেব, মালিক ফারুক সাহেব এবং মির্যা মুজিব সাহেবও বিমানবন্দর যান।

কর্তব্যরত ইমিগ্রেশন অফিসার হুযূর (রাহে.)-এর পাসপোর্টটি দেখেন, এর সব বর্ণনা পাঠ করেন এবং প্রস্থান- ছাড়পত্র দিয়ে তাতে সীল লাগান।

* ব্রিগেডিয়ার ওয়াকিউজ্জামান সাহেব, চৌধুরী হামিদ নসরুল্লাহ্ সাহেব এবং হুযূর (রাহে.) এর কনিষ্ঠ কন্যাদ্বয় হুযূর (রাহে.) এবং হযরত আছিফা বেগম সাহেবার প্রায় আধঘন্টা পূর্বে বিমান বন্দরে পৌঁছেন।

* হুযূর (রাহে.) এবং হযরত আছিফা বেগম সাহেবা রাত ১.২৫ মিনিটে করাচী বিমান বন্দর পৌঁছেন এবং সরাসরি ভি আই পি লাউঞ্জে যান। বিমানটির উড্ডয়নের সময় ছিল রাত ২.০০ টা।

* হুযূর (রাহে.) তার স্বাভাবিক পোশাক শেরওয়ানী (ওভারকোট) ও পাগড়ী পরিহিত ছিলেন। ভি, আই, পি লাউঞ্জ বইগুলোতে তার পদবী "আহমদীয়া আন্দোলনের প্রধান" সহ তার নাম দুইবার লিখা হয়।

* কয়েকজন সেনা কর্মচারীকে ভি, আই, পি লাউঞ্জটি সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করতে দেখা যায়। এটি ছিল ভীতিকর। কিন্তু শীঘ্রই জানা যায় যে, তারা সেখানে আফ্রিকান একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির প্রটোকলের অংশ হিসেবে উপস্তিত ছিল।

* বিমানটি ৩০ মিনিট দেরীতে অবতরন করছিলো, সুতরাং বোর্ডিং টাইমও ত্রিশ মিনিট পিছিয়ে দেয়া হয়।

* উড্ডয়নের আধঘন্টা পর বিমানটি করাচী বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল টাওয়ারের সাথে সংকেতচ্যুত হয়, যার অর্থ হচ্ছে এটা পাকিস্তানী বিমাল এলাকা অতিক্রম করেছে এবং পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ দ্বারা এটাকে আর ফিরিয়ে নেয়া যাবে না।

* এই নিশ্চয়তা প্রাপ্তির পর হুযূর (রাহে.)-কে যারা বিদায় দিতে এসেছিলেন, তারা বিমানবন্দর থেকে প্রত্যাবর্তন করেন।

**৩০ এপ্রিল ১৯৮৪ সন :**

* হুযূর (রাহে.) প্রথমে আমষ্টারডাম পৌঁছেন এবং সেখানে ক্ষণস্থায়ী এক বিরতির পর নিরাপদে লন্ডনে পৌঁছে যান।

* জামাতের ইতিহাসে এটা ছিল এক নতুন অধ্যায়, যেটা সমৃদ্ধি আর সফলতার নতুন সব রাজপথ খুলে দেয়।

## খিলফতে আহমদীয়ার চতুর্থ যুগের প্রতি দ্রুত এক পলক দৃষ্টি

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ, (রাহে.)-এর খিলাফত মহান সেসব মাইল-ফলক দেখিয়ে গেছেন, যেগুলো হাসিল হতে যাচ্ছে। এটা ছিল সেই হিজরতের আংশিক এক ফল, যেটা পাকিস্তানের স্বৈরশাসনের বিরোধিতার কারণে তিনি করেছিলেন। আর সেই হিজরত হয়েছে আমাদেরই স্বপক্ষে, আর তা দান করেছে কামিয়াবী, যার ফল আমরা তখনো লাভ করেছি আর আজো লাভ করে চলেছি। (আলহামদুলিল্লাহ্)

তথ্যসূত্র: আল হাকাম ইউ.কে

# ঈদের আনন্দ সার্বজনীন

**মাহমুদ আহমদ সুমন**

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অপার কৃপায় একমাস রোযা রাখার পর আমরা ঈদের আনন্দ উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি। বিশ্ববাসীর মাঝে যে আনন্দ বার বার ফিরে আসে তাকেই ঈদ বলা হয়। ইসলাম ধর্ম বিকশিত হবার বহুপূর্ব থেকেই বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠি ও ধর্মের অনুসারিরা নানা ভাব ও ভঙ্গিতে ঈদ পালন করতো। তবে ইসলাম ধর্মেই কেবলমাত্র ঈদকে সার্বজনীন ইবাদত রূপে রূপায়ন করা হয়েছে।

মুসলিম জাহান সিয়াম-সাধনা এবং ত্যাগের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে সমর্পণ করে অতীতের ভুল-ভ্রান্তির ক্ষমা চেয়ে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চলার অঙ্গীকারে প্রত্যয়ী হওয়ার এক সফল অনুষ্ঠান এ পবিত্র ঈদ। বর্তমান ঈদকে কেবল ধর্মীয় কিংবা সামাজিক উৎসব হিসেবে বিবেচনা করা হয় না বরং ঈদ আজ সার্বজনীন আনন্দের নাম। সামাজিক উৎসবগুলোয় আমরা যেমন আনন্দে মাতি, তেমনি প্রত্যেক ধর্মেই রয়েছে বিশেষ কিছু উৎসবমুখর দিন। সেই উৎসবগুলোও আমাদের আনন্দে ভাসায়। ব্যবধান ঘুচিয়ে এক করে। আমাদের বাংলাদেশেও রয়েছে নানা ধর্ম, গোত্রের মানুষের বাস। ঈদ, পূজা, বড়দিন, বুদ্ধপূর্ণিমা, বৈসাবি, রাস পূর্ণিমা প্রভৃতি বিশেষ দিনে সবাই আনন্দে মেতে ওঠে। এসব ধর্মীয় উৎসব বৃহৎ অর্থে সামাজিক জীবনাচারেরই অনুষঙ্গ। এসব উৎসব উদযাপিত হয় সমাজের মধ্যেই। প্রতিটি উৎসব আমাদেরকে একতা, ঐক্য, বড় ও মহৎ হতে শেখায়। ঈদের আনন্দে দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষের সাথে ভাগ করার মাঝেই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ।

ঈদ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ঈদুল ফিতরের এক খুতবায় বলেন, যে ব্যক্তি ঈদের নামায পড়েছে কিন্তু তার অন্তরে ইসলামের জন্য দরদ সৃষ্টি হয় নি, সেক্ষেত্রে তার অন্তর মৃত। আর যে ঈদের নামায পড়ে নি এবং তার অন্তরে ইসলামের দরদও সৃষ্টি হয় নি, সে ব্যক্তির অন্তরও মৃত। তেমনি যে ব্যক্তি ঈদ উদ্‌যপান করলো না তার অন্তরও মৃত। প্রকৃত ঈদ সে ব্যক্তিরই হবে, যে স্ববিরোধী আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ঈদ উদ্‌যাপন করে, তার অন্তর বিলাপ করে এবং তার বাহ্যিক অবস্থা ঈদ উদ্‌যাপন করে। ...আমাদের প্রকৃত ঈদ তখনই হাসিল হবে যখন পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম বিস্তার লাভ করবে, যখন মসজিদ আল্লাহ্‌র স্মরণকারীতে ভরে যাবে এবং যখন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং কুরআন করীমের সত্যিকার শাসন দুনিয়ার কোণে কোণে পৌঁছে যাবে। ...আমাদের সবচেয়ে বৃহৎ ঈদ তখনই হবে যখন ইসলাম পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে এবং দুনিয়ার প্রত্যেক কোণ থেকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উঠতে শুরু করবে। (ঈদুল ফিতরের খুতবা, ৭ জুলাই, ১৯৪৮)

মুসলমানের জন্য ঈদ একটি মহা ইবাদতও। ঈদের ইবাদতে শরীয়ত নির্দেশিত কিছু বিধি-বিধান রয়েছে, যা পালনে সামাজিক জীবনে পারস্পরিক আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও বন্ধন সুসংহত হয়। ঈদুল ফিতরের শরীয়ত দিক হলো, ঈদের নামাজের পূর্বে রোযার ফিতরানা ও ফিদিয়া আদায় করা, ঈদ গাহে দু' রাকাত নামাজ আদায় করা, খুতবা শুনা এবং উচ্চস্বরে তাকবির পাঠ করা। ঈদে আমাদের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি ঘটে আর পরস্পরের মাঝে ঈমানী ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং নিজেদের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়ে এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যদি এমনটা হয় তাহলেই আমাদের এ ঈদ পালন ইবাদতে গণ্য হবে।

আল্লাহ্ তা'লার আদেশে এক মাস রোযা রাখার পর তার আদেশেই আমরা ঈদের আনন্দ উদ্‌যাপন করি। এক মাস রোযা আমরা আমাদের তাকওয়াকে ও ঈমানকে বাড়ানোর জন্য রেখেছি। আমরা রমযানের রোযা এজন্যই রেখেছি, যেন আল্লাহপাকের নৈকট্য অর্জনকারী হতে পারি। এক মাস পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঈদ উদ্‌যাপন করার। প্রত্যেক বৈধ কাজ যা থেকে তিনি আমাদেরকে এক নির্ধারিত সময় বিরত রেখেছিলেন আজ ঈদ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে তা করার অনুমতি দিয়েছেন। ঈদ উদ্‌যাপন মূলত আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আর কৃতজ্ঞতার সর্বোত্তম পন্থা হলো-ধনী-গরীব সবাই একত্রিত হয়ে ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করা। একমাস রোযা রাখার যে তৌফিক আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন এরই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ দুই রাকাত নামাজ। তাই বলা যায়, ঈদ কেবল ভাল খাওয়ার বা ভাল পরার আর বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় আনন্দ ভ্রমণ করার নাম নয় বরং কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য একটা বিশেষ সুযোগ হিসেবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ঈদ দান করেছেন।

আমরা যে ঈদ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছি, আমাদেরকে সর্বদা এটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে না থেকে আল্লাহ্‌পাকের ইবাদতের প্রতিও যেন দৃষ্টি থাকে। আমাদের চিন্তা চেতনায় যে বিষয়টি জাগ্রত রাখা উচিত, তাহল নেকী ও তাকওয়াকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলন করা, আর এটাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য। এ শিক্ষাই আমাদেরকে রমযানের রোযা আর ঈদ দেয়। দু'টিই আমাদেরকে আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। আমরা যখন পুরোপুরি স্থায়ীভাবে আমাদের গরীব ভাইদের অভাব দূরীকরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো তখনই এটা আমাদের প্রকৃত ঈদ উদ্‌যাপন হবে। আমাদের এতে খুশী হওয়াও উচিত নয় যে, ঈদের দিনে গরীবদের সাময়িক খুশির উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছি বরং যাদের

সামর্থ আছে তারা যেন তাদেরকে স্থায়ী খুশির উপকরণের ব্যবস্থা করে দেয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে। ঈদের এই আনন্দ তখনই সার্বজনীন রূপ লাভ করতে পারে যখন সমাজ ও দেশের সবাই একত্রে আনন্দের ভাগী হব। আমাদের সন্তানদেরকেও ঈদের এ মাহেন্দ্রক্ষণে গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের শিক্ষা দিতে হবে। ঈদের যে উপহার তাদেরকে দেয়া হয়, তা থেকে যেন তারা একটা অংশ গরীবদের জন্য পৃথক করে নেয়। তারা যেন শুধু নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতিই খেয়াল না রাখে, নিজেরাই যেন ভাল খাবার ইত্যাদি না খায় বরং গরীব, অসহায় যারা রয়েছে তাদের প্রতিও যেন খেয়াল রাখে। এ শিক্ষা আমাদের প্রত্যেক অভিভাবককে দিতে হবে।

ঈদ যেহেতু কৃতজ্ঞতারই অপর নাম, তাই আমরা যদি ইসলামের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখতে পাই, আল্লাহর কৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে সাহাবিরা কতই না উন্নত মানে ছিলেন। হজরত আব্দুর রহমান বিন অউফ সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করেন, আর তার ব্যবসা এত লাভজনক প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজেই বলতেন, আমি যে বস্তুতেই হাত দিতাম আল্লাহ্ তা'লা তাতে এত বরকত রেখে দিতেন যা ছিল কল্পনাতীত। আমার স্পর্শে মাটি সোনা হয়ে যেত। তাকে আল্লাহ্ তা'লা অশেষ ধন ভাণ্ডার দিয়েছেন, কিন্তু সেই সম্পদ পাওয়ার পরও তার আচরণ কেমন ছিল? তা কি বস্তুবাদি মানুষের ন্যায় ছিল? একদিন তিনি রোযা রেখেছিলেন। ইফতারির সময় যখন তার জন্য খাবারের বিছানা বিছানো হয় তখন সেখানে বিভিন্ন প্রকার খাবার দেখে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন, আর ইসলামের প্রথম যুগের কথা স্মরণ করেন যখন দিনের পর দিন মানুষকে অনাহারে কাটাতে হতো, তখন তার নিজের অবস্থাও তেমনই ছিল। সেই সমস্ত সাহাবিদের কোরবানির কথা তার স্মরণ হয়, যখন যুদ্ধের ময়দানে তারা শহীদ হতেন তখন তাদের জন্য পর্যাপ্ত কাফনও ছিল না। আর যে চাদর ছিল তা এত ছোট যে, মাথা ঢাকলে পায়ে কোন সতর থাকতো না আর পা ঢাকলে মাথা খোলা পড়ে থাকতো।

সাহাবিদের দৃষ্টান্ত ছিল এমনই। এখন আমাদের মাঝে কয়জন এমন আছি যারা সাচ্ছন্দ আসার পর নিজেদের পূর্বের সময়কে এভাবে সচেতনতার সাথে স্মরণ করি? কয়জন আছি যারা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতার চেতনা নিয়ে সাচ্ছন্দ লাভের পর সত্যিকার অর্থে তার ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দেই এবং পূর্বের চেয়ে বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করি? যদি আমাদের জীবনের মান উন্নত হওয়া, আর্থিক সচ্ছলতা আসা আমাদেরকে খোদার কৃতজ্ঞ বান্দা এবং তার প্রকৃত ইবাদতকারী বান্দায় পরিণত না করে তাহলে আমাদের এই ঈদ উদ্‌যাপন করার কোন মূল্য নেই। সাহাবিরা এই পৃথিবীতেই থাকতেন, এই সমাজেই ব্যবসা বাণিজ্য করতেন, কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ ছিলেন সবার আগে, তাদের আচার আচরণে খোদা তা'লাই অগ্রাধিকার পেতেন। তাদের নামাযে, তাদের ইবাদতে বিশেষ পরিস্থিতি বিরাজ করতো। পরের উপকারের বিষয়টা তারা প্রথমে মাথায় রাখতেন।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম একদিকে যেমন ইসলামি ঐতিহ্যের জয়গান গেয়েছেন, অপর দিকে মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববোধ বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। আবার ঈদের আনন্দকে সার্বজনীন হিসেবে তুলে ধরার জন্য লিখেছেন বেশ কিছু কবিতা। 'ঈদ মোবারক' কবিতায় তিনি তার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

শত যোজনের কত মরুভূমি পারায়ে গো
কত বালুচরে কত আঁখি ধারা ঝরায়ে গো
বরষের পর আসিলে ঈদ!
ভূখারির দ্বারে সত্তগাত বয়ে রিজওয়ানের
কন্টকবনে আশ্বাস এনে গুলবাগের...
আজি ইসলামের ডঙ্কা গরজে ভরি জাহান
নাই বড়-ছোট -মানুষ এক সমান
রাজা প্রজা নয় কারো কেহ।

তিনি ইসলামী সাম্যবাদী চেতনাকে সর্বজনীন রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন তার বিভিন্ন কবিতায়। তার 'নতুন চাঁদ' কবিতায়ও বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করেছেন–

সাম্যের রাহে আল্লাহর
মুয়াজ্জিনেরা ডাকিবে ফের...
রবে না ধর্ম জাতির ভেদ
রবে না আত্ম-কলহ ক্লেদ।

এরপর 'কৃষকের ঈদ' পঙক্তিতে তিনি লিখেছেন–

জীবনে যাদের হররোজ রোযা ক্ষুধায় আসে না নিদ
মুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ?

ঈদকে নিয়ে কবি কায়কোবাদ 'ঈদ আবাহন' নামে একটি কবিতায় তার ঈদ অভিব্যক্তি এভাবে তুলে ধরেছেন-

'এই ঈদ বিধাতার কি যে শুভ উদ্দেশ্য মহান,
হয় সিদ্ধ, বুঝে না তা স্বার্থপর মানব সন্তান।
এ ত নহে শুধু ভবে আনন্দ উৎসব ধূলা খেলা
এ শুধু জাতীয় পুণ্যমিলনের এক মহামেলা।'

ঈদের দিন যেভাবে ধনী-গরিব ভেদাভেদ ভুলে যায়, এক কাতারে সবাই নামাজ আদায় করি, সবার সাথে হাসি মুখে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করি, ঠিক তেমনিভাবে সারাবছর একই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে আর বিভেদের সকল দেয়ালকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

কবি গোলাম মোস্তফা কতই চমৎকারভাবে তার এক কবিতায় বিষয়টি এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন-

'আজি সকল ধরা মাঝে বিরাট মানবতা মূর্তি লভিয়াছে হর্ষে,
আজিকে প্রাণে প্রাণে যে ভাব জাগিয়েছে রাখিতে হবে সারা বর্ষে,
এই ঈদ হোক আজি সফল ধন্য নিখিল-মানবের মিলন জন্য, শুভ যা জেগে থাক,
অশুভ দূরে যাক খোদার শুভাশীষ স্পর্শে।'

হ্যাঁ, আমরা এমনই কামনা করি, ঈদ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে আমাদের মাঝ থেকে সকল প্রকার অশুভ দূর হয়ে যাক। সবার মাঝে ভ্রাতৃত্বের মেল বন্ধন রচিত হোক। আমাদের সবার স্লোগান হোক 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে'। সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা।

masumon83@yahoo.com

# কিছু মজার ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনা

**ফুরাদ আহমদ,** মুরব্বী সিলসিলাহ্

১। একবার হযরত সুলাইমান (আ.)-এর দরবারে দু'জন মাতৃত্বের দাবীদার মহিলার মামলা উপস্থাপন করা হলো। তাদের নিকট একটিই শিশু ছিলো। কখনো একজন হেচকা টান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো উভয়েই কাঁদছিলো আর চিৎকার করছিলো যে, এটি আমার সন্তান। কোন জ্ঞানী ব্যক্তির ধারণায়ও আসলো না যে, এ সমস্যার কিভাবে সমাধান হতে পারে। সুতরাং হযরত সুলাইমান (আ.)-এর দরবারে এ মোকদ্দমা পেশ করা হলো - তখন তিনি (আ.) বললেন, ইহা ঠিক করাতো বড়ই কঠিন যে, ইহা কার সন্তান। যদি একজনের সন্তান হয় আর অন্য জনকে দিয়ে দেয়া হয় তাহলে খুবই অন্যায় করা হবে। এজন্য তিনি শিশুটিকে কেটে দু' টুকরো করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। একজনকে আর অন্য টুকরো অপর দাবীদারকে দিয়ে দেয়া হয় যেন অবিচার করা না হয়। সুতরাং তিনি জল্লাদকে বল্লেন, আস, এ শিশুটিকে ঠিক মধ্যখান দিয়ে দু'টো টুকরো করে একটি একজনকে অপরটি অন্যজনকে দিয়ে দাও। যে আসল মা ছিলো সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো সন্তানের ওপর আর বলতে লাগলো, আমাকে টুকরো করে ফেলো আর শিশুটি তাকে দিয়ে দাও। খোদার দোহাই এ শিশুটির যেন কোন ক্ষতি না হয়। তখন হযরত সুলাইমান (আ.) বললেন, এ শিশুটি এই মহিলার।

২। একবার কাদিয়ানে প্রচুর বেওয়ারিশ ও পাগলা কুকুরের উৎপাত প্রচন্ডভাবে বৃদ্ধি পায় তখন পীর সিরাজুল হক নোমানী সাহেব নিজের টাকায় মাংস কিনে সেই মাংসতে বিষ মিশিয়ে কুকুর দমন করেন কিন্তু তিনি যখন বাহিরে বের হতেন তখন মানুষ তাকে দেখে বলত "পীর কুত্তে মার হে" অর্থ্যাৎ পীর সাহেব কুকুর মারাকারী। মানুষ এই কথা বললে তিনি খুব কষ্ট পেতেন। তাই তিনি একদিন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর কাছে অভিযোগ করে যে, হুযুর কাদিয়ানে বেওয়ারিশ কুকুরের উৎপাত বৃদ্ধি পায় তাই আমি নিজের পকেটের টাকা দিয়ে মাংস কিনে তাতে বিষ মিশিয়ে এই সমস্ত কুকুর নিধন করি কিন্তু মানুষ আমাকে বলে "পীর কুত্তে মার হে" এটা শুনে আমার খুব কষ্ট হয়। তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বললেন এতে বিচলিত হওয়ার বা কষ্ট পাওয়ার কিছুই নেই। তুমি কষ্ট পেওনা আল্লাহ তা'লা তো আমাকে বলেছে "এ সোওর মার হে" এ তো শুকর মারাকারী অর্থ্যাৎ হাদিসে রয়েছে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী **ইয়াকতুলুল খিনযির,** সে শুকর বধ করবে।

৩। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন যে, একজন মানুষ কারো বাড়িতে তিন দিন পর্যন্ত মেহমান হতে পারে আর একটি বিষয় হলো কুরআনে রয়েছে আল্লার একদিন আমাদের হাজার বছরের সমান। এ নিয়ে একটি মজার ঘটনা। একজন সূফী সমপর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, সে কোন রুজি রোজগার করত না। একবার অন্য আরেকজন বুযূর্গ তাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন এই অভ্যাস ঠিক নয়। সমস্ত দুনিয়া পার্জন করে, তাই আপনাকেও জীবিকার জন্য চেষ্ট প্রচেষ্টা করা দরকার। তিনি বলেন মেহমান যদি নিজের রুটি নিজে তৈরি করে তাহলে মেজবানের অসম্মান হয়। আমি খোদার মেহমান, যদি নিজে উপার্জন করার চেষ্টা করি তাহলে খোদা অসন্তুষ্ট হবেন। তিনি বলেলন, আচ্ছা ঠিক আছে আপনি খোদার মেহমান কিন্তু আপনি জানেন রসূল (সা.) বলেছেন, মেহমান শুধু তিন দিনের হয়। তখন সূফী সাহেব বল্লেন আমি জানি কিন্তু আমার আল্লার একনি হাজার বছারের সমান। সুতরাং যে দিন তিন হাজার বছর শেষ হবে সে দিন আমিও এই মেহমানী ছেড়ে দেব।

৪। আরেকটি প্রসিদ্ধ ঘটনা, এক শিয়া বাদশার কাছে এক সুন্নী বুর্যূগ আসে এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়। সে ব্যক্তি অত্যন্ত নেক ছিলো কিন্তু যেহেতু তার দিনাতিপাত অত্যন্ত কষ্টে অতিবাহিত হতো এজন্য তার খেয়াল হলো আমি বাদশার কাছে যাব এবং তার কাছে কিছু চাব। সে গেল এবং দেখলো সেখানে আরো অনেকে জমায়েত হয়ে ছিলো যারা তাদের চাওয়া পাওয়ার জন্য এসেছে কিন্তু তারা সবাই ছিলো শিয়া আর সে শুধুমাত্র সুন্নী। যখন বাদশাহ ত্রাণ বিতরণ করতে লাগলেন তো এমন সময় উজির বাদশার কানে কিছু বললো এবং তিনি এই সুন্নী বুযূর্গ ছাড়া বাকী সবাইকে ত্রাণ দিয়ে দিল এবং সবাই চলে গেল। আর এই সুন্নী বুযূর্গ ঐখানেই দাঁড়িয়ে ছিলো। বাদশাহ যখন দেখলো সে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে তখন বাদশাহ উজিরকে বললো, তাকে কিছু দিয়ে বিদায় করে দাও। উজির বললো, আমি তো দিয়ে দিব কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে সুন্নী। বাদশাহ বললো, তুমি কিভাবে বুঝলে সে সন্নী, সে বললো আমি চেহারা দেখেই বুঝে ফেলেছি সে সুন্নী। বাদশাহ বললো আচ্ছা ঠিক আছে ,তাহলে তার পরীক্ষা নিয়ে নাও। সুতরাং উজির হযরত আলীর ফযিলত বর্ণনা করা শুরু

করে দিলো আর সুন্নী বুযূর্গও অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শুনতে লাগলো এবং বলতে লাগলো হুযুর! হযরত আলীর শানে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি রসূলের (সা.) সাহাবী ছিলেন এবং তাঁরে মেয়ের জামাই ছিলেন ও আল্লাহ্ তা'লা তাকে খেলাফত প্রদান করেন। তাঁর শান তো অস্বীকার করা যায় না। বাদশাহ বললো, এখন তো প্রমাণিত হয়ে গেল সে শিয়া। উজির বলতে লাগলো, না এখনো হয় নাই আমি আরো কিছু বিষয় জানতে চাই।

সুতরাং সে আরো কিছু বিষয় বললো এবং সে তা সত্যায়ন করতে লাগলো। বাদশাহ বললো এখন তো তোমার বিশ্বাস হয়ে গেছে সে সুন্নী না সে শিয়া। উজির বললো, এখনো হয় নাই, তাবার্‌রা। (অর্থ: আহলে বাইতের শত্রুদের ঘৃণা করা) দিয়ে দেখি যদি সে তাবার্‌রাতে শামিল হয়ে যায় তাহলে বুঝা যাবে সে শিয়া এবং যদি শামিল না হয় তবে বুঝা যাবে সে সুন্নী। সুতরাং বাদশাহ বললো 'বার হার সে লানত' মানে তিন জনের উপর লানত অর্থ্যাৎ নাউযুবিল্লাহ হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত উসমানের উপর লানত। উজিরও বললো বার হার সে লানত। সেই বুযূর্গ সুন্নীও বলে উঠলো বার হার সে লানত। তখন বাদশাহ বললো, এখনতো পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল সে শিয়া।

উজির বললো হুযূর! আমার এখনো সন্দেহ হচ্ছে, সে মুনাফেকাতের মাধ্যমে কাজ নিচ্ছে। বাদশাহ তখন বললো আচ্ছা ঠিক আছে তার কাছে জিজ্ঞেস কর যে তুমি কে? তখন উজির জিজ্ঞেস করলো তুমি কি শিয়া? সে বললো না, আমিতো সুন্নী। তখন উজির বললেন আমি আপনার সব কথা বুঝলাম যে আপনিও হযরত আলীকে সম্মান করেন কিন্তু যখন আমরা বললাম বার হার সে লানত, তখন আপনিও বার হার সে লানত বললেন, এ বিষয়টা আমি বুঝি নাই। তখন সে ব্যক্তি বলতে লাগলো যখন আপনি বললেন, বার হার সে লানত তখন তার মানে ছিল যে হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত উসমানের উপর লানত কিন্তু যখন আমি বললাম, বার হার সে লানত তার মানে ছিলো এই যে উজিরের উপর লানত, বাদশার উপর লানত এবং আমার উপরেও লানত, যে এমন ফালতু ও নোংরা লোকের কাছে আসছে।

৫। খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর একটি ঘটনা, তিনি বলেন, আমার বিবি যখন গর্ভবতী আমি তাকে বেশী বেশী লিখতে দিতাম। যখন বাচ্চা হলো, আমি বাচ্চার এক হাতে টাকা আর অন্য হাতে কলম দিলাম। তখন বাচ্চা কলমটা হাতে নিলো।

# খলীফা নির্বাচন সম্পর্কীয়

সংগ্রাহক: **কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী**

আমীরুল মু'মিনীন সায়্যেদেনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী, আল্ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ইন্তেকালের পর জামাতে আহমদীয়ার মধ্যে বিভ্রান্তি ও ভাঙ্গন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিরুদ্ধবাদীদের মধ্য হতে কতিপয় ব্যক্তি আহমদী জামাতের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, আচ্ছা বলুন তো এইবার আপনাদের খলীফা কে হবেন?

যাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল তারা সকলে এই উত্তর দিলেন, 'কামকো কেয়া মালুম হ্যায়। ইয়ে তো খোদা জান্তা হ্যায়। অর্থাৎ আমি কি জানি! এটা তো খোদাই জানেন। এভাবে রাবওয়া শহরে ঘুরে ঘুরে যখন যাকে জিজ্ঞাসা করা হল, সকলের মুখে তারা একই উত্তর শুনল। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) নির্বাচিত হন নি।

সকল আহমদীদের মুখে একই ধরণের উত্তর শুনে তারা (বিরুদ্ধবাদীরা) হয়রান হয়ে গেল এবং বলাবলি করতে লাগল, 'ব্যাপার কি! মনে হয় তারা যেন পূর্ব হতেই এরূপ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন।

পরিশেষে বহিরাগত আহমদী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কিন্তু কোন ভিন্ন রূপ উত্তর তারা শুনত পেল না। তখন তারা ব্যর্ততার কথা বুঝাতে পেরে, বহিরাগত একজন বৃদ্ধ আহমদীর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ভাই আপনি তো একজন প্রবীন ও বুযুর্গ ব্যক্তি এবং অনেক অবিজ্ঞতা রাখেন। আপনি বলুন তো এবার আপনাদের তৃতীয় খলীফা কে হতে পারেন? এই প্রশ্ন শুনে তিনি (বৃদ্ধ) জবাব দিলেন, ইয়ে তো আজব বাত হ্যায়! ম্যায় তো যমীন পর হুঁ, জো হোনা হ্যায়, ওহ তো আসমান পর ফয়সালা হোচুকা হ্যায়। অর্থাৎ ইহা তো আশ্চর্যের কথা! আমি যমীনে আছি। আর যা হবার তা তো আসমানেই ফয়সালা হয়ে গেছে। এরূপ জবাব শুনে তারা অবাক হয়ে গেল।

কিন্তু কোথাও কারও মুখে নেযামে খেলাফতের ব্যাপারে একটি অতিরিক্ত শব্দও শুনতে পেল না। ইহা ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়ারই ফল। সায়্যেদানা হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) দোয়া করতেন, 'হে আমার রব! আমাকে সেই জ্ঞান দার কর, যা তোমার নিকট উত্তম'। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীকে সর্ববস্থায় নেযামে খেলাফতের অনুগত ও দৃঢ়ভাবে অনুরক্ত থকবার তৌফিক দান করুন, আমীন।

# কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

**মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল**

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৮৪)

**বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার বন্ধের জন্য আহ্বান (৯)**

**ইস্তেখারা দোয়ার মাধ্যমে সত্যতা নিরূপণের দুইটি দৃষ্টান্তঃ**

হযরত আহমদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় ইস্তেখারা দোয়ার মাধ্যমে তাঁর দাবীর সত্যতার অনেক ঘটনা রয়েছে যেগুলোর বর্ণনা রয়েছে তাঁর লিখিত রচনাবলীতে এবং কোন কোন দেশী-বিদেশী পত্র পত্রিকায় এবং সমকালীন সাহাবীদের জীবন-ইতিহাসের ঘটনাবলী সম্বলিত সাক্ষ্য-প্রমাণের মধ্যে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দুইটি ঘটনার উল্লেখ করা হলো। হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সময়কার বহু ঘটনাবলীর মধ্যে একটি হলো এই যে, চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান (রা.)-এর রচিত 'My Mother' নামক পুস্তকে তিনি তাঁর মায়ের স্মৃতিচারণ করতঃ কয়েকটি সত্য-স্বপ্নের উল্লেখ করেন যার ভিত্তিতে তাঁর মাতা ১৯০৪ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তাঁর মাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) কে চারবার স্বপ্নে দেখেন এবং তাঁর সাথে কথাও বলেন। শিয়ালকোটে হযরত মীর্যা সাহেবের আগমনের প্রাককালে তিনি বাস্তবে তাঁকে দেখার সুযোগ পান এবং স্বপ্নের সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল দেখেন এবং তাঁর সত্যতার সন্দেহাতীত প্রমাণ পেয়ে বয়আত গ্রহণ করেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) তাঁর সম্পর্কে বলেন: "চৌধুরী নসরুল্লাহ খান (রা.)-এর স্ত্রী এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ খানের মাতা সত্য স্বপ্ন দ্রষ্টা ছিলেন। তাঁর স্বপ্নের মাধ্যমেই তিনি প্রতিশ্রুত মসিহকে চিনবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং নিজের স্বামীর পূর্বেই বয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং স্বপ্নের দিক নির্দেশনাতেই তিনি খেলাফতের প্রশ্নে সত্য পথে পরিচালিত হয়ে স্বামীর পূর্বেই আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন। ঈমানের ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের। সত্য প্রচারেও তিনি ছিলেন নির্ভিক। ('মা আমার মা' নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ পৃ-১৪৬ দ্রষ্টব্য)।

যে কোন সময়ে ইস্তেখারা পদ্ধতি অবলম্বণ করা যেতে পারে। সাম্প্রতিককালের একটি ঈমান-বর্ধনকারী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো। আব্দুল সেলিম সাহেব নামক একজন খৃষ্টান ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে ফিজি থেকে আমেরিকার লসএঞ্জেলেসে এসেছিলেন। খ্রিষ্টান সমাজে বাস করায় তিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে একজন মুসলমানের তবলীগে পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একজন মুবাল্লেগ এনামুল হক কাওসার সাহেবের সাথে এ অধমের বন্ধুত্ব হয় এবং তিনি আহমদীয়া জামা'তের মসজিদে আসা শুরু করেন। মোবাল্লেগ এনামুল হক কাওসার সাহেব তাকে আহমদীয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন, বই-পত্র দিয়েছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন, তিনি যেন দোয়া করে আল্লাহতা'লার কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা চান। তিনি তাকে ইস্তেখারা করার প্রকৃত পদ্ধতি বলে দেন। অতএব তিনি ইস্তেখারা করেন, দোয়া করেন এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে স্বপ্নে দেখতে পান। পরের দিন তিনি তার অভ্যাস মত অ-আহমদীদের মসজিদে যান, সেখানে আরব থেকে কোন এক শেখ এসেছিল। সেই শেখ উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করার আহ্বান জানালে আব্দুল সেলিম সাহেব দাঁড়িয়ে বলেন, কুরআন করীমে ও হাদীস শরীফে আছে এ যুগে ইমাম মাহদী আসবেন, এ যুগ ইমাম মাহদীর আগমনের যুগ। তাই আমি দোয়া করেছি, হে আমার খোদা! তুমি আমাকে বলে দাও, ইমাম মাহদী কি এসেছেন? যদি এসে থাকেন, তবে তিনি কে? তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম, আমি স্বপ্নে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে দেখেছি। এ কথা শুনে শেখ বলে, এটা শয়তানী-স্বপ্ন এবং এতে কোন প্রকার সত্যতা নেই। তুমি বেশি বেশি আউযুবিল্লাহ এবং দরূদ শরীফ পাঠ কর।

অতএব তিনি আবার দোয়া করেন এবং বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-তার স্বপ্নে আবার দেখা দেন। তিনি পুনরায় শেখের প্রশ্নোত্তরের সভায় যান এবং এ কথার উল্লেখ করেন। শেখ আবার বলে, এটা শয়তানী স্বপ্ন। আব্দুল সেলিম সাহেব বলেন, আশ্চর্য বিষয়! রাতে আমি অধিক হারে তা'উয ও দরূদ শরীফ পাঠের পর দোয়া করি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ইমাম মাহদীর আগমন সম্পর্কে অবগত

কর। কিন্তু আপনার কথামত আল্লাহ তা'লা আমাকে স্বপ্ন দেখাননি, কিন্তু শয়তান স্বপ্ন দেখায়-এটাতো খুবই আশ্চর্যের কথা। এ কথা শুনে মসজিদে হৈচৈ শুরু হয়ে যায় এবং তারা বলে, একে এখান থেকে বের করে দাও, এ কাফির, অপবিত্র। এমনকি আড়ালের মহিলারাও বলা শুরু করে একে এখান থেকে বের করে দাও। তিনি বলেন, আমি সেখান থেকে বের হয়ে আসি। এরপর তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মুবাল্লেগকে এসব ঘটনার বর্ণনা দেন এবং বলেন এখন আমার কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমি বয়আত করতে চাই। অতএব তিনি বয়আত করেন। যেদিন বয়আত করেন, সেদিন রাতেই স্বপ্নে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তার কাছে পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশিত হন এবং তাকে সালাম বলেন, করমর্দন করেন ও আহমদীয়াত গ্রহণের জন্য সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, পরের দিন আমি খুব খুশি ছিলাম, কারণ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমার সাথে করমর্দন করেছেন।

এসব শেখ বা নাম-সর্বস্ব আলেম তো বিগত শতাধিক বছর যাবৎ সাধারণ মানুষ ও মুসলমানদেরকে প্রতারিত করে আসছে। আর আজও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সেই কথা অতি উত্তম রূপে পূর্ণ হচ্ছে। তিনি বলেছেন, আমি দেখছি এবং আপনারাও দেখছেন কিভাবে আল্লাহতা'লা আমার জামা'তকে বৃদ্ধি করছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যদিও সত্তাগতভাবে আমাদের মাঝে উপস্থিত নেই, কিন্তু জামা'তের বৃদ্ধি পাওয়া এবং মানুষের কাছে স্বপ্ন যোগে নিজের সত্যতা প্রমাণ করাই জীবনের প্রমাণ। (পাক্ষিক আহমদী, ৩০ জুন ২০১১ খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.) প্রদত্ত খুতবা দ্রষ্টব্য)।

**ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন কাল ও স্থান এবং স্বীয় সত্যতার প্রমাণ সম্পর্কে আগমনকারী হযরত আহমদ (আ.) বলেছেনঃ**

"ইহা স্মরণ রাখা উচিৎ যে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী সম্পর্কে বহু কিংবদন্তি (রেওয়ায়েত) রহিয়াছে। ইহাদের অনেকগুলি পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী। এইগুলির অকৃত্রিমতা সম্পর্কে কিছুই জানা নাই এবং এইগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের নিকট কোন প্রমাণও নাই। **এই রেওয়ায়েত সমূহের মূলবস্তু এই যে (শেষ যুগে) এক ব্যক্তি আবির্ভূত হইবেন যিনি মসীহ ও মাহদী হইবেন এবং তিনিই মীমাংসাকারী (হাকাম) হইবেন। সকল রেওয়ায়েতই এই মূল বিষয়ের নিশ্চিত সাক্ষ্য বহণ করে এবং এই ব্যাপারে কোনই বিরোধ নাই।** কিন্তু অত্যান্ত বিস্তারিত বিবরণের দিক দিয়া এতই অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও পরস্পর বিরোধী যে, ইহাদের সামঞ্জস্য সাধন করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া পরীক্ষকগণ, বিদ্বানবর্গ ও ধর্মতত্ত্ববিদগণ হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কাজেই তাহারা বিভিন্ন রেওয়ায়েত বা কিংবদন্তির সমর্থনে তুলনামূলক পরিমাপের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচেষ্টা পরিহার করিয়া ইহাদের সঙ্কলনের কাজই চালাইয়া যাইতেন। এইরূপে তাহারা নিজদিগকে বিস্ময়ের এক ঘুর্ণিজালে নিপতিত দেখিতে পাইতেন।

তাহাদের কেহ কেহ বলিয়াছেন মাহদী আব্বাস বংশীয় হইবেন এবং কেহ কেহ মাহদী ফাতেমী বংশীয় হইবেন বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, তিনি হোসেনের বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন, আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন তিনি পবিত্র রসূল মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বংশ হইতে আবির্ভূত হইবেন। এমন মতামতলম্বীও আছেন যাহারা মনে করেন যে মাহদী ইসলামের অনুসারীদের একজন সাধারণ সদস্য হইবেন। অন্য দিকে আর এক দল লোক এই মত পোষণ করিয়াছেন যে মাহদী প্রতিশ্রুত মসীহ ব্যতীত পৃথক কোন ব্যক্তি নহেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাহদীর আবির্ভাব হইবে না। এই প্রকারের এবং আরো অনেক রেওয়ায়েত (বিবরণ) আমাদের নিকট আসিয়াছে।

তদ্রুপ মসীহের আগমনের ব্যাপারেও বহু মতানৈক্য রহিয়াছে। পবিত্র কোরআন সাক্ষ্য প্রদান করে মে হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। কিন্তু তদসত্ত্বেও প্রতিকুল বিশ্বাস রহিয়াছে যে তিনি কখনও মৃত্যু বরণ করেন নাই; তিনি সশরীরে আকাশে জীবিত আছেন এবং তথা হইতে অবতীর্ণ হইবেন। কিছু সংখ্যক বিদ্বানবর্গ রহিয়াছেন যাহারা মনে করেন যে ঈসা (আ.) বাস্তবিকই মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন। পবিত্র কোরআনেও এইরূপই বিবৃত হইয়াছে এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারী একগুয়ে ব্যক্তি ব্যতিত এই অভিমতকে কেহ অস্বীকার করিতে পরিবেনা। ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের মতে ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার তূল্য অপর এক ব্যক্তির আগমনে পূর্ণ হইবে। মো'তাজিলা সম্প্রদায় ও সুফি সম্প্রদায়ের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিগণ এইরূপ অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন। ঈসা (আ.)-এর আকাশ হইতে অবতীর্ণ হওয়ার উপর বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে তিনি দামেস্কের মিনারার পূর্বদিকের নিকট অবতীর্ণ হইবেন। কেহ কেহ বলেন তিনি ইসলামের সৈন্যদলের মধ্যে অবতীর্ণ হইবেন। আবার কতকের মতে যখন দাজ্জাল বাহির হইবে তখন তিনি আবির্ভূত হইবেন। কেহ কেহ মক্কাকে, কেহ কেহ জেরুজালেমকে তাহার অবতীর্ণ হওয়ার স্থানরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য ব্যক্তিগণ এতদউদ্দেশ্যে আরো বিভিন্ন স্থান সমূহের উল্লেখও করিয়াছেন।

এই কিংবদন্তি সমূহ হইতে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে প্রতিশ্রুত মসীহ আল্লাহ কর্তৃক হাকাম বা মীমাংসাকারী হিসাবে নিযুক্ত হইয়া এই সমস্ত মত-বৈষম্যের মীমাংসা করিবেন। তদানুসারে যাহারা তাহার মীমাংসা মানিয়া লইবে এবং তাহার মীমাংসায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া প্রকাশ্যে ও আন্তরিকতার সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া লইবে, তাহারাই সত্যিকার মুসলমান হিসাবে পরিগণিত হইবে। অন্যদিকে তাহার অস্বীকারকারী ব্যক্তিগণ বলিবে, আমাদের পূর্ব পুরুষদিগকে আমরা যে মতের উপর পাইয়াছি, উহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহর নিয়োজিত প্রেরিত পুরুষের আগমনে জনমন্ডলী বিস্ময় প্রকাশ করে এবং দাবীকারককে প্রতারক বলে। অথচ এই

সমস্ত লোক সকলই ইহার পূর্বে হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে তাহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এখন তাহাদের এই প্রতীক্ষিত ব্যক্তি আগমন করত: তাহাদের সম্মানের উৎস হইয়াছেন, তাহাদের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহাদের শত্রুদিগকে নির্বাক করিবার সময়-উপযোগী আধ্যাত্মিক (রুহানী) অস্ত্রাদি তুলিয়া ধরিয়াছেন।

**প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাবের নির্দিষ্ট সময়কে চিনিতে তাহারা কি অপারগ হইয়াছেন? অথবা তাঁহার আগমন কি অসময়ে ঘটিয়াছে? নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালার নির্ধারিত সময়েই উপস্থিত হইয়াছে এবং চূড়ান্ত মীমাংসার সময়ও সন্নিকটে। তাহারাই সৌভাগ্যশালী যাহারা কৃতজ্ঞতাভরে আমাকে গ্রহণ করে। আল্লাহতায়ালা যাহাকে সম্মানিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহারা কি তাহার মূলোৎপাটন করিতে চাহে? কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিই বিজয় লাভ করিবেন। তাহারা কি আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধাচরণকারীদের তালিকাভুক্ত হইতে সাহস পায়? প্রকৃতপক্ষে এমন কোন প্রশ্ন বা ঘটনাই আর রহস্যাবৃত নয় এবং তাহাদের অন্তকরণ সমূহই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারা অন্ধকারে হাত ছাড়াইতেছে।**

হে মানবমন্ডলী! আপনাদের স্বচক্ষে দৃষ্ট স্বর্গীয় নিদর্শনাবলী আপনারা কেন অস্বীকার করিতেছেন? আপনাদের মধ্যে কি কোন ধর্মভীরু লোক নাই? আপনারা আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিদ্রুপ করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা যদি সমকালীন শাসকগোষ্ঠির প্রতি আপনাদের অন্তকরণ সমূহে ভীতির সঞ্চার না করিতেন তাহা হইলে আপনারা স্বীয় তরবারির দ্বারা তাহার শিরোচ্ছেদ করিতেন। বর্তমান (ধর্মীয় স্বাধীনতা বিধানকারী) রাষ্ট্রীয় শাসনের অস্তিত্ব না থাকিলে আপনারা নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালার প্ররিতকে আক্রমণ করিয়া বসিতেন। এখন সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে এবং আপনারা যে সমূদয় ওজর-আপত্তি উপস্থাপন করিতেন উহাদের সবই ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়া পড়িয়াছে। আপনারা কখনও গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়াস পান নাই। সুতরাং আমার দাবীর বিষয়টি শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী আল্লাহতায়ালার সমীপেই ছাড়িয়া দেই।" ('নাজমুল হুদা' নামক আরবী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ)

**বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার বন্ধের জন্য আহবান (১০)**

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নীতিগত শিক্ষার আলোকে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর দাবীর সত্যতার প্রমাণ এবং সত্যতা-নিরূপণ পদ্ধতি সম্পর্কে পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনার পর এখন আমরা আরো দুটি বিষয়ে একত্রে বর্ণনা করবো প্রধানত: আহমদীয়া মুসলিম সংগঠনের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার লিখিত পুস্তকাবলীর আলোকে। পাঁচটি বিষয় হলোঃ

**১) দাবীকারক ইসলামের পাক-পবিত্র শিক্ষা সহকারে এসেছেন কিনা এবং তাঁর আগমনের মূল উদ্দেশ্য কি?**

এই বিষয়টি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)–এর দাবীর সত্যতার প্রমাণ পবিত্র কুরআনের সূরা জুমুয়া ৬১:৩-৪, সূরা সাফ: ১০, সূরা নূর ২৪:৫৬ এবং প্রাসঙ্গিক হাদীসের আলোকে ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি।

**২) পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সার্বিকভাবে দাবীকারকের ওপর প্রযোজ্য হয় কিনা এবং ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যথার্থভাবে পূর্ণ হয়েছে কিনা?**

আগমনকারী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দাবীর সত্যতা পবিত্র কুরআনের ৭:১৫৮ এবং ৪৮:৩০ এবং হাদীসের আলোকে বিষয়টি ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

**৩) যে সময় বা যুগে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে, সেই যুগের অবস্থাবলী এবং বিশেষ চিহ্নসমূহ কোন সংস্কারকের আবির্ভাবের সাক্ষ্য বহন করে কিনা?**

এই প্রশ্নের উত্তরে পবিত্র কুরআনের সূরা কিয়ামা ৭৫ঃ৯-১০, তাকভীর ৮১ঃ১-২০, ইনফিতার ৮২ঃ১-৫, কাহফ ১৮ঃ প্রথম ও শেষ দশ আয়াত এবং সূরা আম্বিয়া ২১ঃ৯৭, সাজদা ৩২ঃ৬ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের বরাতে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

**৪) ইসলামের মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে তিনি বড় বড় নিদর্শনসহ আগমন করেছেন কিনা যেগুলো সার্বিকভাবে কেউই মোকাবেলা করতে পারে না এবং**

**৫) ইসলামের মৌলিক শিক্ষানুযায়ী দাবীকারকের ব্যক্তি-চরিত্র, 'তাকওয়া' এবং আধ্যাত্মিক আকর্ষণ-শক্তি উচ্চ পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত কিনা?**

উপরোক্ত (৪) এবং (৫) বিষয় দুটি সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের নীতিগত শিক্ষার আলোকে এখন আমরা দাবীকারকের সত্যতার সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করবো। ইসলামী শিক্ষার আলোকে এই সকল সাক্ষ্য-প্রমাণের অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেকটি বিষয় একদিকে দাবীকারকের আধ্যাত্মিক মকাম ও মর্যাদার সত্যায়নকারী এবং অন্যদিকে ঐশী-নিদর্শন এবং ঐশী সাহায্য প্রাপ্তির সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা সন্দেহবাদী এবং আপত্তিকারীদের জন্য চক্ষু-উম্মিলিনকারী বটে।

**দাবীকারকের মাধ্যমে প্রকাশিত ঐশী নিদর্শনমূলক ভবিষ্যদ্বাণী এবং ঘটনাবলীর আলোকে তাঁর দাবীর সত্যতার সাক্ষ্য-প্রমাণ:**

গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে এবং ঐশীবাণী প্রাপ্তির দাবী এবং ঐশী নিদর্শনাবলী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নীতিগত বিষয় হলো:

**সূরা জ্বিন (২৭-২৮) গায়েবের সংবাদ সম্পর্কিত নীতি:** "আলেমুল গায়েবে ফালা ইয়োজহিরু আলা গায়বিহি আহাদা, ইল্লা মানির তাজা মিররাসুলিন।" অর্থ: "আল্লাহ্ অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। ফলতঃ তিনি গুপ্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে কাহারও নিকট প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ করেন না– সে ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে তিনি রাসুল হিসাবে মনোনীত করেন।"

**সূরা হাক্কা (৪৫-৪৮) আল্লাহর নামে মিথ্যা**

**বানানোর শাস্তিঃ** "ওয়া লাও তাকাওওয়ালা আলায়না বা'জাল আকাবীল। লা আখাযনা মিনহুবিল ইয়ামিন। সুম্মা লাকাতা'না মিনহুবিল ওয়াতীন। ফামা মিনকুম মিন আহাদিন আ'নহু হাজেযীন।"

অর্থ: "যদি সে আমাদের নামে কোন কথা বানাইয়া বলিত, তবে আমরা অবশ্যই তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া তাহার জীবন শিরা কাটিয়া দিতাম। তখন তোমাদের কেহই সেই শাস্তি থেকে আমাদিগকে বাধা দিতে পারিতে না।"

উপরোক্ত দুটি মাপকাঠির আলোকে ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবীকারকের সত্যতা সহজেই নিরুপণ করা যেতে পারে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব দাবী করেছেন যে, ওহী–ইলহাম, কাশফ–রুইয়ার মাধ্যমে আল্লাহতা'লা তাঁকে অনেক গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন যার ভিত্তিতে তিনি অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণী যথা সময়ে পূর্ণ হয়েছে এবং কতকগুলো পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ কোনক্রমেই পবিত্র কুরআনের বিরোধীতো নয়ই, বরং পবিত্র কুরআনের মহা-কল্যাণ ও আশিস দ্বারা পরিপুষ্ট। এরূপ অবস্থায় যদি তিনি মিথ্যা দাবীকারক হতেন এবং নিজের কথাকে আল্লাহর কথা বলে চালাতেন, তাহলে উপরোক্ত ঐশী-নীতি অনুযায়ী (ক) ভবিষ্যতে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ একটা একটা করে পূর্ণ হওয়ার কারণ কি এবং (খ) তিনি ওহী-ইলহাম, কাশফ ও রুইয়া লাভের দাবী করার পরও চতুর্দিক হতে প্রবল বাধা ও চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও সুদীর্ঘ ২৬ বছরেরও উর্ধকাল যাবত বেঁচে থেকে ইসলামের সুমহান খেদমত ও প্রচার করার সুযোগ পেলেন কি কারণে? (গ) আগমনকারী হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর প্রতিনিধিত্বকারী খলীফাগণের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের পূর্ণ-প্রচারের জন্য সুসংগঠিত শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা শত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও কিভাবে ক্রমান্বয়ে সাফল্য অর্জন করে চলেছে?

ফলতঃ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের পূর্ণতা এবং তাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত ঐশী সাহায্য ও ঐশী সমর্থিত নিদর্শনাবলীর দ্বারা তাঁর দাবীর সত্যতা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে। হযরত মির্যা সাহেব কর্তৃক কলমের জিহাদ অর্থাৎ ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহা বিজয়, ইসলামের কল্যাণময় আশিস-ধারার চির-প্রবাহমানতা, ইসলামের পুনরুত্থান ও পুনর্জাগরণ, ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত সব প্রকার অপবাদের খন্ডন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার্থে ঐশী সাহায্য ও নিদর্শনসহ বিভিন্ন বাস্তব–সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পুস্তকাবলী প্রণয়ন ও প্রকাশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া প্রচার কেন্দ্রসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট পুস্তকাবলী (বিশেষত হযরত আহমদ (আ.) লিখিত ৮৮ খানা পুস্তক) এবং পূর্বে উল্লেখিত Website দ্রষ্টব্য।

**আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা সাহেব ঘোষণা করেছেনঃ**

* "বস্তুতঃ আমার নামের স্বপক্ষে তিন সাক্ষী বিদ্যমান। **(প্রথমতঃ)** আমার খোদা যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সত্ত্বাধিকারী, আমি তাঁহাকেই সাক্ষী রাখিয়া এই ঘোষণা করিতেছি যে, আমি তাঁহার তরফ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছি। তিনি স্বীয় নিদর্শন সমূহ দ্বারা আমার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি ঐশী নিদর্শন সমূহে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া তিষ্ঠিতে পারে তাহা হইলে আমি মিথ্যাবাদী। **(দ্বিতীয়তঃ)** যদি কোন ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের সূক্ষ্ম কথা এবং তত্বজ্ঞান বর্ণনায় আমার সমকক্ষতা করিতে পারে তাহা হইলে আমি মিথ্যাবাদী। **(তৃতীয়তঃ)** যদি কোন ব্যক্তি গায়েব অর্থাৎ অদৃশ্যের গোপন কথা এবং ঐশী রহস্যপূর্ণ সমস্ত ব্যাপার যাহা খোদাতা'লার অসীম ক্ষমতা দ্বারা সংঘটিত হইবার পূর্বে আমার নিকট প্রকাশ হইয়া থাকে, আমার অনুরূপ হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে আমি খোদাতা'লার পক্ষ হইতে নহি।" (আরবাইন, ১ম খন্ড)

* তিনি বলেছেনঃ "বস্তুতঃ পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে যেরূপ সমুদ্র বিরাজিত, সেরূপ এই সংগঠনও খোদার নিদর্শনে পরিপূর্ণ। এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয় না, যেদিন কোন না কোন নিদর্শন প্রকাশিত না হয় এবং প্রত্যেক নিদর্শন ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আমি দশ হাজার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মাত্র নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করেছি। প্রকৃত পক্ষে সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হলে একটি বিরাট পুস্তকেও সংকুলান হবে না। এরূপ হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লাভ কি কোন মিথ্যাবাদীর জীবনে সংঘটিত হতে পারে?" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, পৃ-২৪)।

* "আমার সমর্থনে তিনি ঐ সকল নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, যদি ঐগুলিকে এক এক করিয়া অদ্যকার তারিখ ১৬ই জুলাই, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে গণনা করি তবে খোদাতা'লার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, ঐগুলি তিন লক্ষেরও অধিক হইবে। কেহ যদি আমার কসমের উপর ভরসা না করে তাহাকে আমি প্রমাণ দিতে পারি।

কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে খোদা তা'লা সর্বক্ষেত্রে স্বীয় ওয়াদানুযায়ী আমাকে শত্রুর অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এবং কতিপয় নিদর্শন এমন যে, তাহা সর্বক্ষেত্রে তাহার ওয়াদানুযায়ী আমার প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা মিটাইয়াছেন।

কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে তিনি স্বীয় ওয়াদা "ইন্নি মুহিনুম মান আরাদা এহানাতাকা" (অর্থঃ নিশ্চয় আমি তাহাকে অপমানিত করিব যে তোমাকে অপমানিত করিতে চাহিবে-অনুবাদক) অনুযায়ী আমার আক্রমণকারীদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছেন।

কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেইগুলি আমার আদিষ্ট হওয়ার সময় হইতে উদ্ভব হইয়াছে। কেননা, যখন হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে কোন মিথ্যাবাদীর এই দীর্ঘ সময় লাভের সৌভাগ্য হয় নাই।

(চলবে)

# আমি কিভাবে আহমদী হলাম

**মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী**
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(২০তম কিস্তি)

**বাংলাদেশে এসে মুরব্বী হিসেবে কার্যক্রম আরম্ভ করলাম**

আমার বাড়ীর সমস্ত আসবাপত্র যা যা সম্ভব প্যাকেট করে ট্রেনে করাচীর জন্য বুক করে দিয়েছিলাম। বড় জিনিস যেমন খাট, চৌকি, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি বিক্রি করে দিয়েছিলাম। যাত্রার দিন আমার জন্য অফিসের গাড়ী প্রস্তুত ছিল। মোহতরম নাযেরে আলা সাহেবের সাথে সাক্ষাতের পর গাড়ীতে করে রাবওয়া থেকে ফয়সালাবাদ এয়ারপোর্ট আসলাম। করাচী পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টার উড়ন। করাচীর আমীর মোহতরম আহমদ মুখতার সাহেবের প্রতিনিধি আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে করাচী জামাতের গেস্ট হাউজে নিয়ে গেলেন। এখানে কয়েকদিন থাকলাম। করাচী থেকে ঢাকা পর্যন্ত বিমানের টিকেট কেনা হয়ে গেল। বাড়ীর জিনিসপত্র সব বাংলাদেশে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। অনেক কিছু করাচীর এক ভাই কিনে নিলেন। ছেলেমেয়ের কাপড়-চোপর স্যুটকেসে করে সঙ্গে আনতে পারলাম। ডাক বিভাগের সাথে কথা বলে আমার বইগুলোর এগারোটি প্যাকেট করে করাচী থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন ঠিকানায় ডাকযোগে বুক পোস্ট করে দিলাম। প্রায় ৩৩ কিলোগ্রাম বই হয়েছিল। সামুদ্রিক জাহাজে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম যেন কম খরচে পাঠাতে পারি। প্রায় দুমাস পরে বইগুলো পেয়েছিলাম। করাচী থেকে আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে (১৯৮৭ সালে) ঢাকায় এসে পৌঁছে গেলাম। সেদিন জেনারেল এরশাদ সাহেবের বিরুদ্ধে প্রথম ৭২ ঘন্টার হরতাল চলছিল। ভাগ্যভাল যে বনানীতে আমার ছোট বোনের বাসা ছিল। এয়ারপোর্টের খুব কাছে। তখন সেখানে বাড়ী-ঘর খুব কম ছিল। বেবীট্যাক্সী বা রিকশা সব বন্ধ ছিল। আমার ছোট ভাই ও আমার ছোট বোনের দেবর নাছিম আমাকে নিতে এয়ারপোর্টে গিয়েছিল। একটা বেবী ট্যাক্সী ভাড়া করলাম, স্যুটকেসগুলো ট্যাক্সীতে রেখে হেঁটে বোনের বাসায় পৌঁছালাম।

পরের দিন হেঁটে হেঁটে ক্যান্টনম্যান্টের ভেতর দিয়ে মিরপুর ১২, জনাব মুনিরুল হক ও ডা. সাদেক হক সাহেবার বাসায় পৌঁছে গেলাম। সেখানে আমার ছেলে-মেয়েরা ছিল। মোহতরমা ডা. সাদেক হক সাহেবা আমার স্ত্রীর আপন খালা হন। তারপরের দিন শুক্রবার হরতাল ছিল না। জুম'আর নামাযে দারুত তবলীগ ৪নং বকশী বাজারে আসলাম। ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মুস্তফা আলী সাহেবেরসাথে দেখা করলাম। আরও কয়েকজন পরিচিতের সাথে দেখা হল। খুব অল্প মানুষ আমাকে চিনতেন। তারপর বাংলাদেশে আমার জীবনযাত্রা আরম্ভ হল।

১৯৮৭ সালের ১৮ আগষ্ট বাংলাদেশে ফিরে এলাম।পূর্ব থেকেই আমার কর্মস্থলনির্ধারিত ছিল আহমদনগর জামাত। বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরে হিমালয় পর্বতের পাদদেশে পঞ্চগড় জেলায় আহমদ নগর একটি বড় জামাত। এখানে মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, প্রাক্তন আমীর, বাস করতেন।

বাংলাদেশে এসে আমার প্রথম কাজ ছিল পাকিস্তানি পাসপোর্ট বাংলাদেশ সরকারের কাছে জমা দিয়ে বাংলাদেশী পাসপোর্ট সংগ্রহ করা। আমার পরিবারের থাকার কোন জায়গা ছিল না। আমার বড় ভাইছোট বোন ঢাকায় থাকতেন। কিন্তুসেখানে আমারপ্রবেশ নিষেধ ছিল। অগত্যা আমার স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনদের বাসায় থাকছিলাম। দূষিত পানির কারনে আমার জন্ডিস হয়ে গেল। কিছুদিন ডা: আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, নায়েব আমীর মরহুমের চিকিৎসা নেয়ার পর আহমদ নগর চলে গেলাম। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিল না। অনেক কষ্টে আহমদনগর পৌঁছে গেলাম। রাস্তায় বাসের উপর রাখা ব্যাগ-সুটকেস, কাপড় চোপড়ইত্যাদি সব ভিজে গেয়েছিল।

সেপ্টেম্বর থেকে আহমদনগরে কাজ আরম্ভ করেছিলাম। জামাতের সকলের সাথে দেখা সাক্ষাত শুরু করলাম। আমি আসার কয়েক মাস পরে সাবেক ন্যাশনাল আমীরমৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, যিনি আমার অভিভাবক ছিলেন, ইন্তেকাল করে গেলেন।এখানে কয়েকজন আমার কর্মপদ্ধতি দেখেঅসন্তুষ্ট হয়ে আমার বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) এর খেদমতে এমন কিছু লিখলেন যে হুযুর (রহ.) মোহতরম মোহাম্মদ

মুস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীরকে লিখলেন আমাকে যেন অন্য কোথাও বদলী করা হয়।আমাকে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরের জ্যোতিন্দ্র নগর তথা সুন্দরবন জামাতে পাঠানো হল। সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকলাম।এখানে কোন মুরব্বী কোয়ার্টার ছিল না। তাই আমার থাকা হল না।ঢাকায় ফেরত আসলাম।

ময়মনসিংহ শহরে আমাদের একটি মসজিদ ছিল। মুরব্বী কোয়ার্টারও ছিল। আমাকে ময়মনসিংহে পাঠানো হল। এখানে মসজিদের আশেপাশে আহমদী পরিবার ছিলনা।মসজিদ বা মুরব্বী কোয়ার্টারের চারিদিকে কোন নিরাপত্তা দেয়াল ছিল না। কোয়ার্টারের বাইরে পানির কল ছিল। টয়লেটও বাইরে ছিল। রাতে চোর আসত। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা রাতে ঘরের বাইরে যেতে ভয় পেত। আমাকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন জামাতে সফরে যেতে হত।

১৯৮৮ সালের জুন মাসেমোহতরম মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব নাযেরএসলাহ ও এরশাদ বাংলাদেশে আসলেন। আমার অবস্থা শুনে তিনি কষ্ট অনুভব করলেন।তিনি আমাকে খুব আদর করতেন। রাবওয়ার সাথে প্রাকৃতিক বা ভৌগলিক দিক থেকে কিছু মিল ছিলতাই তিনি আহমদনগরে আমার পোস্টিং দিয়েছিলেন। মওলানা আনিসুর রহমান খুলনায় ছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আমার পরে আহমদনগরে কোন মুরব্বী ছিলেন না। মওলানা আনিসুর রহমান সাহেবকে আহমদনগর বদলী করা হল। আমাকে খুলনায় বদলী করা হল। খুলনা বিভাগীয় শহরে আমাদের মসজিদ ও মুরব্বী কোয়াটার ছিল। আমি ১৮ নভেম্বর সপরিবারে খুলনা পৌঁছলাম। আলহামদুলিল্লাহ। খুলনায় আমাদের মসজিদ গল্লামারী নিরালা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। তখন নিরালা আবাসিক এলাকায় অনেক প্লট খালি ছিল।

**খুলনায় পৌঁছে কাজ আরম্ভ করলাম**

খুলনায় অনেক সমস্যা ছিল। বিভিন্ন কারনে তারা চাচ্ছিলেন না যে সেখানে কোন মুরব্বি অবস্থান করুক। কিন্তু খুলনার মানুষগুলোঅনেক ভাল ছিলেন। আমাকে তারা সাদরে গ্রহন করলেন। আমরা দ্রুত কাজ আরম্ভ করলাম। খোদ্দামরা খুব উৎসাহিত ছিলেন।

১০জুন ১৯৮৮ সালে খলীফাতুল মসীহ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রহ.)মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিলেন। আমাদের খোদ্দামরা কেন্দ্রের নির্দেশমত মুবাহালার পুস্তিকাটি অনেক বেশী সংখ্যায় জনগনের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। অনেক মৌলভী মওলানা সাহেবদেরকেও দেয়া হয়েছিল। ওলামায়ে কেরাম চুপচাপ ছিলেন। কিন্তু অনেকে মৌলভী সাহেবদের বার বার জিজ্ঞাসা করছিল যে মুবাহালা সর্ম্পকে বক্তব্য দিন।

আমরা শুক্রবারে বিভিন্ন মসজিদে খোঁজ নিতাম বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে যে মওলানা সাহেবরা কী বলেন। একদিন জুমআর পরে খবর পেলাম যে খুলনা জেলার ইমাম পরিষদের সভাপতি বড় মৌলভী সাহেব তার বড় মসজিদে জুমআর খুৎবায় আমাদের মুবাহালার উল্লেখ করেছেন। মুবাহালা বইয়ের কোন কোন অংশ পড়েও শুনিয়েছেন। অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে কাদিয়ানীরা মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ঘটনাক্রমে জুমআর খুৎবা চলাকালে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেছে যে মওলানা সাহেব ! আপনারা মুবাহালা গ্রহণ করুন। তাহলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।মওলানা খুবরেগে গিয়ে বললেন 'বসুন। আপনি মুবাহালার কী বোঝেন?'

এখানে আমাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য বলা দরকার যে, মুবাহালা কী?উত্তর এই যে কুরআন শরীফে হযরত নবী(সা:)-কে বলা হয়েছে যে,'তুমি বিরোধীদের উদ্দেশ্যে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দাও।'

আল্লাহ তালার বিধান এই যে, আল্লাহর প্রেরিত কোন নবীকে যখন চুড়ান্তভাবে অস্বীকার করা হয়, নবী (আ:) বার বার নিজের সত্যতার দলিল প্রমান এবং অনেক নিদর্শন দেখান, এরপরও মৌলভী সাহেবরা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতারক বলতে থাকেন তখন এক সময় আল্লাহ তার নবীকে মুবাহালা করতে বলেন। হযরত নবী করীম (সা.)এর অনুকরনে হযরতমসীহ মওউদ(আ.)আল্লাহর নির্দেশে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.), হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর খলিফা হিসেবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর মুবাহালার পুনরাবৃত্তি করেছেন। মুবাহালার বিধান এই যে, কেউ ব্যক্তিগতভাবে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিতে পারে না। কোন জামাতের ইমাম হতে হবে। ইমামের অধীনে একটি আনুগত্যকারী জামাত থাকতে হবে। মুবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদানকারীকে যারা মিথ্যাবাদী মনে করে তারা মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহন করবেন। এই দুই প্রধানের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্ তাকে এক বছরের মধ্যে ধ্বংস করে দিবেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.) ১৯৮৮ সালের জুন মাসে মুবাহেলার চ্যালেঞ্জ দিলেন। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৮৪ সনে আহমদী বিরোধী আইন করেছিল। এর ফলে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) পাকিস্তান ছেড়ে হিজরত করে লন্ডন যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। জেনারেল জিয়াউল হকমিথ্যা খুনের মামলা দিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) কে মৃত্যুদন্ড দেয়ার চেষ্টাও করেছিল। অতএব, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রহ.)এর মুবাহালার প্রধান টার্গেট বা শিকার ছিল জেনারেল জিয়াউল হক। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) স্পষ্ট ঘোষনা দিয়েছিলেন যে দুনিয়ার কোন শক্তি জিয়াউল হককে রক্ষা করতে পারবে না। হুযুর (রহ.)এর পক্ষ থেকে মুবাহেলার চ্যালেঞ্জ ঘোষনার প্রায় আড়াই মাস পর জেনারেল জিয়াউল হক এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়। তাকে বহনকারী বিমানটি ছিল আমেরিকার নির্মিত অত্যন্ত নিরাপদ বিমান, যা দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় যায়। ভ্রমনের সময় ঐ বিমানে তার সঙ্গী ৫ জন পাকিস্তানীজেনারেল,৫ জন আমেরিকান জেনারেল এবং আমেরিকান রাষ্ট্রদুতও

নিহত হয়। বহু পরীক্ষা নিরিক্ষা করেও বিমান দুর্ঘটনার কারন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আমাদের প্রচারিত ঐ মুবাহালার চ্যালেঞ্জ আমাদের দেশের কোনো বড় আলেম প্রকাশ্যভাবে গ্রহন করেননি। অতএব, এখন আমাদের বিরুদ্ধে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে কোনো আলেমের কিছু বলার কোন অধিকার নেই। তারা যদি আহমদীয়া জামাতকে কাফের বলতে চায় তাহলে তারা তখন মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহন করেননি কেন ? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর যুগে যারা বড় আলেম ছিলেন, তারপরের যুগে যারা বড় আলেম ছিলেন, আজকের আলেমরা কি তাদের চেয়ে বড় আলেম? আজ এত বছর ধরে যারা সফলতা লাভ করেননি তারা আর কবে সাফল্যের মুখ দেখবেন?

আবার খুলনা জামাতে আমার কার্যক্রমের কথা বলছি। ২৩ মার্চ ১৯৮৯ তারিখে আমাদের জামাতের শতবার্ষিকী জুবিলি উৎসবের জন্য বিশাল ও ব্যাপক প্রোগাম হাতে নেয়া হয়েছিল। আমাদের খোদ্দামরা একদিন হঠাৎ এক বিরাট কান্ড ঘটাল।আমাকে অথবা প্রেসিডেন্ট সাহেবকে না জানিয়ে তারা নিজেরা প্রস্তুতি নিয়ে এক রাতে পুরো খুলনা শহরের বিভিন্ন দেয়ালে পোষ্টারিং করে দিল। মোটা মোটা অক্ষরে পোষ্টার ছাপানো হয়েছিল। লেখা ছিল প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী জাহির হয়েছেন। আপনারা জানার জন্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। নিচে আমাদের খুলনা মসজিদের ঠিকানা দেয়া হয়েছিল।

প্রথমে কেউ সেদিকে কর্ণপাত করল না।তখন আমাদের খোদ্দামরা অনেক মৌলভী সাহেবের সাথে দেখা করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করা আরম্ভ করলেন যে, কাদিয়ানীরা এমন পোস্টার ছাপিয়েছে, আপনারা কেউ কিছু বলছেন না কেন?

তারপর হতে এমন আরম্ভ হয়ে গেল যে প্রতিদিন দুপুরের পরে লোকজন আমাদের অফিসে আসতে আরম্ভ করল। যারা আসতেন তারা অনেক প্রশ্ন করতেন। আমরা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে পড়ার জন্য বই দিয়ে দিতাম। অনেকে বলে যেতেন যে আমরা কুরআন হাদিসের যে উদ্ধৃতি দিয়েছি তা যদি ভুল হয় তাহলে তারা এসে আমাদের লাঠি পেটা করবেন। কিন্তু তাদের কেউ ফেরত আসেননি।

যারা আমাদের কাছে এসে আমাদের কথা শুনে বই নিয়ে গেছেনতারা তাদের মৌলভী সাহেবের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে কথাবলেছেন, মৌলভী সাহেব তাদের নিষেধ করে দিয়েছিলেন, যেন আমাদের এখানে কেউ না আসে। আস্তে আস্তে লোকজনের আগমন কমতে লাগল। আমরা তবলিগের বাণী পৌঁছাতে থাকলাম। মৌলভী সাহেবরা লোকজনকে বলতে থাকলেন যে, কাদিয়ানীরা কাফের তাদের কথায় কর্ণপাত কর না।

২৩ মার্চ ১৯৮৯ তারিখে যতদূর সম্ভব বড় আয়োজন করে জামাতের শতবার্ষিকী জুবিলী উদযাপন করেছিলাম। আমাদের অবস্থা সুবিধাজনক ছিলনা। নয়ত আমাদের ইচ্ছা ছিল শহরের কোন বড় হল ভাড়া করে বড় জলসা করব। সুধী সমাজের অনেক মানুষকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে আমাদের মসজিদের সাথে অফিস ঘরেই মেঙহমানদের বসার ব্যবস্থা করা হল। ঢাকা থেকে বিশেষ দাওয়াত কার্ড ছাপিয়ে সকল জামাতে দেয়া হয়েছিল। সারা দেশের বড় বড় জামাতগুলোতে বিশেষ জলসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের এখানে প্রায় ৬০-৭০ জন মেহমান এসেছিলেন।

প্রথমে খাকসার আমার স্বাগত বক্তব্যে জামাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং শতবার্ষিকী জুবিলী উদযাপনের উদ্দেশ্যে বলেছিলাম যে আমরা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তারপর প্রশ্নোত্তর পর্বে মেহমানদের প্রশ্ন বা বক্তব্যের আহবান জানালাম। মেহমানরা ছোট খাটো দু'একটি প্রশ্ন করেছিলেন। যার উত্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু সবাই শতবার্ষিকী জুবিলীর মোবারকবাদ দিয়েছিলেন। মানসম্মত আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল, সাথে এক সেট বই সবাইকে উপহার দেয়া হয়েছিল।

শতবার্ষিকী জুবিলি উপলক্ষে আমি "কুরআন হাদিসের আলোকে আহমদীয়াতের সত্যতার প্রমান" নামে একটি পুস্তিকা কেন্দ্রের অনুমোদন নিয়ে প্রকাশ করেছিলাম। স্থানীয় জামাত এর খরচ বহন করেছিল। আমার এই পুস্তিকাও অনেক বিতরন করা হয়েছিল। আমাদের ছোট জামাত কিন্তু সবাই যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (রহ.) এর দোয়া চেয়ে সব কাজ করতাম। পরে ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং হুযুর (রহ.) এর খেদমতে রিপোর্ট পাঠাতাম। হুযুর (রহ:) আমাদের রিপোর্ট পড়ে খুব খুশি হয়ে দোয়া করেছিলেন। হুযুর (রহ:) এর অধিকাংশ পত্র আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ লন্ডন যাওয়ার পর মুরব্বীদের পত্রের উত্তর নিজ স্বাক্ষরে পাঠাতেন। এখনো অনুরুপ ব্যবস্থা চালু আছে।

আল্লাহ্‌র ফযলে আমরা আমাদের তবলিগী কার্যক্রম বরাবর জারি রেখেছিলাম। সকল খোদ্দাম আনসারকে বলেছিলাম সবাই নোট বুক রাখবেন। নোট বুক মসজিদে থাকবে। শুক্রবারে সবাই জুমু'আর নামাজে এসে নোট বুকে নোট করবেন–কে কতজনকে তবলিগ করেছেন। তবলিগের কি চেষ্টা করেছেন। খাকসার নোট পড়ে তাতে নোট দিতাম–আর কি করা যেতে পারে।

আমার মনে পড়ে; যে ব্যক্তি লিখেছে যে সে কোন ব্যক্তিকে তবলিগ করেনি; আমি তার নোট বুকে লিখেছি আপনি মাগরিবের পরে অথবা ফাঁকা সময়ে এস্তেগফার করুন; কিছু পদচারনা করুন আর এস্তেগফার করতে থাকুন। দোয়া করুন–"হে আল্লাহ্ ! আমি বড় আপারগ, অযোগ্য, হে আল্লাহ ! আমার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দাও যেন আমি কাউকে তবলিগ করতে পারি।"

আল্লাহ্‌র ফযলে অধিকাংশ বন্ধুরা তবলিগী নোট বুকে তবলিগী কার্যক্রমের রিপোর্ট লিখতেন। আল্লাহ্‌তা'লা আমার ঐ সব ভাইদের উত্তম পুরস্কার দান করুন। 'আমিন'।

(চলবে)

# স্বাস্থ্য নিয়ে ক'টি কথা

**খালিদ আহমেদ সিরাজী**
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

স্বাস্থ্যই সুখের মূল একথাটি ধ্রুব সত্য। কারণ সুস্থ শরীর, সবল দেহ, পুলকিত মন, যাদের ঘরে এবং বাইরে শান্তি আছে, তারাই এ নশ্বর জীবনে প্রকৃত শান্তি অনুভব করতে পারেন। প্রকৃত পক্ষে যাদের মন ও স্বাস্থ্য ভাল তারা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের লক্ষ্যে পুণ্য কাজ করতে সক্ষম হন। স্বাস্থ্য ভাল থাকলেই ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করা যায়। ইসলাম অপরাপর ধর্মের মত নয়। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমরনীতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ের সাথে স্বাস্থ্যনীতির ক্ষেত্রে ইসলামের যে, সুবিশাল নীতিমালা রয়েছে তার কিছু নিচে পেশ করা হলো। মানুষের দেহের বাহ্যিক অবয়ব বা কাঠামোগত সুস্থতা বিরাজ করলেই আমরা একজন মানুষকে স্বাস্থ্যবান বলে থাকি। তাই সুস্থ থাকার অন্যতম একটি উপাদান হলো মানসিক প্রশান্তি। মানুষের আত্মা কলুষিত হলে দৈহিক সুস্থতা সত্ত্বেও শান্তি পায় না, অপরকেও শান্তি দিতে পারে না। হিংসা বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, ঘৃণা, ঘুষ ভক্ষণ ইত্যাদি বর্জন করে নির্মল চরিত্র, ধৈর্য্য, অল্পে তুষ্টি ও সর্বদা আল্লাহর জিকিরের (স্মরণ) মাধ্যমে আত্মাকে সুস্থ রাখার পথও ইসলাম বলে দিয়েছে।

ইসলামের বক্তব্যই হলো স্বাস্থ্যনীতিও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মূলে, একথা ভুলে গেলে আমাদের চলবে না। তথাকথিত আধুনিকতাবাদীরা প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে, স্বাস্থ্যনীতি আধুনিক যুগের অবদান। কিন্তু এটা মোটেই সত্য নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে এ কথা স্বীকার করার সুযোগ হয়েছে ঠিকই। আজ থেকে প্রায় ১৫ শত বছর আগে বিশ্ববাসীর জন্য যে জীবন বিধান স্রষ্টা অবতীর্ণ করেছিলেন, সেদিন মানুষের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অর্থাৎ রোগ ব্যাধির বিষয়টি তাতে মোটেই বাদ দেয়া হয়নি বরং রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার সব কিছুরই ইঙ্গিত ও বক্তব্য আল-কুরআনে সন্নিবেশিত হয়েছে। আজকের যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা জোর দিয়ে বলেছেন, রোগের চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধমুলক ব্যবস্থা গ্রহণই উত্তম।

ইসলাম যাবতীয় নীতিমালার ব্যবহারিক ও বাস্তব পদ্ধতি অনুশীলিত হয়েছে মহানবী (সা.) এর জীবনে। রসূল (সা.) অধিক পানি পান করা এবং জ্বর হলে পানি দ্বারা শরীর মুছে ফেলা ও মাথা ধুয়ে দেয়ার কথা বলেছেন, তা হাদীসে তা উল্লেখ পাই। যুগ যুগ ধরে কুসংস্কার চলে আসছিল যে, জ্বর হলে কাঁথামুড়ে থাকতে হয়। আজ আধুনিক যুগের চিকিৎসকগণ আবার রসূল (সা.) এর প্রদর্শিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে ফিরে এসেছেন। ডাক্তারগণ জ্বর হলে পরামর্শ দিচ্ছেন বার বার পানি দিয়ে গা মুছে দিতে ও মাথায় পানি দিতে।

**পবিত্রতা সম্পর্কে ইসলাম:**

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেনঃ "নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন। আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকে ভালবাসেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রিয় নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ "হে হাবীব, আপনার পোষাক পরিচ্ছদ পাক পবিত্র করুন এবং যে কোন প্রকার ময়লা নোংরামী ও অপবিত্রতা থেকে নিরাপদ থাকুন। এ নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ্ সকল বান্দাদের শিক্ষা দিয়েছে"।

হাদীস শরীফে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, পবিত্র ঈমান মু'মিনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর সে সম্পদের অংশ হিসেবে পবিত্রতাকে যুক্ত করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল, পবিত্র থাকা ঈমানদারদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম।

**বায়ুর পবিত্রতা সম্পর্কে ইসলাম:**

বায়ু সম্পর্কে বলা যায়, এটা জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করে। বায়ু দুষিত হলে পরিবেশ ও মানুষের যাবতীয় জীবনযাত্রা দুষিত হয়ে উঠে। অপরদিকে পরিবেশ দুষণের কারণে বায়ু দুষিত হয়ে থাকে আর তা মানব সমাজে অনেক পির্যয় সৃষ্টি করে। এই জন্য বায়ু ও বায়ুপ্রবাহ নিষ্কলুশ রাখার জন্য আল্লাহতাআলা সমগ্র উম্মাকে শিক্ষা দিয়েছেন। (তাজরীদে বোখারী কিতাবুল আদব: মিশকাত, ১ম খন্ড)

**পানির পবিত্রতা প্রসঙ্গে ইসলাম:**

বলা চলে পানির অপর নাম জীবন। জীবন রক্ষাকারী ও এই পানির সদ্ব্যবহার এর পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে অনেক স্থানে তাগিদ এসেছে।

**দেহের পবিত্রতা:**

দেহের প্রতিটি অঙ্গের পরিচর্যা এবং এগুলোকে সচল রাখার জন্য ইসলাম অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত বিধিবিধান দিয়েছে। এতে রয়েছে, নখ কাটা, মিসওয়াকের মাধ্যমে দাঁতের পরিচর্যা করা, নাক, কান ও চোখকে ধুলা-বালি থেকে রক্ষা করা ও ধৌত করার ব্যবস্থা গ্রহণ, মল ত্যাগের পর পানি ব্যবহার করা এবং ছাই, সাবান বা মাটির দ্বারা হাত ধুয়ে, গোসল ও ওজুর মাধ্যমে সমস্ত শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিধান। খুব সুন্দর ও স্পষ্টভাবে কোরআন হাদীসে এসবের উল্লেখ রয়েছে।

**নিত্যদিনের পবিত্রতা:**

খাওয়া-দাওয়া, ব্যায়াম, বিশ্রাম, নিদ্রা ইত্যাদি বিষয়ের বক্তব্যও ইসলামের নীতিমালা যৌক্তিক ও বিজ্ঞান সম্মত। ক্ষতিকারক কোন জিনিসকে ইসলাম পানাহারের জন্য হালাল করেননি; বরং ক্ষতিকারক বস্তু ভক্ষণ সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। আজকের আধুনিক বিশ্ব মাদকাশক্তির অপকার সম্পর্কে সোচ্চার। অথচ ইসলাম প্রায় ১৫শত বৎসর পূর্বে নেশা জাতীয় বস্তু হারাম করে দিয়েছে। যেমন মদ, আফিম, গাঁজা, ধুমপান ইত্যাদি। দুপুরের খাবারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও রাতের খাবারের পর কিছুক্ষণ হাটাহাটি করা শরীরের জন্য কল্যাণকর। আর এই রূপ নিয়ম নীতি মানার জন্য হাদীস শরীফে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। খাবার গ্রহণ পরিমিত পরিমাণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পন্থায় রসূল (সা.) বলেছেন, পেটের তিন ভাগের এক ভাগ খাবার, এক ভাগ পানি আর এক ভাগ খালি রাখবে। আমরা আরো জানতে পারি যে, মানুষ যখন অতিরিক্ত খেয়ে পেট ভরে নেয়, তখন গবেষণা করার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা লোপ পায়।

**মাতৃদুগ্ধ পান:**

মায়ের দুধের প্রয়োজনীয়তার উপর আজকের বিশ্ব সোচ্চার কিন্তু হাজার বছর আগেই ইসলাম শিশুর দেহের গঠন জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ ও সুস্থ থাকার জন্য পূর্ণ ২ বছর মায়ের দুধ পান করানোর উপর গুরুত্বারোপ করেছে। অথচ বর্তমান বিজ্ঞান এতদিন পর্যন্ত বিকল্প দুধ আবিস্কার এই মহান সত্যকে জলাঞ্জলি দেওয়ার চেষ্টা করেছে বটে তবে আজ বিজ্ঞান কোরআনের পথে ধাবিত হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। বলা হচ্ছে মায়ের দুধের বিকল্প নেই।

**পোষাক পরিচ্ছদের পবিত্রতা:**

পোষাক পরিচ্ছদের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা দ্বারা মানুষ মনের তৃপ্তি পায় তা আমরা সকলেই কমবেশি জানি।

**স্বাস্থ্য রক্ষায় শাকসব্জি:**

আল-কোরআন ও হাদীস শরীফে শাকসব্জি আহারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কোরআনে মাছের কথাও বর্ণিত রয়েছে। আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞান বলেছে শাকসব্জি বেশি বেশি খেতে হবে। এতে অনেক রোগ থেকে বাঁচা যাবে।

**শয়নে বৈজ্ঞানিক নিয়ম:**

শোয়ার সময় রসূল (সা.) বলেছেন ডান কাত হয়ে শোয়ার জন্য। এর বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে মানুষের হৃদপৃন্ড বুকের বাম পার্শ্বে অবস্থিত। যদি বাম কাত হয়ে কেউ শয়ন করে, তাহলে হৃদপিন্ডের উপর চাপ পড়ে। পরিশেষে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, কেবল ইসলামই স্বাস্থ্য নীতি মেনে চলার সুস্থ থাকার নিশ্চয়তা দিতে পারে।

**‘তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। আর তোমরা যা-ই খরচ কর আল্লাহ্ নিশ্চয় সে বিষয়ে পুরোপুরি অবগত।’**

(সূরা ঃ আলে ইমরান : ৯৩)

## “আহমদী” পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র “আহমদী” পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
**মাহবুব হোসেন**
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

# আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণপ্রিয় খলীফা ও বর্তমান ইমাম পাকিস্তানের সিয়ালকোটে অবস্থিত আহমদীয়া মসজিদে হামলার প্রতিবাদে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেছেন, আহমদী মুসলমানরা সকল প্রকার উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড ও অবিচারের উত্তরে দোয়া ও শান্তিপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখবে।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বনেতা ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) পাকিস্তানের সিয়ালকোটে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের একটি মসজিদ এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর স্মৃতিবিজড়িত একটি ঐতিহাসিক বাড়িকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে স্থানীয় প্রশাসন ও মোল্লাদের যোগসাজেশে কয়েকশ জনতার এহেন আক্রমণের প্রতিবাদে তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছেন।

লন্ডনে অবস্থিত বায়তুল ফুতুহ মসজিদে প্রদানকৃত শুক্রবারের জুমুআর খুতবায় হুযূর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এই হামলার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, যারা মসজিদে আক্রমণ করেছে তারা ইসলামের প্রতিরক্ষার দাবি করলেও বস্তুত তাদের কর্মকাণ্ড ছিল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী যা আল্লাহ্‌র ঘর অর্থাৎ মসজিদের পবিত্রতা লঙ্ঘন করে। তিনি (আই.) বলেন, আক্রমণটি পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল এবং পাকিস্তানে অবস্থিত অন্যান্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদগুলোও আজ আক্রমণের ঝুঁকির সম্মুখীন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আরো কতিপয় মসজিদ ধ্বংস করার জন্য প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি ঘোষণাটি দিয়েছেন তিনি নিজেকে কুরআনের হাফেয বলে দাবি করেন, যে কিনা পাকিস্তানের একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তুত এই ব্যক্তি শুধুমাত্র নামেই একজন হাফেয কেননা তিনি পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষার আলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।"

পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের যে মহিলা সদস্য উন্মুক্ত কণ্ঠে সিয়ালকোট মসজিদ আক্রমণের প্রতিবাদে তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছেন, হুযূর (আই.) বিশেষভাবে তার এবং যে সব পাকিস্তানী এই হামলার প্রতিবাদে নিন্দা জানিয়েছেন তাদের সবার প্রশংসা করেছেন।

হুযূর (আই.) আরো উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানে যারা আহমদীয়া মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার সাহস দেখিয়েছেন অনিবার্যভাবে তারা হুমকি এবং নানা রকম ভয়-ভীতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এমনকি প্রায়ই আহমদী মুসলমানদের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহারে বাধ্য করা হচ্ছে কিংবা পেশাগত দিক থেকেও তারা ভোগান্তির সম্মুখীন হচ্ছেন।

পাকিস্তানে সর্বশেষ হামলার প্রতিক্রিয়ায় আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের শান্তিপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখার কথা উল্লেখ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন :

"প্রকৃতপক্ষে আমরা গভীরভাবে শোকাহত কেননা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক বাড়িটি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটিকে সীলগালা করে দেওয়া হয়েছে এবং পুলিশি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হুযূর (আই.) বলেন :

"আমি কেবল আমার দুঃখ ও দুর্দশায় মহান আল্লাহ্‌কেই ডাকি' পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের অনুসরণে আমরা সর্বাবস্থায় খোদা তা'লাকেই স্মরণ করব।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন:

"যদিও নিশ্চিতভাবে এ বাড়িটির সাথে আমাদের এক প্রকার আবেগের সম্পর্ক আছে কিন্তু প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)- এর সঙ্গে আমরা যে বন্ধনে আবদ্ধ তা কেবল জাগতিক ভাবে এ বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি অলঙ্ঘনীয় আর আধ্যাত্মিক বন্ধন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুপম শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত যা আমাদের আধ্যাত্মিক এ খিলাফত ব্যবস্থার সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে।"

(কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লণ্ডন)

# সকল কল্যাণ ও আশিস খেলাফতে নিহিত

**সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)**

হে বন্ধুগণ! আমার আখেরী নসিহত এই যে, সমস্ত কল্যাণ ও বরকত খেলাফতে নিহিত রয়েছে। নবুওয়ত একটি বীজ বপন করে যার পর খেলাফত এর 'তাসির' ও প্রভাবকে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়। তোমরা খেলাফতে হাক্কা'কে মজবুতীর সহিত ধর এবং এ আশিস ও বরকতের দ্বারা জগতকে উপকৃত কর যাতে খোদা তা'লা তোমাদের ওপর দয়া ও রহমত বর্ষণ করেন এবং তোমাদেরকে এই জাহানেও উন্নত করেন এবং সেই জাহানেও সম্মানিত করেন। আমরণ নিজেদের ওয়াদা পূরণ করে যাও। আমরা সন্তানদিগকেও এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সন্তানদিগকেও তাঁদের খান্দানের অঙ্গীকার স্মরণ করাতে থাক। আহমদীয়াতের মোবাল্লেগগণ যেন ইসলামের প্রকৃত সিপাহী সাব্যস্ত হন এবং এই দুনিয়াতে খোদায়ে কুদ্দুসের কর্মচারীবৃন্দে পরিণত হন। (আল-ফযল, ২০ মে, ১৯৫৯ইং)

# সংবাদ

সংকলন: **মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী**

## নাখালপাড়া হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে গত ৪ মে, ২০১৮ বাদ জুমুআ নাখালপাড়া হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জনাব নাসির আহমদ সাহেব (ফেডেক্স), নায়েব যয়ীম আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন জনাব মাওলানা সোলাইমান সুমন সাহেব, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। সভায় শ্রোতামন্ডলীর উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সিরাত সম্পর্ক হৃদয়গ্রাহী ও মনোমুগ্ধকর আলোচনা করেন মাওলানা সোলাইমান সুমন সাহেব। অনুষ্ঠানে ১০ জন আনসার, ২০ জন লাজনা নাসেরাত, ৩০ জন খোদ্দাম ও আতফাল এবং নিরাপত্তা কর্মী ১৫ জন সহ মোট ৭৫ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ্। সভাপতি সাহেব নসিহতমূলক বক্তব্য পেশ করে সমাপনী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত করেন।

**শফিকুল হাকিম আহমদ**
যয়ীম আলা
মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা

## ফাজিলপুরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন

গত ২৯/০৪/২০১৮ তারিখ রবিবার পূর্বে নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী বিকাল ৩ টায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপনের আয়োজন থাকা সত্ত্বেও দুপুর ১২টা হতে বৈরী আবহাওয়ার জন প্রোগ্রাম বাদ আসর শুরু হয়। এতে শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন মিসেস মোস্তারিন আকতার প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুর। এরপর মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মের পূর্বে আরবের অবস্থা এবং জন্মের পর মুহাম্মদ (সা.)-এর বাল্য, শৈশব, যৌবন এবং নবুওয়ত প্রাপ্তি পর্যন্ত জীবনের ওপর আলোচনা করেন মিসেস আমাতুল মজিদ সেক্রেটারী তালিম-তরবিয়ত ও তবলীগ। নবুওতের পর উল্লেখযোগ্য দুইটি ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করেন মিসেস মোস্তারি আকতার, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুর। অনুষ্ঠানে অ-আহমদী বোনদের ১৬/১৭ জন সহ মোট উপস্থিত ছিল ৩২ জন।

**আমাতুল মজিদ**
সেক্রেটারী তালিম-তরবিয়ত
লাজনা ইমাইল্লাহ্, ফাজিলপুর

## তবলীগি আশারা পালন এবং সীরাতুন নবী (পাঠ দিবস ও তবীলীগি সভা অনুষ্ঠিত)

গত ০৫/০৫/২০১৮ তারিখে ভেটখালী হালকায় মসজিদ বাইতুস সোবহানে বাদ মাগরিব সীরাতুন নবী (স.) জলসা ও তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। দশদিন তবলীগি আশারাতে সর্বমোট ২০৪ জন তবলীগ করেন। ৬৬৩ জনকে তবলীগ করা হয়েছে। মোট ৩১৩ টি লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২ জন বয়আত করেছেন।

স্থানীয় আমীর এস, এম, রেজাউল করিম সাহেবের সভাপতিত্বে সীরাতুন নবী (সা.) অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব রজব আলী মোড়ল। নযম পরিবেশন করেন জনাব জি, এম, মোবারক আহমদ। তারপর সীরাতুন নবী (সা.) জলসার সর্বপ্রথম আলোচনা করেন জি, এম, সাব্বির আহমদ, তার বিষয় ছিল নবী করীম (সা.)-এর বাল্যকাল। জনাব শেখ আব্দুল ওয়াদুদ সাহেব আলোচনা করেন নবী করীম (সা.) এর উত্তম জীবনাদর্শ। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে আপত্তি ও এর খন্ডন এর ওপর আলোচনা করেন জনাব হযরত আলী মোড়ল। পরিশেষে বক্তৃতা প্রদান করেন মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন মোয়াল্লেম, তার আলোচনার বিষয় ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মানব প্রেম ও পরমত সহিষ্ণুতা।

সবশেষে সভাপতি সাহেব সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। এতে ১০৪ জন আহমদী পুরুষ ও মহিলা এবং ১৪ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

**এম রজব আলী**, সেক্রেটারী তবলীগ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত,
সুন্দরবন, সাতক্ষীরা

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ৩০ এপ্রিল ও ১ ও ২ মে, লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহীর আঞ্চলিক তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। তিনব্যাপী এই ক্লাসে কুরআন, দোয়া, নামায, পর্দার গুরুত্ব এবং তরবিয়্যতির বিষয় নিয়ে আলোচনা ও পরীক্ষা নেওয়া হয়। উক্ত সভায় ১ম দিন ৪৭ জন, ২য় দিন ৬৩ জন, এবং ৩য় দিন ৪১ জন উপস্থিত ছিলেন।

## নারায়ণগঞ্জ জামাতে মুসীয়ান সম্মেলন, ২০১৮ অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে গত ১১/০৫/২০১৮ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মুসিয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে লোওয়াত করেন জনাব কাউসার আহমদ ভূইয়া। উদ্বোধনী দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি মোহতরম ফজল মাহমুদ, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। ওসীয়্যতের গুরুত্ব ও কল্যাণ এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌলানা তাহের আহমদ, মুরব্বী সিলসিলা। ওসীয়্যত বিভাগের ১ বছরের রিপোর্ট পেশ করেন জনাব শামীম আহমদ, সেক্রেটারী ওসীয়্যত। সভাপতির ভাষণ মুসী/মুসীয়াদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম ফজল মাহমুদ, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। সবশেষে সভাপতির দোয়ার পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে ৩৩ জন মুসী/মুসিয়া সহ মোট ১১৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

**ফজল মাহমুদ**
আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ

## বানিয়াজান জামাতে ২য় মুসীয়ান সম্মেলন, ২০১৮ অনুষ্ঠিত

গত ০৪/০৫/২০১৮ তারিখে বানিয়াজন জামাতে ২য় মুসিয়ান সম্মেলন উদযাপন করা হয়। বাদ জুমুআ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে, নূর মুহাম্মদ মন্ডল সাহেবের কুরআন তেলাওয়াত ও জয়নাল আবদীন সাহেবের নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। একজন ওসীয়্যতকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্ষেপে তুলে ধরেন মামুন-অর-রশীদ সাহেব। স্থানীয় মুরুব্বী সিলসিলা, মুহাম্মদ রুহুল বারী সাহেব ওসীয়্যতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। সভাপতি সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উল্লেখ্য মোট ১২ জন ওসীয়্যতকারীর মধ্যে ৯ জন সহ মোট উপস্থিত ছিলেন ৪৫ জন।

**প্রেসিডেন্ট**
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বানিয়াজান

## আশকোনা মসজিদে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে গত ০৪ মে, ২০১৮ বাদ মাগরিব আশকোনা মসজিদে তবলীগি সেমিনার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জনাব মাজেদুর রহমান ভূঁইয়া, নায়েব যয়ীম আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন জনাব বুখারুল ইসলাম বুখারী। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন জনাব মাওলানা শাহ মুহাম্মদ নুরুল আমীন সাহেব, মুরব্বী সিলসিলা। অনুষ্ঠানের শুরুতে সভাপতির অনুমতিক্রমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও এর তরজমা করেন জনাব তফাজ্জল হোসেন।

আল্লাহ্‌র ফযলে ১০ জন জেরে তবলীগসহ মোট ৬২ জন সদস্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের তৌফিক অজন করেন আলহামদুলিল্লাহ্। এরপর আগত মেহমানদের প্রশ্নের উত্তর পর্বে অকাট্য দলিল ও যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে ধৈর্য সহকারে যথাযথ উত্তর প্রদান করেন মোহতরম শাহ মুহাম্মদ নুরুল আমীন সাহেব। প্রশ্নোত্তর পর্বটি এতটাই আকর্ষণীয় হয় যে এটি রাত ১০.০০ টা পর্যন্ত বিনা ব্যতিক্রমে চলে। সভাপতি সাহেব নসিহতমূলক বক্তব্য পেশ করে সমাপনী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত করেন।

**শফিকুল হাকিম আহমদ**
যয়ীম আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা

## মজলিস আনসরুল্লাহ্ ফাজিলপুর এর পক্ষ থেকে কৃতি ছাত্র/ছাত্রীদের সর্বপ্রথম সংবর্ধনার আয়োজন

গত ২৭/০৪/২০১৮ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামাতের যয়ীম জনাব মুহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খাঁন এর সভাপতিত্বে কৃতি ছাত্র/ছাত্রীর সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। নযম পরিবেশন করেন নিশাত তাসনীম মুনা। পড়ালেখার গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন জনাব সাইফুল ইসলাম। কায়েদ/টিচার। ভাল পড়া শুনা করে আরো বেশী বেশী ছাত্র/ছাত্রী যেন ফাজিলপুর জামাতের সুনাম বয়ে আনে এ বিষয়ে পিতা, মাতাদের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা ও নসিহতমূলক আলোচনা করেন জনাব মুহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খাঁন, যয়ীম ফাজিলপুর। এরপর কৃতি ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে ক্রেস বিতরণ করা হয়। তারপর সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

## কুরআন ও নামায পড়ার গুরুত্বের ওপর সেমিনার

মজলিস খোদ্দামুল ও আতফালুল আহমদীয়া ফাজিল পুর এর উদ্যোগে গত ২০/০৪/২০১৮ তারিখ স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট নূর এলাহী জসিমের সভাপতিত্বে কুরআন ও নামাযের ওপর

সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মাগফুর আহমদ। তারপর নামায পড়ার গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব সাইফুল ইসলাম কায়েদ ফাজিলপুর। পবিত্র কুরআন পড়ার গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম। সন্তানদের প্রতি নামায ও কুরআন পড়ার ব্যাপারে পিতা-মাতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

**মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম**
আ.মু.জা. ফাজিলপুর, ফেনী

## ১৬তম রিজিওনাল ওয়াকফে নও সম্মেলন-২০১৮ অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট রিজিওনের ২ দিনব্যাপী ১৬তম রিজিওনাল ওয়াকফে নও সম্মেলন-২০১৮ গত ০৪/০৫/২০১৮ ও ০৫/০৫/২০১৮ তারিখ রোজ শুক্র ও শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বায়তুল ওয়াহেদ মসজিদে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সম্মেলনে অত্র অঞ্চলের ৮ টি জামাত হতে ৬০ জন ওয়াকফে নও (জামাতসমূহ হল ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কোড্ডা, বিষ্ণুপুর, তারুয়া, ঘাটুরা, নাটাই, ভাদুঘর, জামালপুর) ৬০ জন পিতামাতা অংশগ্রহণ করেন। ২ দিন ব্যাপী উক্ত সম্মেলনে উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম হালিম আহমদ হাজারী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। অভ্যর্থনা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন মোহতরম মোস্তাক আহমদ খন্দকার সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও ও জোনাল ইনচার্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট অঞ্চল। ওয়াকফে নও স্কীমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মাওলানা জহির উদ্দিন আহমদ মুরব্বী সিলসিলাহ এবং খেলাফতের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা এ সম্পর্কে কিভাবে গড়ব এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম মুরুব্বী সিলসিলাহ। দাপ্তরিক কাজ সম্পর্কে আলোচনা করেন আবুল আতা মামুন সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। উক্ত অনুষ্ঠানে আগত ওয়াকফে নওদের বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং পরীক্ষায় কৃতকার্যদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়া সম্মেলনে আগত ওয়াকফে নওদের বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত ফরম পূরণ করেন সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খোদ্দাম, আনসার ও লাজনাগণ সক্রিয় সহযোগিতা করেন। সকলের জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

**মোস্তাক আহমদ খন্দকার**
সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

## আখাউড়ার উদ্যোগে খেলাফত দিবস অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আখাউড়ার উদ্যোগে ২৭ মে ২০১৮ইং বাদ আছর স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব সালেহ মুহাম্মদ ভূঞা সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এতে শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সিরাজ উদ্দিন নঈম খাদেম, আ:মু:জা: আখাউড়া। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাবা উম্মুতুন নাহার মীম লাজনা ইমাইল্লাহ্ আ.মু.জা. আখাউড়া। বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য রাখেন নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত সম্পর্কে বক্তৃতা রাখেন মোহাম্মদ হাফিজুর রশিদ কাজল জি, এস আ. মু. জা. আখাউড়া। আরবী কাসিদা পাঠ করেন শেখ রাফাত আহমেদ সাদ। খেলাফতের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা রাখেন মেজবাহ উদ্দিন খাদেম জামেয়ার ছাত্র। বাংলা নযম নূর আহমেদ ভূঞা জাবেদ সভাপতি সাহেব সমাপনি বক্তব্য রাখেন ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

**মোহাম্মদ হাফিজুররশিদ (কাজল)**
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

## আহমদীয়া মুসলিম জামাত কোড্ডার উদ্যোগে খেলাফত দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২৭/০৫/২০১৮ রোজ রবিবার বাদ আসর হতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কোড্ডার উদ্যোগে জনাব গাজী মাজহারুল খোকন প্রেসিডেন্ট কোড্ডা এর সভাপতিত্বে মসজিদে মাহমুদ-এ মহান উদযাপন করা হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন জনাব ইমদাদুল হক আদর ও ছাকিব সারোয়ার সুপ্রীম। খেলাফত দিবসের তাৎপর্য ও বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা করেন জনাব এনামুল হক ইন্টু, জনাব শরীফ আহমদ ভূইয়া, জনাব শরীফ আহমদ চৌধুরী, জনাব আসাদুজ্জামান ভূইয়া, জনাব আব্দুল হাকীম মোয়াল্লেম কোড্ডা সভার মধ্যখানে সুললিত কণ্ঠে একটি

বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব জিয়াউদ্দিন আহমদ পাপ্পু। সবশেষে সভাপতি সাহেব তার মূল্যবান বক্তৃতার পর দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সভাতে উপস্থিত ছিল সন্তুষ্টজনক।

**এনামুল হক**

## আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রামের উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালিত

গত ২৫-০৫-২০১৮ তারিখ রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রামের উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের সম্মানিত আমীর জনাব মোরশেদ আলম সাহেবের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব হাফেজ নিজাম উদ্দিন সাহেব, উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব ইমরান সাইদ ও বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব হাশেম আহমদ সাহেব। উক্ত খেলাফত দিবসের তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রামের তবলীগ সেক্রেটারী জনাব আলাহাজ্জ সাহাবুদ্দিন খালেদ সাহেব তার ঈমান-উদ্দীপক বক্তব্য শ্রোতাদের সামনে পেশ করেন। ২য় বক্তব্য রাখেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রামের মুরব্বী সিলসিলাহ্ মৌলানা জাফর আহমদ সাহেব তার ধর্মীয় জ্ঞানগর্ভ ও নসিহতমূলক বক্তৃতায় উপস্থিত শ্রোতাদের ধর্মীয় জ্ঞানের খোরাক যুগিয়েছে। উক্ত সভার সভাপতির মূল্যবান সমাপনি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০ শত জন।

**গিয়াস উদ্দিন আহমেদ**, চট্টগ্রাম জামাত

## বটিয়াপাড়ার উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালিত

গত ২৭ মে ২০১৮ তারিখ রোজ রবিবার বটিয়াপাড়ার উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম সাহেবের সভাপতিত্বে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আমিনুজ্জামান, নযম বাংলা পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন। বক্তৃতা করেন মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান ওল্টু তার বিষয় খেলাফতের গুরুত্ব। মোহাম্মদ সাকিবুল আসান জামেয়া ছাত্র মুরব্বী সিলসিলা তার বিষয় ছিল খেলাফতের বিশ্ব বিজয়। সবশেষে সভাপতির ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। এতে মোট ১১ জন উপস্থিত ছিলেন।

**মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম**, প্রেসিডেন্ট

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ রংপুরের উদ্যোগে তালিম তরবিয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রংপুরের উদ্যোগে গত ২৮, ২৯ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ স্থানীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে দুই দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্। বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট পর্যন্ত ক্লাস হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন সুইটি জাবের। দোয়া পরিচালনা করেন প্রেসিডেন্ট সাহেবা। তালিম তরবিয়তী ক্লাসের সিলেবাস অনুযায়ী অর্থসহ নামায, দোয়া, শুদ্ধরূপে কুরআন পাঠের নিয়মাবলী ও শেষ ১০ টি সূরা, উর্দূ ক্লাসও তরবিয়তমূলক ২ টি বক্তৃতা দেয়া হয়। উক্ত বিষয়গুলোর ওপর পরীক্ষা নেয়া হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২ দিনে লাজনা-নাসেরাত সহ মোট ৬৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

**দিলরুবা জামান (মুক্তা)**
প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, রংপুর

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ খাকদানে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ০১/০৫/২০১৮ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ খাকদানের উদ্যোগে ২ দিন ব্যাপী লাজনা ও নাসেরাতদের ১ম স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন কুরআন তিলাওয়াত করেন তৌহিদ সুলতানা। আহাদনামা পাঠ করেন হাসিনারা জালাল প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ খাকদান। দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। উক্ত ২ দিনের ক্লাসে শুদ্ধ করে কুরআন পড়ার নিয়ম। অর্থসহ নামায, দোয়া এবং কাসিদা ক্লাস নেয়া হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন তৌহিদা সুলতানা এবং ফাতেমা মাহমুদ (ঐশী)। ২য় দিন কুরআন তেলাওয়াত করেন রাজিয়া বেগম। আহাদনামা পাঠ করেন হাসিনারা জালাল। "যাবতীয় কল্যাণ কুরআনেই নিহিত" এ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন তৌহিদা সুলতানা। সন্তানদের তরবিয়ত বিষয়ে বলেন ফাতেমা মাহমুদ (ঐশী)। পুরস্কার বিতরণ এবং দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশন শেষ হয়। উক্ত ক্লাসে ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

**সেক্রেটারী তালীম**
তৌহিদা সুলতানা, লাজনা ইমাইল্লাহ্, খাকদান

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়ার ৪র্থ আঞ্চলিক তালিম তরবিয়ত ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ৩০ এপ্রিল ও ১, ২ ও ৩ মে রোজ রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধবার তেবাড়িয়া জামাতে আঞ্চলিক তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন কেন্দ্র হতে আগত মোহতরমা নার্গিস ইসলাম ও খাদিজা আকতার। প্রতিদিন প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত ও লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রেসিডেন্ট সাহেবার আহাদনামা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উক্ত ক্লাসে শুদ্ধরূপে কুরআন পাঠ, অর্থ সহ

নামায পড়া, সিলেবাসের নির্ধারিত দোয়া এবং তরবিয়তী বিষয়ে ক্লাস নেয়া হয়। প্রতিদিনের অনুষ্ঠান দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। ১ম অধিবেশন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলে। এরপর যোহর ও আসর নামাযের পর দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত। ক্লাস শেষে প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয় লাজনা নাসেরাতদের আলাদা ভাবে এবং বিজয়ীদেরকে পুরস্কারও দেওয়া হয়। ক্লাসে ১ম দিন উপস্থিত ছিল লাজনা ৩৬ জন, নাসেরাত ১০ জন, শিশু ১৪ জন। ২য় দিন লাজনা ৪০ জন নাসেরাত ১২ জন, শিশু ১৭ জন। ৩য় দিন লাজনা ৩৩ জন নাসেরাত ১১ জন শিশু ১৫ জন। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণ ও নার্গিস ইসলাম সাহেবার দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

**লাকী আহমদ**
প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, তেবাড়িয়া, নাটোর

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের কর্মতৎপরতা– তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৫-০৪-২০১৮ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে শাকোয়া বানুর হাট (পকেটে) দিনব্যাপী তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তব্য দেওয়া হয়। তা হলো ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম চরিত্র। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমন। হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু। এসব বিষয়ে আলোচনা করেন : যথাক্রমে আমাতুস সামী, মিলা পাটোয়ারী, জান্নাতী বেগম, নাফিয়া শারমিন, আফরোজা মতিন। এছাড়াও জেরে তবলীগদের প্রশ্নের উত্তর দেন পর্দার ওপার থেকে মোয়াল্লেম ইয়াহ্ইয়া সাহেব ও ডা: রেজাউল করিম (সেক্রেটারী তবলীগ)। উক্ত অনুষ্ঠানে ৫ জন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ৩ জন বয়াত গ্রহণ করেন (আলহামদুলিল্লাহ্)। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম শেষ হয়।

## নও মোবাঈনদের সমন্বয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৫ এপ্রিল ২০১৮ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে শাকোয়াবানুর হাট পকেটে নও মোবাঈন সেমিনারের আয়োজন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সেমিনারের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে নওমোবাঈনদের সিলেবাস অনুযায়ী তালিমী ক্লাস নেওয়া হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন মিলা পাটোয়ারী। এরপর চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন– আমাতুস সামী, স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা করেন- নাফিয়া শারমিন। বয়াতের শর্ত ও নওমোবাঈনদের অবশ্যকরণীয় সম্পর্কে বলেন– মিলা পাটোয়ারী। সবশেষে পর্দার গুরত্ব সম্পর্কে বলেন– আফরোজা মতিন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত সেমিনারে ২৫ জন নও মোবাঈন ও ৫ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন।

## "মিনহাজুত্তালেবীন" বই এর ওপর সেমিনার

গত ২৭/০৪/২০১৮ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর লিখিত পুস্তক মিনহাজুত্তালেবীন-এর ওপর এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অধিবেশন কুরআন তেলাওয়াত মাধ্যমে শুরু হয়। "মিনহাজুত্তালেবীন" বই এর ওপর আলোচনা করেন নাছিমা বশির, এই বই থেকে প্রতিযোগিতামূলক কুইজ প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত সেমিনারের সমাপ্তি হয়। সেমিনারে ৬৬ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন।

## মিনাবাজারের আয়োজন

গত ১৯/০৪/২০১৮ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে মিনা বাজারের আয়োজন করা হয়। এই কার্যক্রম শুরুর পূর্বে কুরআন থেকে তেলায়াত করেন- নাজিয়া সুলতানা। হাদীস পাঠ করেন-বিলকিস তাহের। এরপর রান্না করে আনা খাবারের প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। প্রতিযোগীরা তাদের খাবার সুন্দর ভাবে পরিবেশন করেন। সেখান থেকে বিচারকগণ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী নির্বাচন করেন।

মিনাবাজারে মোট ১০০টি স্টল ছিল। স্টল গুলোতে ছিল হাতের কাজের বিভিন্ন জিনিস। এছাড়াও ছিল হাতে বানানো পিঠাসহ অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদি। বিচারকগণ প্রতিটি স্টল পরিদর্শন করেন। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে মিনাবাজারের আয়োজন সমাপ্তি হয়। উক্ত মিনাবাজারে ৮০ জন লাজনা ও নাসেরাত ইপস্থিত ছিলেন।

**মিলা পাটোয়ারী**
সেক্রেটারী ইশায়াত, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ বড়ভেটখালী তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১ ও ২ মে ২০১৮ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ বড়ভেটখালীর উদ্যোগে বায়তুস সোবহান মসজিদে দুইদিন ব্যাপী স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস সাফল্যের সাথে সুসম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত, হাদীস পাঠ, নযম, দোয়া ও আহাদনামা পাঠের মাধ্যমে উক্ত তালিম তরবিয়তী ক্লাসের উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন মোহতরমনা শাহানারা মাগফুর এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মোহতরমা ফাতেমা আহমেদ মোফাত্তিস ও সেলিনা ইসলাম প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ সুন্দরবন। উক্ত অনুষ্ঠানে তালিম তরবিয়্যতী সিলেবাস অনুযায়ী ক্লাস এবং পরীক্ষা নেওয়া হয়। উক্ত ক্লাসে প্রথম দিন লাজনা ৫৩ জন, নাসেরাত ২১ জন, শিশু ১৮ জন, মোট ৯২ জন এবং দ্বিতীয় দিন লাজনা ৬০ জন, নাসেরাত ২১ জন, শিশু ১৭ জন আতফাল ৪ জন সহ মোট ১০২ জন উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে সমাপনী ভাষণ ও পুরস্কার বিতরণী ও দোয়ার মাধ্যমে এই তালিম তরবিয়তী ক্লাসে সমাপ্তি হয়।

**বেগম শাহানারা মাগফুর**, প্রেসিডেন্ট
লাজনা ইমাইল্লাহ্, বড়ভেটখালী, সুন্দরবন

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহীর উদ্যোগে মসীহে মাওউদ (আ.) দিবস পালন

গত ৩০-০৩-২০১৮ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহীর পক্ষ থেকে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহতরমা মোবারকা বেগম। দোয়া পাঠ করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট রাশেদা করিম সাহেবা। উর্দু নযম পাঠ করেন মেহেদী করিম ঋতু লাজনা, বাংলা নযম পরিবেশন করেন নাসেরাত আসিকা হোসেন। ইমাম মাহদী (আ.)-এর বংশ পরিচয় নিয়ে আলোচনা করেন (নাসেরাত) শারমিন সুলতানা। মসীহে মাওউদ (আ.) দিবস কি এর গুরুত্ব আলোচনা করেন শামীমা আখতার। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ আলোচনা করেন আকলিমা খাতুন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইসলাম প্রচার সম্পর্কে আলোচনা করেন সাজলিনা রহমান। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়, উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩১ জন উপস্থিত ছিলেন।

**আকলিমা খাতুন**
জেনারেল সেক্রেটারী
লাজনা ইমাইল্লাহ্, রাজশাহী

## কৃতি ছাত্র-ছাত্রী

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে আমাদের ছোট ছেলে তাহের আহমদ ২০১৮ইং সালে অনুষ্ঠিত SSC পরীক্ষায় (বিজ্ঞান বিভাগ) সিভিল এভিয়েশন উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা থেকে GPA-5 পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে ওয়াকফে নও নম্বর– ১১৬১৭/A। তার ভবিষ্যত দ্বীনি ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্য জামাতের সকলের নিকট বিনীত দোয়ার অনুরোধ করছি। উল্লেখ্য যে, সে মহারাজপুর (নাটোর) জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মরহুম আব্দুল নূর মোল্লা এর দৌহিত্র ও মরহুম নাজান উল্লাহ্ প্রধান সাবেক মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ আহমদনগর জামাত এর নাতী।

বিনীত দোয়াপ্রার্থী
**এনামুল হক রনি**
মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ /
**মা মোবারেকা বেগম লাভলী**

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে আমাদের ছোট মেয়ে শিফা সামিয়াত ২০১৭ সনে অনুষ্ঠিত JSC পরীক্ষায় YWCA higher secondary school-Dhaka থেকে Scholarship সহ Golden A+ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে- আলহামদুলিল্লাহ্। সে তেজগাঁও নিবাসী ডা. আব্দুর রশিদ সাহেবের ছেলের ঘরের নাতনি এবং মিরপুর সাংবাদিক কলোনী নিবাসী মরহুম আব্দুল কাহ্হার সাহেবের দৌহিত্রী। ভবিষ্যতে সে যেন একই ধারাবাহিকতায় ভাল ফলাফল করতে পারে এবং তার আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতি এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

**পিতা– মোহাম্মদ আবদুস সালাম** ও
**মাতা– সৈয়দা ফারহানা আহ্‌মেদ**

## পবিত্র মাহে রমযানের ফিতরানা ও ফিদিয়ার হার

১। এ বছর ফিতরানা ধার্য হয়েছে ১২৫/- (একশত পঁচিশ) টাকা। প্রত্যেকের জন্য এমনকি নবজাতক শিশুর জন্যও ফিতরানা প্রদান করা আবশ্যকীয়। যারা অসচ্ছল তারা অর্ধেক হারে ফিতরানা প্রদান করতে পারেন।

২। যারা একান্ত অপারগতার জন্য রোযা রাখতে পারবেন না তারা অবশ্যই ফিদিয়া প্রদান করবেন। এ বছর শহরের জামা'তের জন্য নূন্যতম ফিদিয়ার হার ১৮০০/– (এক হাজার আটশত) টাকা এবং গ্রামের জামা'তের জন্য নূন্যতম ফিদিয়ার হার ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা ধার্য করা হয়েছে। যারা সামর্থ্যবান তারা রোযা রাখা সত্ত্বেও ফিদিয়া প্রদান করতে পারেন।

**সেক্রেটারী তরবিয়ত**
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

# ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা

**পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা ও ঈদ মুবারক। পবিত্র ঈদুল ফিতর সকলের জন্য বয়ে আনুক অশেষ কল্যাণ ও বরকত।**

**–সম্পাদক**

# দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ এবং সূরাসমূহ প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনবার পড়ে নিয়ে নিজ হাতের মুঠিতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে (যতটুকু হাত যায়) বুলিয়ে নিবেন কেননা আমাদের প্রিয় রসূলে করীম (সা.)-এর পছন্দনীয় প্রাত্যহিক রীতি ছিল এটি।

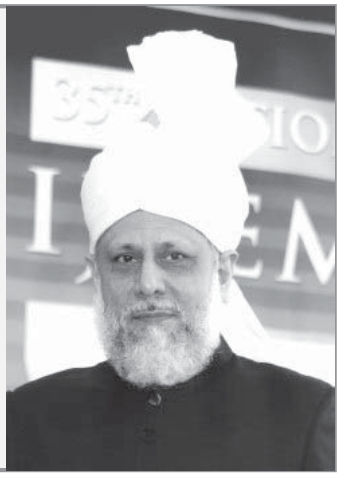

## আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۶﴾

(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (শুধু ততটুকুই)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু, মহামহিমান্বিত। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

## সূরাতুল ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۲﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۳﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۙ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ ﴿۴﴾ وَلَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۵﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। ৪) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

## সূরাতুল ফালাক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই। ৩) (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে। ৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

## সূরাতুল নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۙ الۡخَنَّاسِ ﴿۴﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۶﴾ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۷﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, ৩) (যিনি) মানুষের অধিপতি ৪) (এবং) মানুষের উপাস্য। ৫) (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, ৬) (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭) সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

(জুমুআর খুতবা: ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

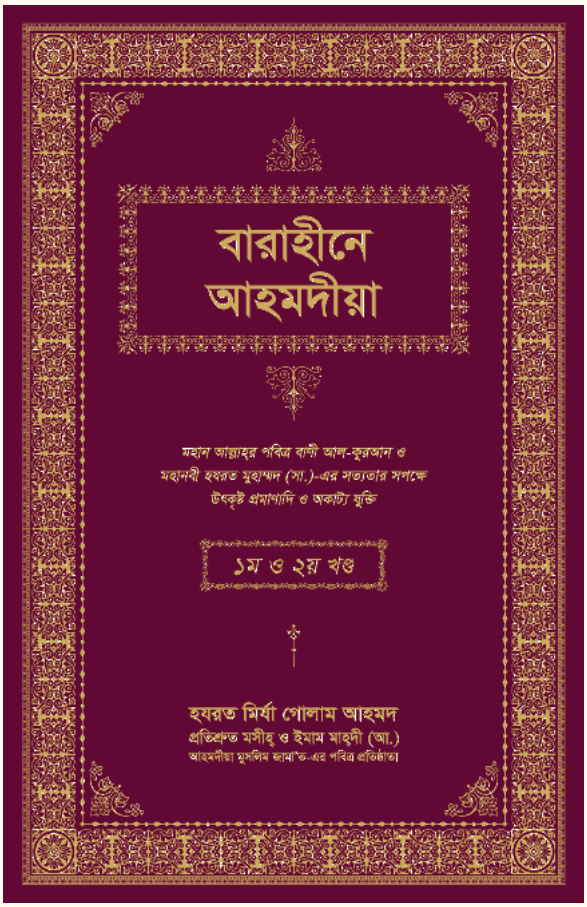


মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants
Software Developer & MIS Solution Provider
Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

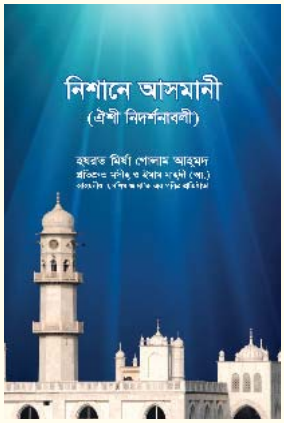


হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

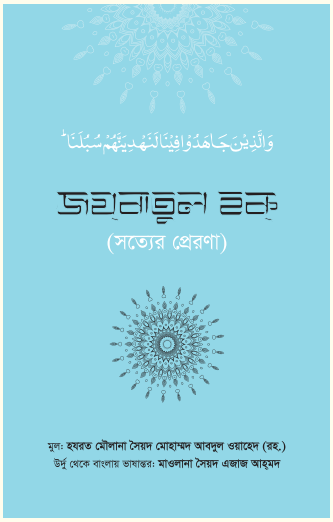


জয্বাতুল হক্ (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল। বইটির শুভেচ্ছা মূল্য ২০/- টাকা মাত্র।

New Vol. No. 80 | 22 & 23 Issue

# The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th June, 2018 | Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

‘সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে খোদার জন্য নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সেই ব্যক্তি হতভাগ্য যে নিজের প্রবৃত্তির জন্য খোদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তাঁহার সহিত মিলন সাধন করে না। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া খোদার আদেশ লঙ্ঘন করে সে কখনো বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারে না।’

(কিশ্‌তিয়ে নূহ পৃ-৩৮)

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

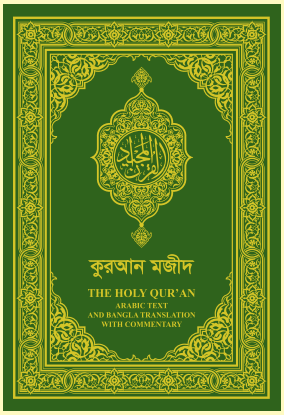


## সুখবর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সহজবোধ্য আরবি অক্ষরে নতুন করে পবিত্র কুরআন শরীফ মুদ্রিত হয়েছে। বাংলাদেশ ইশায়াত দপ্তরে এর পর্যাপ্ত সংখ্যক কপি সংরক্ষিত আছে। প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণকে পবিত্র কুরআন শরীফ সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। কুরআন শরীফের হাদীয়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০০/- (পাঁচশত টাকা)।

নিবেদনান্তে–
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

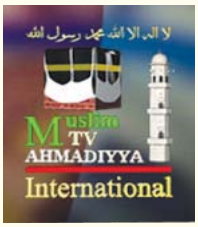


mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

**এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন**

## এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama’at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com
**www.theahmadi.org** (Pakkhik Ahmadi web site live now)